হংসবলাকা

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

বিহার সাহিত্য ভবন লিমিটেড
২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা-৪

'ঊনপঞ্চাশীর" উপেনদাকে—

কল্পনা করুন বাংলার একটি পল্লীগ্রাম। স্টেশন থেকে যে রাস্তাটা বাঁ দিকে চলে গেছে সেটা নয়। সেটা গরুর গাড়ির রাস্তা। আপনি যদি মেয়েছেলে নিয়ে নামেন তাহলে অবশ্য ওই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে। কিন্তু সঙ্গে মেয়েছেলে যদি না থাকে তাহলে ও ঘুরপথে যাবেন না। যাবেন ডান দিকেই লাইন ধরে সোজা উত্তর দিকে,—ডিস্ট্যাণ্ট সিগ্‌নাল পর্যন্ত। সময়টা যদি বর্ষাকাল হয় তাহলে একটু পা টিপে টিপে চলবেন, আর রাত্রে একটা হ্যারিকেন নিশ্চয়ই সঙ্গে রাখবেন। কারণ বৃষ্টিতে লাইনের এঁটেল মাটি অত্যন্ত পিচ্ছল হয়। একটু অসাবধান হলে সড়্ সড়্ করে নিচে পড়বেন। আর রাত্রে সাপ-খোপের ভয়ও বড় বেশি। লাইনের স্লিপারের তলায়, পাথরের আড়ালে সাপ লুকিয়ে থাকে। কিন্তু বরাবর লাইন ধরে আপনাকে যেতে হবে না। ডিস্ট্যাণ্ট সিগ্‌নালের নিচেই যে বড় আল রাস্তা কোণাকুণি গিয়েছে সেইটে ধরে সোজা তিন কোয়ার্টার গেলেই যে বড় গ্রামখানা তারই কথাই বলছি।

গ্রামে ঢোকার মুখেই পড়বে দীঘি। গ্রামের যে কোনো লোককে জিজ্ঞাসা করলেই দীঘির ইতিবৃত্ত জানতে পারবেন। নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর কোনো হিন্দু অমাত্য তাঁর গুরুদক্ষিণা স্বরূপ এই দীঘিটা তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। কথাটা সম্ভবত সত্য। এত বড় দীঘি সুবে বাংলার নবাবের অমাত্যের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব। এক মাইল লম্বা, আধ মাইল চওড়া জলা। চারিদিকে প্রকাণ্ড উঁচু উঁচু পাড়। তিন দিকের প্রশস্ত বাঁধানো ঘাটে অতীত দিনের শিল্প-চাতুর্যের চিহ্ন এখনও কিছু কিছু বিগুমান। তবে আর যে বেশি দিন বিগুমান থাকবে এমন ভরসা কম। কিন্তু গ্রামের লোকের সেদিকে কোনো লক্ষ্য না থাকলেও দীঘির এই স্বচ্ছ জলের, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর সেই বিস্মৃতনামা অমাত্যের এবং তাঁরই

গুরুদেব প্রভুপাদ নরোত্তম আচার্যের গর্ব তারা সকল সময়েই করে থাকে। আর অতীত দিনের গৌরবে তাদের বর্তমান নগণ্যতা ডুবিয়ে দিয়ে বেশ আত্ম-প্রসাদও অনুভব করে।

দীঘির ঘাট থেকে একটা মেটে রাস্তা গ্রামের মাঝ দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে গিয়ে অপর প্রান্তের জেলা বোর্ডের রাস্তায় পড়েছে। গ্রামখানি বড়। পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় মাইল দুই লম্বা। আর ওই রাস্তাটাই গ্রামের বড় রাস্তা। সেকালে, বোধ হয় ঘন ঘন রাজনৈতিক বিপ্লবের আশঙ্কায়, লোকে রাস্তা বড় করার পক্ষপাতী ছিল না। এ রাস্তাও সেজন্যে বড় নয়। কোনো কোনো জায়গায় দু'খানি গরুর গাড়ি যেতে পারে। অধিকাংশ জায়গাতেই তাও পারেনা, একখানি যাবার মতো চওড়া। মনে হয়, গোটা রাস্তাটাই পূর্বে দু'খানি গরুর গাড়ি যাবার মতো চওড়া ছিল। উৎসাহী লোকের গৃহনির্মাণ-নৈপুণ্যের কল্যাণে ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। সরকারী রাস্তা, কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। সুতরাং কেউ যদি এক হাত রাস্তা নিজের বসতবাড়ির অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, অন্য লোকে বাধা দেবার চেষ্টা করে না। বরং সুযোগমত তারাও এক হাত করে নিজের নিজের বসতবাড়ির অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। কেবল নিতান্ত নিরীহ যারা, কিম্বা দুর্বল, তারাই পারেনি। তাদেরই বাড়ির সামনের রাস্তা এখনও আগের মতো চওড়া আছে।

গ্রামখানি লম্বায় যত বড়, চওড়ায় তার সিকিও নয়। বলতে গেলে, ওই বড় রাস্তার ধারে ধারে দু'পাশে ছোট ছোট, নিচু নিচু মাটির ঘর—কোনোটা কোঠা, কোনোটা একতালা। চাল খড়ের। মাঝে মাঝে দু'একখানা দালানবাড়িও আছে। অন্ধকার রাত্রে খড়ের চালের ঘরগুলো কেমন বুকচাপা মনে হয়। মনে হয়, মাথাটা একটু নিচু করে না চললে বুঝি মাথায় ঠেকবে।

বর্ষাকাল। সন্ধ্যারাত্রে এক পশলা ফিস্ ফিস্ বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখন আকাশ পরিষ্কার। চাঁদ উঠেছে। গাছের বৃষ্টি-ধোয়া চিকণ পাতায়, কচি কচি ধান গাছে তারই কিরণ পড়ে চমৎকার শোভা হয়েছে। সে আলোয় সমস্ত মাঠ

রূপকথার মায়াপুরীর মতো ধপ্ ধপ্ করছে। লোচন মাঝি কবি নয়। তবু দীঘির পাড়ে উঠে একবার পিছনের অবারিত মাঠের দিকে ফিরে চাইলে। ধানের গাছগুলি হাওয়ায় দুলছে। আশ-শ্যাওড়া, বনকুলের ঝোপগুলি ভালুকের মতো ধুঁকছে। বাগানের গাছগুলির ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো পড়েছে। মনে হচ্ছে যেন একটি অবগুণ্ঠিতা নারী স্থির হয়ে কার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। স্টেশনের সব আলো নিবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এত দূর থেকে স্টেশন ভালো ঠাহর হচ্ছে না। কিন্তু ডিস্ট্যাণ্ট্ সিগ্‌নালের লাল আলোটা জ্বলছে যেন প্রেতের চোখের মতো।

লোচনের ডান হাতে পাকা বাঁশের লাঠি, আর বাঁ হাতে হারিকেন। স্বল্প বৃষ্টিতে পথ পিছল হয়েছে। পা টিপে টিপে এসে ঘাটের সিঁড়িতে হারিকেন আর লাঠি রাখলে। মাথার পাগড়ি খুলে মুখটা একবার মুছলে। তারপর দীঘির জলে নেমে হাঁটু পর্যন্ত কাদা বেশ ভালো করে ধুয়ে ফেললে। ইচ্ছা হচ্ছিল, ঠাণ্ডা হাওয়ায় দীঘির ঘাটে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে। কিন্তু রাত একটা বেজে গেছে নিশ্চয়। বারোটার ট্রেন দেখে ফিরছে। এই কাদায় এবং পিছল রাস্তায় এতটা পথ আসতে নিশ্চয় এক ঘণ্টা লেগেছে।

লোচনের আর বসা চলল না। পাগড়িটা আবার মাথায় বেঁধে, লাঠি আর হারিকেন হাতে নিয়ে উঠল। বেচারা সমস্ত দিন মাঠের খাটুনি খেটেছে। সন্ধ্যায় একটু বিশ্রাম পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাও পায়নি। এতক্ষণ তবু বেশ ছিল। দীঘির ঠাণ্ডা জলে হাত-পা ধুয়ে ক্লান্তি খানিকটা ঘুচলেও চোখ যেন ঘুমে জড়িয়ে আসতে লাগল। টলতে টলতে লোচন চলল।

ডাইনে ঠাকুর বাড়ি। ক'দিন আগে রথ গেছে। এখনও যেন তার আভাস রয়েছে। লোচন মোড়টা ঘুরেই থামল। সমস্ত গ্রামের মধ্যে এইখানটায় যেমন কাদা হয় এমন আর কোথাও নয়। ক'দিন বাঁ দিকে গৌর ঘোষের বৈঠকখানার দাওয়ার উপর দিয়ে লোকে যাওয়া-আসার পথ করে নিয়েছিল। মেটে দাওয়া, অত লোকের অত্যাচারে আধখানা তার ধ্বসে গেছে। বাকি

আধখানা এখন সে খেজুরের কাঁটা দিয়ে এমন করে ঘিরে দিয়েছে যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। ডান দিকের পাঁচিলের গা দিয়ে খুব কষ্ট করে এইটে পার হওয়া যায় বটে, কিন্তু রাত্রে আলো-টালো নিয়ে পা পিছলে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কাই বেশি।

লোচন আর ভাবলে না। হাঁটুর উপর কাপড় তুলে ছপ্ ছপ্ করে, সেটুকু তো বটেই, বাকি রাস্তাটাও যেন রাগ করে কাদার উপর দিয়েই পার হয়ে গেল। পাড়াগাঁয়ের রাত্রি একটা, চারিদিক যেন থম্ থম্ করছে। কিন্তু লোচন অবাক হয়ে গেল রায়েদের বৈঠকখানার আড্ডা তখনও ভাঙেনি দেখে—এখানকার বৈঠক অবশ্য একটু রাত্রেই ভাঙে, কিন্তু এত রাত্রি এক দুরন্ত গ্রীষ্ম ছাড়া কখনও হয় না। লোচন একটু পা চালিয়েই চলল।

—এই যে! সুকুমার আসেনি?

গোমস্তা অকিঞ্চন দত্তের কণ্ঠস্বর।

অনাবশ্যক বিবেচনায় লোচন আর এর জবাব দিলে না। ঈষদুন্মুক্ত দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। ঘরে একটা আলো জ্বলছে। রায়েদের কর্তাবাবু মনোযোগের সঙ্গে সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী পাঠ করছিলেন। লোচন অনুমান করলে, বৃদ্ধ শুধু তারই প্রতীক্ষায় এখনও বাইরে রয়েছেন। দৈনন্দিন হিসাব লিখে তহবিল মেলাতে তাঁর এগারোটার বেশি হয় না। তার পরেও যদিচ বৈঠকখানার আড্ডা চলে, কিন্তু তিনি আর থাকেন না।

কর্তাবাবু চশমার ফাঁক দিয়ে একবার লোচনের দিকে চেয়ে আবার নিঃশব্দে সংবাদপত্রে মন দিলেন। একটা প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বোধ করলেন না। অথচ ওঠবারও কোনো লক্ষণ দেখালেন না।

অকিঞ্চন দত্তের জবাব দিলেন বাঁড়ুয্যে মশাই। বললেন, আমি বলিনি দত্ত, সুকুমার আসবে না? যেদিন সে আসবে লিখবে সেই দিনটি ছাড়া আর যে কোনো দিন আসতে পারে।

বাঁড়ুয্যে মশাই লোচনের জন্যে কল্‌কেটা কম্বলের বাইরে এগিয়ে দিলেন।

কল্‌কেটায় একটা টান দিয়েই লোচন সেটা উপুড় করে ঢেলে ফেললে। আপন মনেই কি বিড়্ বিড়্ করে বললে, হুঁঃ! বামুন-চোষা কল্‌কে, আর

—আর কি বল?—বাঁড়ুয্যে মশাই হো হো করে হেসে ফেললেন,—আর কায়েৎ-চোষা গাঁ, এই তো? তা বাপু, মিথ্যে বলনি।—ভদ্রলোক খক্ খক্ করে কাশলেন,—তার সাক্ষী জলজ্যান্ত আমি। তোমাদের কর্তাবাবুর কাছে পঁয়তাল্লিশ টাকা ঋণ করেছিলাম। তাতে দিয়েছি সাড়ে তিনশো। সে তো গেলই, আরও চারশো টাকার দায়ে জমিজায়গা, বাগান-পুকুর সব গেল। পৈতৃক ভিটেটা যে নিলেন না, এতেই লোক ধন্য ধন্য করতে লাগল।

কর্তাবাবু একবার গলাটা ঝাড়লেন।

তাঁর উদ্দেশে বাঁড়ুয্যে মশাই বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, আর কিছু বলব না, এই চুপ করলাম। দেখি হে কল্‌কেটা?

লোচন খুশি হয়ে কল্‌কেটা এগিয়ে দিলে। বাঁড়ুয্যের কথায় তারা খুব আমোদ অনুভব করছিল। তারা নিজেরা রাশভারি কর্তাবাবুর মুখের উপর কিছু বলতে সাহস করে না। তারা তো নয়ই, আর কেউও নয়। কেবল পাগলা বাঁড়ুয্যে মশাইকে কর্তাবাবু কিছু বলেন না, হাসেন। বোধ হয় একটু ভয়ও করেন। ভয় করার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, ভিতরে ভিতরে তিনিও নিঃশেষ হয়ে এসেছেন। এ গ্রামের এবং চার পাশের আরও নানা গ্রামের যারাই তাঁর কাছে একবার তমস্থক কেটেছে, তাদের দেনা আর শেষ হয় নি। এক এক করে সমস্ত সম্পত্তি তাঁর কুক্ষিগত হয়েছে। এইভাবে নানা প্রকারে বহু বিষয়-সম্পত্তি তিনি করেছেন বটে, কিন্তু সেও আর বুঝি থাকে না। কতক নতুন নতুন আইনের কল্যাণে, কতক বা ক্রমাগত মামলা মোকদ্দমা করার ফলে তাঁর আয় যত বেড়েছে, দেনা তার চতুর্গুণ বেড়েছে। সে সব দেনার খবর আর কেউ না জানলেও তিনি নিজে তো জানেন। তাই কিছুতে আর যেন তেমন জোর পান না। অন্য লোকে তাঁকে ভয় করে। মামলাবাজ লোককে আর কে না ভয় করে! কোথা থেকে কি করে কার সর্বনাশ যে করে বসেন, তার ঠিক তো নেই। কিন্তু

এখন ভেতরে ভেতরে তিনি এমন তলায় এসে ঠেকেছেন যে, সাহস করে কেউ যদি বাঁড়ুয্যে মশায়ের মতো স্পষ্ট কথা বলে, তিনি বাঁড়ুয্যে মশায়ের কথার মতো তার কথাও হেসে উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু ভেতরের কথা কেউ জানে না বলেই সাহস করে না। আর সাহস করে না বলেই রক্ষা। কিন্তু শেষ রক্ষা আর বুঝি হয় না। দেনার পরিমাণ স্থদে আসলে ক্রমেই বেড়ে উঠছে। এক ভরসা স্থকুমারের। কিন্তু সে বেচারাও আজ বছর চারেক হল এম, এ, পাশ করেছে, এখন পর্যন্ত স্থায়ী চাকরি কোথাও হল না; গোটা দু'য়েক ট্যুইশান পেয়েছে, তাই মেস-খরচাটা কোন রকমে চলে যায়। নইলে উপরের চাকচিক্য কর্তাবাবু যতই বজায় রাখুন —এ শক্তি আর তাঁর নেই যে সমানে স্থকুমারের কলকাতা থাকার খরচ জুগিয়ে যান। বর্তমানে এইটুকুই যা ভাগ্যের কথা।

স্থকুমারের সম্বন্ধে সকলেই আশা রাখে। স্কুলের এবং কলেজের পরীক্ষাগুলো সে ভালো করে পাশ করেছে। সে সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী। উদার হৃদয়। বাপের মতো কুটিল এবং কুচক্রী নয়। নিজে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও পাচজনকে বড় করার আকাঙ্ক্ষা রাখে। আজও অবশ্য নিজের কোনো স্থবিধা করতে পারেনি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় যখন উত্তীর্ণ হয়েছে তখন জীবন সংগ্রামেও একদিন যে উত্তীর্ণ হবে এমন আশা সকলেই পোষণ করে। তবে দু'দিন আগে আর পরে।

বোধহয় এই কথা ভেবেই বাঁড়ুয্যে মশাই একটা নিশ্বাস ফেলে গম্ভীর হয়ে বললেন, তা হোক, বড় ভালো ছেলে। বাবাজী আমার গরীবের দুঃখদরদ বোঝে।

হুঁকোয় দুটো টান দিয়ে বললেন, হবে বই কি! চাকরি একটা নিশ্চয়ই হবে। আজ না হয়, কাল। ভগবান অমন ছেলেকে কখনও দুঃখ দেবেন না।

অকিঞ্চন দত্ত সে প্রার্থনায় সম্মতি জানিয়ে একটু কাশলে। আর কর্তাবাবু যেমনভাবে নাকের ডগায় দড়ি-বাঁধা নিকেলের চশমাটা ঠেলে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন তেমনিভাবে পড়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর মন যে খবরের কাগজে নেই—অত্যন্ত অমনোযোগী দর্শকের পক্ষেও তা বোঝা দুষ্কর নয়।

অকস্মাৎ একসঙ্গে অনেকগুলো শঙ্খ কর্তাবাবুর অন্দর থেকে মুহুর্মুহু বেজে উঠল। চকিতে কর্তাবাবুর হাতের খবরের কাগজ মেঝেয় পড়ে গেল। তিনি একবার চশমার ফাঁক দিয়ে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে অন্দরের দিকে চাইলেন। ভিতরের দিকের দ্বার বন্ধ। কিছুই দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা নয়। কিন্তু এটি তাঁর উৎকর্ণ হওয়ার লক্ষণ। বাঁড়ুয্যে মশাইও হাতের হুঁকো নামিয়ে একবার শঙ্খধ্বনি শুনলেন। অকিঞ্চন ব্যস্ত হয়ে উঠল। আর লোচন সোৎসাহে রাস্তায় নেমে দাঁড়াল। কর্তাবাবু আবার খবরের কাগজে মন দেবার চেষ্টা করলেন।

বাঁড়ুয্যে মশাই নিম্নস্বরে বললেন, পুত্রসন্তানই হবে। যে রকম ঘন ঘন

কথাটা আর তিনি শেষ করলেন না। নিবিষ্টচিত্তে তামাক টানতে লাগলেন।

কর্তাবাবুর নিজেরও সেই প্রকার অনুমান। বাঙালীর ঘরে পুত্র-সন্তান না হলে এত সমারোহ হয় না। তবু আশঙ্কায় তাঁর বুক টিপ টিপ করছে। সাতটি নয়, তাঁর ওই একটিমাত্র সন্তান—সুকুমার। নাতির মুখ দেখার জন্যে বড় সাধ করে তার ছেলেবেলাতেই বিবাহ দিয়েছিলেন। সুকুমার তখন ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ে। তারপরে প্রায় এগারো বছর কেটে গেছে। সকলে ছেলে হওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। যা তাঁর অদৃষ্ট, কি যে হবে কে জানে। পাপ? হ্যাঁ, সংসার করতে গেলে অনেক পাপই করতে হয় বই কি! তাঁরও পাপের মাত্রা কম নয়। হয়তো সেই পাপেই

কর্তাবাবু এবং গৃহিণী কোনো দেবতার দোরে মানৎ করতে আর বাকি রাখেন নি। মাদুলিতে আর কবচে সুকুমারের স্ত্রী মণিমালার বাহুতে আর জায়গা রইল না। এর ওপর সন্ন্যাসী আছে। কত সন্ন্যাসীর পাদোদক, জটা ধোয়ার জল, ধুনীর ছাই, গাছের শিকড় এবং আরও কত কি যে তার পেটে গেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। মণিমালা লেখাপড়া-জানা একালের শহুরে মেয়ে। কিন্তু ভয়ের কাছে বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞানের ধার ভোঁতা হয়ে যায়। কেউ গোপনে, কেউ বা প্রকাশ্যেই গৃহিণীর কাছে বলতে আরম্ভ করলে, ছেলের আবার বিয়ে দাও। ও বাঁজা বৌ নিয়ে কি করবে? বংশ রক্ষা করতে হবে না? পিতৃপুরুষের মুখে

এক গণ্ডুষ জল দিতে হবে না? বৌএর ওপর দয়া দেখাতে গিয়ে কি ধর্ম খোয়াবে বাছা! আমার মেজ মেয়ের এক দেওরঝি আছে, দুগ্‌গাপিতিমের মতো রূপ! বল যদি

শুনে মণিমালার বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। গৃহিণী কিছুই বলেন না বটে, কিন্তু কথাটা তিনি যে ভাবছেন তা বোঝা যায়। ভেবে আর মণিমালা কূল পায় না। কোথায় গেল বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান, কোথায় গেল স্থকুমারের হাস্যময় আশ্বাস, যেখানে যে কেউ ফিসফাস করে, সে ভাবে তারই কথা হচ্ছে। শেষে তার নিজেরই বিশ্বাস হল, সত্যই তো, এত বড় বংশকে সে যদি কুলপ্রদীপ সন্তান না দিতে পারে—স্থকুমার বিয়ে করবে না তো কি? সংসারে স্ত্রী আর কিসের জন্যে? তার নিজেরই এই বিশ্বাস হল। কাউকে সে দোষ দিতে পারে না। মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে ফেরে, আর নির্জন ঘরে দেবতার উদ্দেশে মাথা কোটে, ঠাকুর সন্তান দাও, সৃষ্টিধর কুলপ্রদীপ সন্তান দাও। এমন করে সবদিক দিয়ে পথে বসিও না।

সেই মণিমালা অবশেষে সন্তানবতী হল। কে জানে পুত্র, কি কন্যা! যাই কেন না হোক, দেবতা মুখ তুলে চেয়েছেন। ক্লান্ত, অবসন্ন মণিমালা চোখ মেলতে পারছে না—কেবল মেলবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। বাইরে বহু-কণ্ঠে অনর্গল প্রশ্ন হচ্ছে, কী ছেলে গো, কী ছেলে? দেখি দেখি।

—ব্যাটা ছেলে গো, ব্যাটা ছেলে। খাসা ছেলে হয়েছে।

—কই দেখি, দেখি!

ছেলের পিতামহী বললেন।

দাই বেঁকে বসেছে। তার কিছু পাওনা হবে,—কিছু নয়, বেশ মোটা রকমই। কত আরাধনার ছেলে! দেবে না?

বললে, দেখাব কেন বাছা? অমনি দেখাব কেন?

না দেখাক। বাড়ি শুদ্ধ খুশিতে তখন টল্‌ছে। শঙ্খের শব্দে কান পাতা দায়। বাইরে কর্তাবাবু তখন দুরু দুরু বক্ষে সেইদিকে কান পেতে রয়েছেন। গাছের

পাতার শব্দে চমকে উঠছেন। কে জানে কী সংবাদ কে দেবে! হয় তো তাঁর সারা জীবনের সদসৎ বহুভাবে অর্জিত সম্পত্তির এই পরিণতি। পরের ভোগেই লাগবে। তাঁর গলা শুকিয়ে উঠল। পরিষ্কার করবার জন্যে একবার কাশলেন,—এত মৃদুভাবে যে, সে শব্দ তাঁর নিজের কানেই ভালো করে গেল না। অথচ তিনি যে কি রকম উদ্বেগ আর ব্যাকুলতা নিয়ে অপেক্ষা করে রয়েছেন, আনন্দের আতিশয্যে সেই কথাটাই ভিতরের পরিজনগণ বিস্মৃত হয়েছে। তারা কেবলই হুলুধ্বনি দিচ্ছে আর শঙ্খ বাজাচ্ছে, আর ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে।

ঠাকমাও এদেরই মধ্যে। কিন্তু বুড়ো মানুষের মন বেশিক্ষণ আনন্দ সহ্য করতে পারে না। এত আনন্দের মধ্যে তাঁর বুকটা হঠাৎ ছ্যাং করে উঠল।

—ওরে, থাম থাম। আর বাজাতে হবে না। এক রত্তি মাটির ডেলা ও আবার বাঁচবে, তার আবার

ঠাকমা কথা শেষ করতে পারলেন না, দু' ফোঁটা চোখের জল ফেললেন।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! শাঁখও বেজে চলল, হুলুধ্বনিও বন্ধ হল না। আনন্দের সময় মেয়েদের থামানো সহজ কথা তো নয়।

—ওমা, দিব্যি ছেলে হয়েছে! চাঁদপানা ছেলে!

—ও গিন্নি, দেখ, দেখ,—এতখানা ছেলে! ঘর যেন আলো করে রয়েছে!

—হবে না! বাপ সুন্দর, মা সুন্দর, ছেলেও তেমনি হয়েছে।

—আহা, বেঁচে থাক। সৃষ্টিধর ছেলে, কালো কুৎসিত হলেও দোষ ছিল না। তোমরা আশীর্বাদ কর, আমার মাথায় যত চুল তত বচ্ছর প্রেমাই হোক। ও আমার বাঁচুক।

প্রতিবেশিনীরা কলরব করতে করতে বৈঠকখানার সামনে দিয়ে ফিরে চলল।

অকিঞ্চন দত্ত উৎসাহে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, ব্যাটাছেলে হয়েছে।

বললে যেন হাওয়াকে।

কর্তাবাবু একবার শুধু কাশলেন। চশমাটা একবার কাপড়ের প্রান্ত দিয়ে পরিষ্কার করে নিলেন। হয় তো ঝাপ্‌সা দেখছিলেন। চোখে দু'ফোঁটা আনন্দাশ্রুও জমতে পারে। খবরের কাগজ একপাশে ঠেলে রেখে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কি যেন ভাবতে বসলেন। অবশেষে দাঁড়িয়ে উঠে চটি জুতো জোড়া পায়ে দিতে দিতে বললেন, অকিঞ্চন, কাগজখানা তুলে রাখ। আর কাল সকালে একখানা পোস্টকার্ড আনিয়ে রেখ।

কর্তাবাবু পৌত্রের জন্ম সংবাদ জানিয়ে যে পত্র দিয়েছিলেন যথাসময়ে সুকুমারের কাছ থেকে তার জবাব এল। দু'খানা—একখানা পোস্টকার্ড, একখানা খাম। কর্তাবাবুকে পোস্টকার্ডে সুকুমার এইটুকু মাত্র জানিয়েছে যে, তাঁর চিঠি পেয়ে সে সুখী হয়েছে। নবজাত পুত্রের সম্বন্ধে পিতাকে কিছু লেখা পাড়াগাঁয়ে বেয়াদবি। সুকুমার সে সম্বন্ধে কোনো কথা উল্লেখ করেনি। শুধু গত সপ্তাহে কিছুতে বাড়ি যেতে না পারার জন্যে দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। আর জানিয়েছে, যথাসম্ভব শীঘ্র সে বাড়ি যাবার চেষ্টা করছে।

আর খামের পত্রখানি বেশ দীর্ঘ। এখানি লিখতে তার অনেক সময় গেছে। ছ'দিনের দিন স্নান করে এসে মণিমালা পড়লে :

কল্যাণীয়াসু

মণিমালা, বাবার পত্রে নবকুমারের জন্ম সংবাদ পেলাম। এক কাল ছিল, যখন শত পুত্রের জনক হও বলে মানুষকে আশীর্বাদ করত। সৌভাগ্যবশতই হোক, আর দুর্ভাগ্যবশতই হোক, সে কাল আর নেই। এখন আর সে আশীর্বাদ করতে অতি বড় শত্রুও দ্বিধা করে। শত পুত্রের কথা ছেড়ে দাও, প্রথম পুত্রের জন্ম সংবাদ শুনলেও অত্যন্ত দুঃসাহসী লোকের মুখ শুকিয়ে যায়। এমনি দিন-কাল পড়েছে!

খোকার জন্ম সংবাদে আমি কত খুশি হয়েছি? কিছুই খুশি হই নি। কি

করে হব? শুনলাম, খোকা খুব সুন্দর হয়েছে। কত সুন্দর? তোমার মতো? তাহলে তোমার দুঃখ ঘুচল। ওর চাঁদ মুখখানি মুখের কাছে এনে, ওর কচি-কচি, রাঙা-রাঙা পা দু'খানি বুকে চেপে ধরে তুমি পাবে স্বর্গসুখ। কিন্তু আমার? খোকাকে স্নেহ দিয়ে, মায়া দিয়ে, মমতা দিয়ে তোমার কর্তব্য শেষ হবে। মায়ের কর্তব্য এর বেশি আর কি বল? তোমার কোলে খোকা এল শুধু আনন্দ আর আশা নিয়ে। তারই সঙ্গে হয়তো একটুখানি উদ্বেগও রয়েছে,—ওর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ। তার বেশি নয়। কিন্তু আমার কাঁধে পড়ল বহু প্রকারের দায়িত্ব। ও কি হতে পারবে সে অবশ্য নির্ভর করবে ওর নিজের ওপর। কিন্তু ও যা হতে চাইবে তাই হতে সাহায্য করার সকল দায়িত্বই যে আমার। সে দায়িত্ব কি সোজা ভাব?

অবশ্য, তুমি বলবে, আজই কিছু সে দায়িত্ব আমার ঘাড়ে পড়ছে না। আগে তো সে বাঁচুক। বড়ই হোক। তারপরে আমারও কিছু চিরদিন এমনি যাবে না। লেখাপড়া যখন শিখেছি তখন কোথাও একটা গতি লাগবেই। এখন থেকে এ দুর্ভাবনা কেন? সত্যি। কিন্তু দুর্ভাবনা তো কেউ পরম সমাদরে নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনে না। যুক্তি-তর্ক দিয়েও তাড়ান যায় না। দুর্ভাবনা অযাচিত আসে, আর অহেতুক কষ্ট দেয়।

তাছাড়া, কি জান, আত্মীয়-পরিজনহীন দূর প্রবাসে থেকে মায়ামৃগের পিছনে ঘোরা আমারও তো কম দিন হল না। কোথাও যেন আশা দেখতে পাচ্ছি না। শুধু আমি নই, আমার মতো এমনি লক্ষ লক্ষ ছেলে লক্ষ্যহারা ঘুরছে। ভগ্ন মন, শূন্য হাত। মেসে-বোর্ডিংয়ে, স্কুলে-কলেজে, গৃহস্থের গৃহে লক্ষ লক্ষ ছেলে, কারও মুখে হাসি নেই, নেই যৌবনসুলভ সতেজতা, নেই আনন্দ, নেই উৎসাহ। কেমন যেন সব ঝিমিয়ে আসছে, নিবিয়ে আসছে, এলিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে ঝাড়া দিয়ে উঠি। মাঝে মাঝে ভাবি আমরা যেন একটি বিপুল হংসবলাকা। চলেছি মানস-সরোবরের দিকে, দুস্তর মরুভূমি পার হয়ে, আকাশ আচ্ছন্ন করে। সবাই কিছু এই দিকচিহ্নহীন, ছায়াহীন,

ধূ-ধূ করা বালুভূমি পার হতে পারব না। তবু কেউ কেউ পারবে। দুর্দান্ত মানুষের এত বড় যাত্রা একেবারে বৃথা যাবে না। অবশেষে কেউ কেউ লক্ষ্যে এসে পৌঁছুবেই।

ভাবি। আবার ভাবি, তাতে আমার কি? আমার মতো আরও লক্ষ লক্ষ যারা পৌঁছুতে পারবে না,—যাদের শুধু যাত্রা করাই সার হবে, আর দুঃখ পাওয়া,—তাদের তাতে কি সান্ত্বনা? দেশেরই বা কি? একটি কবির কবিতা বিশ্বের দরবারে সমাদর পেয়ে এল। তা থেকে এ কথা কেউ বুঝবে না যে, দেশের বাকি লোকও অত বড় না হোক ছোটখাটোও কবি। একটি লোক তুনের ব্যবসা করে কোটিপতি হল। তা থেকেও কেউ এ কথা বুঝবে না যে, তার প্রতিবেশীরা কোটিপতি না হোক সহস্রপতি, নিদেন পক্ষে শতপতিও। বড়মানুষের গৌরব নিয়ে তার গা ঘেঁষে বেঁচে থাকার একটা সান্ত্বনা হয়তো আছে, কিন্তু সে মরা জাতের সান্ত্বনা। আমরা লক্ষ কোটি লোক অশেষ দুঃখ পেয়ে একদিন কীটের মতো ফুরিয়ে গেলাম,—unwept, unhonoured, unsung—আর একটি জীবন কোথায় সার্থক হল, চরিতার্থ হল—তাতে আমাদের কী সান্ত্বনা; কী সান্ত্বনা চাঁদের আলোয় তারারা পায়, তারার আলোয় জোনাকীরা! এত দুঃখ আমাদের, বুঝলে মণিমালা, এত দুঃখ আমাদের! না আশা, না সান্ত্বনা।

তবু তোমায় বলি, খোকার আগমনে আমি যে খুব দুঃখিত হয়েছি তাও নয়। উদ্বেগ এবং আশঙ্কা ষোলো আনাই রইল, কিন্তু তারই মধ্যে কিছু আনন্দও আছে। খোকা আমাদের জীবনের ধারা। এই পৃথিবী থেকে যখন আমাদের সমস্ত চিহ্ন মিলিয়ে যাবে তখন ওরই মধ্যে আমরা থাকব বেঁচে আমাদের আশা, আমাদের আকাঙ্ক্ষা, আমাদের প্রবৃত্তি ওরই মধ্যে থেকে আমাদেরই ঈপ্সিত কাজ করে চলবে। ওর জীবন হয়তো আমার মতো ব্যর্থ হবে না। ও হয়তো লক্ষ্যে পৌঁছুবে। তখন সে চরিতার্থতার আনন্দের আমরাও অংশ পাব। আবার ওরও জীবন ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। ওর পরবর্তীদের রক্তে

আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্রমে দুর্বল হতে হতে একেবারে নিশ্চিহ্নও হয়ে যেতে পারে। তখন হবে আমাদের সত্যকার মৃত্যু।

যাদের ঐশ্বর্য আছে, আছে ছেলের হাতে দিয়ে যাবার মতো বহু ধন, সন্তানের কামনা যে শুধু তারাই করে তা নয়। আমার মতো যারা নিঃস্ব, বিত্তহীন, সন্তানের হাতে যারা শুধু দিয়ে যেতে পারে অচরিতার্থ কামনার অপরিমিত স্বপ্ন, তার বেশি নয়, সন্তান কামনা তাদেরও কম নয়। নাই বা রইল বিত্ত, মৃত্যুর পরেও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার যে আদিম প্রবৃত্তি, সে প্রবৃত্তি যাবে কোথায়! অনন্তকাল নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার এই যে উদগ্র ক্ষুধা, এই ক্ষুধাই হল সন্তানের বিধাতা।

যে পুঁজি নিয়ে সংসারে এসেছিলাম তার অনেক বিকৃতি ঘটেছে। কর্মদোষে কিছু গেছে ক্ষয়ে, কর্মবলে কিছু বা বেড়েছে। তারই কিছু রইল তোমার ছেলের কাছে। আমি জানি, মহাকাশে ওড়বার পক্ষে সে কিছুই নয়। বাকি পাথেয় সে আপন শক্তিতে অর্জন করে নিক, এই আশীর্বাদ করি।

উপসংহারে আরও অনেক পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আলোচনা এবং কুশল প্রশ্ন ও কুশল কামনা করে সুকুমার চিঠি শেষ করেছে। চিঠি পড়ে মণিমালার রাগও যত হল, হাসিও তত এল। সুকুমার কী ছেলেমানুষ! কথায় কথায় তার পণ্ডিতি করা চাই। কেবল লম্বা-লম্বা কথার জাহাজ, বোঝে না একরত্তি। মণিমালা ছেলের গাল টিপে আদর করতে করতে বললে, না রে খোকন, বোঝে না একরত্তি! না রে?

মণিমালা হাসলে। আপন মনেই বললে, আসুক তো একবার, তারপর পণ্ডিতি বের করছি।

বলে এমনভাবে কোমরে কাপড় জড়াতে লাগল, যেন এখনি স্বামীর সঙ্গে লড়াই করবে।

২

ইতিমধ্যে এমন একটা কাণ্ড ঘটল যাতে আশা হল—বিপুল হংসবলাকার অন্তত একটি হংস মানস-সরোবরের কাছাকাছি পৌছুবে।

খবরের কাগজের কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখা এবং সুবিধামতো জায়গায় চিঠি ছেড়ে দেওয়া—আর দশ জনের মতো সুকুমারেরও একটা রোগ। কাছে পয়সা থাকলে অনেক সময় সে দৈনিক খবরের কাগজ কিনেই আনে। অন্য সময় ছেলে পড়িয়ে ফেরবার পথে কখনও এলবার্ট হলে, কখনও বা ওয়াই-এম-সি-এতে দেখে নেয়। এই রকমই করে বেশি। এই ভাবে সে যে কোথায় কোথায় কত দরখাস্ত পাঠিয়েছে তা আর তার নিজেরই মনে পড়ে না। অকস্মাৎ একদিন একটা জায়গা থেকে তার একখানা দরখাস্তের জবাব এল, দেখা করার জন্যে।

একটা স্কুল থেকে।

প্রায় মাস তিন আগে এই স্কুলে একটা শিক্ষকের পদ খালি হওয়ার বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। সুকুমার সেই পদের জন্যে আবেদন করেছিল, এত দিন পরে তার উত্তর এল। এতদিন কি ছেলেদের পড়াশুনা বিনা-শিক্ষকেই চলছিল? কিন্তু সে সব গবেষণা পরে হবে। স্কুলের বেয়ারা দাঁড়িয়ে ছিল। তার পিওন-বইতে সই করে দিয়ে সুকুমার দুটি খেয়ে নিয়ে ভব্যযুক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়ল হেড্‌মাস্টারের সঙ্গে দেখা করার জন্যে।

পথ অনেকখানি। তবু সুকুমারের হেঁটে যাওয়াই উচিত ছিল। তার পুঁজি ক'মে এসেছে। কিন্তু ভাবলে, এতখানি পথ এই রৌদ্রে হেঁটে রক্তমুখে ঘর্মাক্ত কলেবরে গিয়ে উপস্থিত হলে হেড্‌মাস্টার হয়তো কিছু ভাবতে পারেন। শিক্ষকের একটা সম্মান আছে তো? এ সব ক্ষেত্রে পাঁচটি পয়সার মমতা করা ঠিক হবে না। অবশ্য চাকরি যে হবেই এমন নিশ্চয়তা কিছু নেই। কিন্তু না হয়, গেলই সামান্য ক'টি পয়সা। সংসারে থাকতে গেলে

এই অকৃপণতা এবং ঔদার্যের জন্যে সুকুমার মনে মনে বেশ আত্ম-প্রসাদ অনুভব করলে।

বাস থেকে নেমে সুকুমার যখন স্কুলে পৌছুল তখনও স্কুল বসেনি। ক্লাসে ক্লাসে বাজার বসে গেছে এমনি চিৎকার উঠেছে। একটা ঘরে কয়েকজন শিক্ষক বেশ রসালাপ জমিয়ে তুলেছেন। সেটা বোধ হয় টিচার্স কমন্ রুম। তার পাশের ঘরটা আফিস। দারোয়ানকে বলতে দারোয়ান তাকে সেই ঘরে হেডমাস্টারের কাছে নিয়ে গেল।

ভদ্রলোকের বয়স হয়েছে। পঞ্চান্নর নিচে নয়। গায়ে একটা লংক্লথের কোট, তার উপর চাদর। মাথায় টাক। মুখে পরিপুষ্ট পাকা গোঁফ। সুকুমারের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে তিনি তাকে বসতে বললেন।

সুমুখের খাতাগুলোর দিকে একবার অপাঙ্গে চেয়ে বললেন, আপনি এম-এ পাশ করেছেন?

সুকুমার হুঁ দিলে।

—কিসে?

—ইংরেজিতে।

—কোন্ ক্লাস্?

—সেকেণ্ড ক্লাস।

হেডমাস্টার ভ্রূ কুঞ্চিত করে কি যেন ভাবলেন। অন্যমনস্কভাবে টাকটা একবার খশ খশ করে চুলকুলেন। বললেন, কোন্ বৎসর পাস করেছেন?

সুকুমার তাও বললে।

—এতদিন কি করছিলেন?

একটু ইতস্তত করে সুকুমার জবাব দিলে, বিশেষ কিছুই নয়।

—তুই একটা মাস্টারি করেছেন কখনও?

সুকুমারের মুখ শুকিয়ে গেল। বললে, না।

হেডমাস্টার আবার খশ খশ করে টাকটা চুলকুলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার এ লাইন ভালো লাগবে ? তা ভেবে দেখুন।

ভেবে দেখার কিছু নেই। সুকুমার পাস করার পর থেকে কোথাও একটা প্রোফেসারির জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে এবং এখনও করছে। কিন্তু প্রথমত খালিই কোথাও বড় একটা পড়ে না। বুড়ো বুড়ো প্রোফেসার, মাসে পঁচিশ দিন যাঁদের শরীর অসুস্থ থাকে, ক্লাস নিতে পারেন না, কণ্ঠস্বর যাঁদের এমন ক্ষীণ হয়ে গেছে যে সামনের বেঞ্চেও পৌঁছয় না—লিখতে গেলে হাত কাঁপে, সেজন্যে বোর্ডের দিকে সহজে এগুতে চান না—তাঁরা অবসর নেওয়ার চিন্তাও করেন না। খালি হবে কোথা থেকে ? যদি দু'একটা কোথাও খালি হয়, তারাও ফার্স্ট ক্লাস লোক চায়, আর সেই কলেজের প্রাক্তন ছাত্র হলেই ভালো হয়। সুতরাং সেকেণ্ড ক্লাস এম-এ'র স্কুল-মাস্টারি ছাড়া উপায় কি ?

আর সত্যি সত্যি কেরানিগিরির উপর সুকুমারের কেমন একটা জন্মগত বিতৃষ্ণাও আছে। তারা কোনো পুরুষে চাকরি করেনি। মার্চেন্ট অফিসে যে ভাবে কেরানীরা কাজ করে বলে শুনেছে, তার ভয় হয় তেমন ভাবে সে একটা দিনও কাজ করতে পারবে না। তবু চেষ্টা যে করেনি তা নয়, কিন্তু সে অভাবের তাড়নায়। এখন একটা স্কুল-মাস্টারির সম্ভাবনায় সে পুলকিত হয়ে উঠল। সুকুমার খুব বেশি টাকার প্রার্থী নয়। সংসারের মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান করার পর নিজের মনে একটু লেখাপড়া করার অবসর পেলেই সে সন্তুষ্ট। সে সুযোগ এবং সে সুবিধা মাস্টারি ছাড়া আর কিছুতে মিলবে না। বছরে চার মাস ছুটি আর কোন্ চাকরিতে আছে ?

সুকুমার আনন্দের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে জানালে, মাস্টারি তার খুব ভালো লাগে। হেডমাস্টার মশাই প্রবীণ, বিচক্ষণ ব্যক্তি। ছেলেমানুষের ভাব-বিলাসিতায় ভোলেন না। একটু হেসে বললেন, অত তাড়াতাড়ি বলবেন না, একটু ভেবে বলুন।

তাঁর হাসির ভঙ্গিতে আর কথার ইঙ্গিতে সুকুমার থতমত খেয়ে গেল। কি বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে রইল।

হেডমাস্টার সুমুখের খাতার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন :

—আমাদের সময়ে তাই ছিল বটে। ভদ্রলোকের অভাবও কম ছিল, টাকার লোভও কম ছিল। সেজন্যে বেশি লেখাপড়া শিখে কেউ বড় কেরানীগিরির দিকে যেত না। শিক্ষকতার মতো এত বড় সম্মান তো আর কোথাও নেই, এমন মহৎ কাজও আর কিছু নয়। সুতরাং দু'পাঁচটা টাকা কম পেলেও বহু লোকের সম্মানে ও শ্রদ্ধায় তা পুষিয়ে যেত। এখন দিন গেছে বদলে। মানুষের অভাব বেড়েছে, টাকার লোভও বেড়েছে। ভালো ভালো ছেলেরা এখন ইউনিভার্সিটির সার্টিফিকেটের জোরে বেশি মাইনের যে কোনো চাকরিতে ঢুকে পড়ে, অন্তত চেষ্টা তো করে। নিতান্ত থার্ডক্লাস লোক সেদিকের প্রতিযোগিতায় সুবিধা করতে না পেরে আসে এই দিকে। বসে না থাকি, ব্যাগার খাটি।

হেডমাস্টার হা হা করে হেসে উঠলেন।

বড় বড় গোঁফে আর খোঁচা খোঁচা দাড়িতে এতক্ষণ সুকুমারের মনে হচ্ছিল, লোকটি বড় কঠিন লোক। এখন তাঁর হাসি দেখে সে যেন ভরসা পেলে। মনে হল, বাইরে থেকে দেখে যত কঠিন মনে হয়, তত কঠিন লোক উনি নন। মনটি সেকালের শিক্ষকের মতো সরল।

হেডমাস্টার বললেন, ব্যাগার খাটাই হয়েছে। ছেলেদেরও বিদ্যে হচ্ছে তেমনি!

তার পরে একখানা মোটা খাতা দুম করে সামনের দিকে ফেলে দিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন, চুলোয় যাক। কি করবেন ভেবে বলুন। এখানে মাইনে সামান্য, তিরিশটি টাকা। লিখতে হবে যাট। তবে হাঁ, স্কুলে মাস্টারি করলে দুই একটা ভালো ট্যুইশন মেলেই। তাতেই পুষিয়ে যায়। কি করবেন?

ভদ্রলোক ঘড়ির দিকে চাইলেন। স্কুল বসতে আর মিনিট পাঁচেক আছে। অন্যান্য শিক্ষক একে একে আসেন আর রেজিস্টারে নাম সই করে চলে যান। যাবার সময় একবার সুকুমারের দিকে আড়চোখে চেয়ে যান।

সুকুমার স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল। মাইনে মোটে তিরিশটি টাকা, কিন্তু লিখতে হবে

ঘাট। এ প্রথা যে অনেক স্কুলে কতকটা জ্ঞাতসারেই চলে, সে সংবাদ সুকুমারের অবিদিত নয়। এ নিয়ে সে নিজেও কত আলোচনা, কত তর্ক, কত হাস্যপরিহাস করেছে। আত্মসম্মান সম্বন্ধে সচেতন কোনো ব্যক্তি কি করে এই হীনতা স্বীকার করে শিক্ষকতা গ্রহণে সম্মত হয়, তা নিয়ে সে যথেষ্ট বিস্ময় প্রকাশ করেছে। আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে কেরানীগিরি করা চলে, অন্য আরও অনেক কাজই করা চলে, কিন্তু শিক্ষকতা নয়। শিক্ষক মনুষ্যত্বের প্রতীক। তাঁর উপর ছেলেদের মানুষ করার ভার। ছেলেরা তাঁকে দেখে মনুষ্যত্ব অর্জন করে। তিনি যদি এই মহৎ কার্যে ব্রতী হবার পূর্বে আত্মসম্মানবোধে জলাঞ্জলি দেন, তবে আর তাঁর রইল কি ?

সুকুমার যত তর্ক করেছে তত শিক্ষকদের উপরই চটেছে। তাঁরা এই হীনতা স্বীকার করে যান কেন ? এই প্রথম বুঝল, কেন তাঁরা যান। দারিদ্র্যের দুঃখ কত বড়। চারিদিকে চেয়ে কোথাও যখন কোনো আশা দেখা যায় না তখন মানুষ কি করতে পারে !

কতক লজ্জায়, কতক ক্রোধে সুকুমারের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু দুঃখ পেয়ে পেয়ে এই বয়সেই তার যথেষ্ট সংযম এসেছে। চক্ষের পলকে সে ভেবে নিলে তার সংসারের আভ্যন্তরীণ অবস্থার কথা এবং এখন থেকে কিছু সাহায্যও করতে না পারলে পরে আরও কি শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াবে, সেই কথা। সে সঙ্গে সঙ্গে ওতেই রাজি হয়ে গেল।

হেডমাস্টার মশাই আর কিছু বললেন না। তাকে নিয়োগপত্র দিয়ে বলে দিলেন, পরের দিন থেকে আসবার জন্যে। তার পূর্ববর্তী শিক্ষকের রুটিন অনুযায়ী কাজ করতে অসুবিধা হবে কি না তাও জিজ্ঞাসা করলেন। সুকুমার রুটিনে চোখ বুলিয়ে দেখলে। কিছু অসুবিধা হবে না। উপরের শ্রেণীতে তাকে ইংরিজি আর ইতিহাস পড়াতে হবে। এ দুটোই তার ভালো জানা।

বললে, না, কিছু অসুবিধা হবে না।

—আচ্ছা, তাহলে কাল থেকে আসবেন।

মেসে এসে সুকুমার এই সুসংবাদেব কথা জানাতেই সবাই এসে ছেঁকে ধরলে। বললে, খাওয়াতে হবে। দশ টাকার কম ছাড়ছি না।

বেশ! ষাট টাকা লিখে ত্রিশ টাকা পাবে। তার মধ্যে মেসে খাওয়াতে হবে দশ টাকা!

কিন্তু সমস্ত কথাও সুকুমার স্পষ্ট করে বলতে পারলে না। এম-এ পাশ করে ত্রিশ টাকা মাইনের মাস্টারিতে ঢোকার লজ্জা কম নয়। আবার ষাট টাকার কথা বলাও মিথ্যাচার। সে আমতা আমতা করে শুধু বললে, না, না, সে রকম ভালো মাইনে নয়। তেমন হলে খাওয়াতাম বই কি—নিশ্চয় খাওয়াতাম। আপনাদের বলতে হত না!

—ভালো মাইনে নয় মানে? পঞ্চাশ টাকা তো বটেই।

সুকুমার হাসলে। বললে, সে আর শুনে কাজ নেই। ওই তো বললাম, তেমন সুবিধাজনক নয়।

—আরে মশাই, পাঁচ টাকার কমে হবে না। তা যত কমই মাইনে হোক না কেন।

সুকুমারও আর এ নিয়ে দর কষাকষি করতে চাইল না। পাঁচটা টাকাই খাওয়াতে রাজি হল। স্থির হল, রবিবারে সাধারণত যে ফিস্ট হয় তারই সঙ্গে ওই পাঁচ টাকা দিয়ে আরও একটু ভালো খাওয়ার ব্যবস্থা হবে।

সুকুমার সন্ধ্যার সময় টুইশানে বেরিয়ে যাবার পরে এ নিয়ে মেসে সভা বসল। সুকুমারের মাইনে কত হতে পারে, এ কথা জানার আগ্রহ সকলেরই অত্যন্ত বেশি।

—কি গো রায় মশাই, বলুন না সুকুমারবাবুর কত মাইনে। আমরা তো আর কেড়ে নিচ্ছি না।

রায়মশাই বিব্রত হয়ে বললে, আমি কি করে জানব বলুন। আপনারাও যেখানে—আমিও সেখানে।

—সে কি আর একটা কথা হল! আপনি হলেন তার most intimate friend—এক ঘরে থাকেন।

রায়মশাই খানিকটা ফাঁকা হেসে বন্ধুত্বের কথা উড়িয়ে দিলে। সত্যি সত্যি মাইনের কথা সে জানেও না। নানা রকম অনুমান চলল। কেউ বলে দশ, কেউ পনেরো, কেউ চল্লিশ। স্থির কিছুই হল না। তবে সবাই এই ভেবে আনন্দ পেলে যে মাইনে চল্লিশের বেশি কিছুতে নয়, বরং কমই হবে। প্রাইভেট স্কুল তো, বিশেষ কলকাতার।

জগদীশ মেসে মাতব্বর ব্যক্তি। বেঁটে, থস্‌থসে মোটা। গলার জোর আছে। আস্তে কোনো কথা বলতে পারে না। তার গলার জোরে সবাই হার মেনে তাকে সামনের জায়গা ছেড়ে দিয়েছে। বি-এ পাশ করে অনেক ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে অদৃষ্টের জোরে একটা বীমা কোম্পানীতে চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছে। চাকরির বাজারে তার অভিজ্ঞতা জন্মেছে প্রচুর।

বললে, কলকাতার প্রাইভেট স্কুলের কথা আর বলবেন না। ও একটা রীতিমত ব্যবসা। অন্তত দুটো স্কুলের কথা আমি জানি—যেখানে ওই আয়ে সেক্রেটারির সংসার চলে। মাস্টারের মাইনে তো দু'পাঁচ টাকা কখনও দেয়, কখনও দেয় না। আবার মজা কি জানেন—গলা অপেক্ষাকৃত নামিয়ে বললে--লম্বা ছুটির আগে দেয় চাকরি ছাড়িয়ে।

জগদীশ হো হো করে হেসে ঘর ফাটিয়ে দেবার মতো করলে।

সবাই উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কেন? কেন?

জগদীশ মাতব্বরের মতো স্থূল উরুতে একটা চাপড় মেরে বললে, বুঝুন না কেন?

বুঝতে না পেরে সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

জগদীশ বুঝিয়ে দিলে, ছুটির মাইনে ফাঁকি দেবার জন্যে। এ আর বুঝলেন না?

সকলের বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে জগদীশ আবার একবার তার পেটেণ্ট হাসি হাসলে।

সকলেই অভাবগ্রস্ত। কেউ চাকরি করে খায়, কেউ সেই চেষ্টায় রয়েছে। সমস্ত বছর খাটার পর লোককে লোকে ঠকাচ্ছে—এ কথা শুনলে আঘাতটা যেন তাদের নিজের গায়েই পড়ে।

ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, এর প্রতিকার নেই?

জগদীশ গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বললে, না।

বললে, কি প্রতিকার করবেন? খাতায় আর আইন-কানুনে সব ঠিক আছে যে! আর লোকের পেটে ভাত নেই, কে বড়লোকের সঙ্গে গাঁটের পয়সা খরচ করে মামলা করতে যাবে বলুন? সে ঝঞ্ঝাটই বা পোয়ায় কে? সবাই বিদেশী নিরীহ ভদ্রসন্তান। বলুন বটে কি না!

সবাই সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লে।

জগদীশ বলতে লাগল, তারা বড় লোক। টাকার জোরে হয়কে নয় করে দেবে।

রায়মশাই শান্তভাবে নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছিল। বিস্মিতভাবে বললে, এরা সব বড় লোক? অথচ

ভারিক্কি চালে হেসে জগদীশ বললে, মস্ত বড় লোক। বাপ বিস্তর টাকা রেখে গেছেন। হয়তো এটর্ণি, কিম্বা উকিল, কি ধরুন ডাক্তার। বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, আরও আনুষঙ্গিক এটা-ওটা আছে। দানের ফর্দে মাঝে মাঝে খবরের কাগজে নাম বেরয়। আর কি চান?

না, আর কিছুই চাই না। একে বড়লোক, খবরের কাগজে নাম বেরয়। তাতে তার সঙ্গে 'এটা-ওটার' ইঙ্গিত জড়িয়ে আছে। রস জমাবার পক্ষে এই যথেষ্ট। আর এ এমন প্রসঙ্গ যে, কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে প্রাণ আকুল করে দেয়। আরও আশ্চর্য, একজন ভদ্রলোকের চরিত্রের উপর এত বড় কলঙ্ক সম্বন্ধে কেউ একটা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করলে না। সকলেই এটাকে স্বতঃসিদ্ধ বলে শিরোধার্য করে সহাস্যে রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করতে লাগল।

কেবল রায়মশাই একবার জিজ্ঞাসা করলে—অবিশ্বাস করে নয়, ভিতরের কথা আরও কিছু টেনে বার করবার জন্তেই বোধ হয়—বললে, আপনার যত বাজে কথা! কিছু প্রমাণ আছে?

জগদীশ রায়মশায়ের মূর্খতায় হো হো করে হেসে উঠল। বললে, বিলক্ষণ! প্রমাণ নেই তো কি! রাজ্যশুদ্ধ লোক একথা জানে। তারা কি প্রমাণ না পেয়েই বলে? বলুন, বটে কি না!

এমন যুক্তির উপর আর কথা চলে না।

অরবিন্দ বললে, বটেই তো। যা রটে তার কতক বটে, বুঝলেন? আমাদের দেশের বড়লোকদের কথা আর বলবেন না।

বলে নাক সিঁটকালে।

রায়মশাই বলেই বেকুব। কিন্তু বেকুব সে হল না, সকলের সঙ্গে সমানে হাসতে লাগল।

অরবিন্দ 'দেশের কীর্তি'র নিয়মিত পাঠক। শুধু 'দেশের কীর্তি' নয়, এক পয়সা দামের যতগুলি সরস সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে সবগুলি নিয়মিত কিনে পড়ে।

বড়লোকের কেচ্ছার আলোচনায় সে সগর্বে সুমুখের দিকে এগিয়ে এসে বললে, চিনি সবাইকে মশাই! পাঁচ বছর হল কলকাতায় এসেছি—চিনতে আর কাকেও বাকি নেই। দেশের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে।

—যা বলেছেন!

উৎসাহ পেয়ে অরবিন্দ চোখ পাকিয়ে বললে, আর শুনেছেন আমাদের দেশপূজ্য কনকবাবুর কথা?

কথাটা আজকের বিকেলের কাগজে বেরুলেও এরই মধ্যে সবাই শুনেছে। তবু—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস ভনে শুনে পুণ্যবান॥

সবাই আর একবার অরবিন্দের মুখে শোনবার জন্যে গ্রীবা বাড়িয়ে উৎসাহের সঙ্গে বললে, না, শুনিনি তো। কি রকম—শুনি, শুনি।

এতগুলি লোকের কূপমণ্ডূকতায় দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হয়ে অরবিন্দ বললে, আর শুনি, শুনি! কলকাতা শহর তোলপাড় হয়ে গেল, আর আপনারা অম্লানবদনে বলছেন, না শুনিনি তো। কি যে মেসের কোটর চিনেছেন! আপিসের ছুটি হবে, আর ছুটতে ছুটতে এসে গুহায় ঢুকবেন। কৌতূহল বলে কোনো পদার্থ যদি আপনাদের মধ্যে থাকে!

সকলে নিঃশব্দে এই তিরস্কার সহ্য করলে।

স্কুল-মাস্টারের মতো ধমক দিয়ে অরবিন্দ বললে, আমার ঘর থেকে 'দেশের কীর্তি'খানা নিয়ে এসে পড়ে দেখুন।

জগদীশ উৎসাহভরে তার মোটা গলায় চিৎকার করে বললে, কিনেছেন না কি? বেশ, বেশ! অরবিন্দবাবু আছেন বলে মাঝে মাঝে বুঝতে পারি, কলকাতা শহরে আছি।

অরবিন্দ মনে মনে পুলকিত হলেও প্রকাশ্যে গোঁ গোঁ করে বললে, ওই আনন্দেই তো আছেন! মাঝে মাঝে দু' একটা পয়সা বাজে খরচ করবেন। কলকাতা শহরে থাকতে গেলে অমন পয়সায় গিঁট বেঁধে থাকলে চলে না, বুঝলেন?

মনোহর তখন ছুটেছে অরবিন্দের ঘর থেকে কাগজখানা আনতে।

রায়মশাই অরবিন্দের অভিযোগ নিঃশব্দে হজম করে বললে, রাস্তায় হকারের চিৎকার শুনছিলাম বটে! খুব বিক্রি হচ্ছে, না?

—বিক্রি?—অরবিন্দ যেন অকস্মাৎ বোলতার কামড় খেয়ে চমকে লাফিয়ে উঠল।

বললে, বলেন কি মশাই! এক পয়সার কাগজ, বেরুবার এক ঘণ্টার মধ্যে আমি কিনেছি দু'পয়সা দিয়ে। এতক্ষণ বোধ হয় চার পয়সায় উঠেছে। একবার রাস্তার দিকে চেয়ে বললে, উঃ! কি বিক্রি! Selling like hot cakes! ভিড় ঠেলে যায় কার সাধ্য!

মনোহর বারান্দা থেকেই চিৎকার করে পড়তে পড়তে ঘরে ঢুকল :

কোমরেতে চন্দ্রহার, হাতে ফুলের বালা,
চিনতে পার কে নটবর এমন ভুবন-আলা ?
ফুল্‌-ধনুকে টান্‌ জুড়েছে পৃথ্বী টলমল্‌,
কোন্‌ তরুণীর বুকের মাঝে ফুটল শতদল !
ঈশান কোণে মেঘ লেগেছে নদেয় এল বাণ,
চিরকুমার ব্রহ্মচারীর প্রাণ করে আনচান।
সাপের লেখা, বাঘের দেখা, রাষ্ট্রপতির দান,
রূপকুমারীর গেল ভেসে কুল-শীল-মান।
কনক শতদলের হল দার্জিলিঙে ছেলে।
নগরবাসী, দেখবি আসি সমস্ত কাজ ফেলে।

এই ছড়াই বটে। অফিস থেকে আসবার পথে সকলেরই কিছু কিছু কানে গেছে। অবশ্য এর সঙ্গে হকার তার নিজ সাহিত্য-প্রতিভা দিয়ে আরও ছুটো লাইন যোগ করেছে :

ছুটি পয়সা খরচ করে
দেখুন মশাই পড়ে পড়ে।

ছড়ার উপর একখানা বাজে ছবিও আছে : একটি লোক, চোখে চশমা, গোঁফ-দাড়ি কামান, হাতে ফুলের গহনা, কোমরে চন্দ্রহার, ফুলধনু নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার সামনে একটি মেয়ে তার পায়ের তলায় একটি শিশুকে রেখে হাঁটু গেড়ে করযোড়ে বসে আছে।

মেসের সবাই উল্লাসে হরিধ্বনি করে উঠল।

পরের দিন দশটার সময় সুকুমার ধোপ-দুরস্ত কাপড় জামা প'রে স্কুলে গেল। চাদর ছিল না, একজনের কাছ থেকে ধার করে নিলে। একটু অসুবিধা হল

জুতো জোড়া নিয়ে। বেচারার একেবারে অন্তিম সময় উপস্থিত। তালিতে তালিতে তার আর তালি মারবার স্থানও অবশিষ্ট নেই। সব আঙুলেরই স্থান হয়, কেবল কনিষ্ঠাঙ্গুলির কিয়দংশ বাইরে বেরিয়ে থাকে। তার আর কি করা যায়! জুতো তো আর ধার মেলে না।

হেড মাস্টার অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা মহোল্লাসে বরণ করেও নিলেন না, আবার মুখ ফিরিয়েও রইলেন না। শিক্ষক এক ছাড়ছেন, আর আসছেন। ক্রমাগত যাওয়া-আসা দেখে দেখে তাঁদের মনে সম্ভবত মায়াবোধ জন্মেছে। এ সংসার—বিশেষ করে এই স্কুল যে পান্থনিবাস—সে সম্বন্ধে কারও আর তিলমাত্র সংশয় নেই। ফলে আহ্বানও নেই, বিসর্জনও নেই—স্কুলের এই হয়েছে দস্তুর।

ঘণ্টা বেজে গেছে। তখন আর কারও গল্প করার অবসবও নেই। সবাই নিজের নিজের ক্লাসে চলে গেলেন।

ক্লাসে গিয়ে সুকুমার অবশ্য একটু বিব্রত বোধ করল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে তা কাটিয়ে উঠল। সে সুপুরুষ এবং একমাত্র জুতো জোড়া ছাড়া পোষাকও তদুপযুক্তই করে এসেছিল। ভগবদ্দত্ত রূপের একটা শক্তি আছে। তার পক্ষে মানুষের চিত্তজয় করা সহজ হয়। সুকুমার ইতিহাস পড়াতে আরম্ভ করে দেখলে, মারাঠাদের সম্বন্ধে একটি ছেলেরও বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কি যেন ফিসফাস করছে, মুখ টিপে টিপে হাসছেও। পিছনের বেঞ্চ তো প্রায় বাজার বসাবার চেষ্টায় আছে। সুকুমার বই বন্ধ করে প্রথমে সামনেব বেঞ্চের দুটি ছেলের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলে। নিতান্ত ঘরোয়া গল্প।

দেখতে দেখতে বাকি ছেলেগুলিও ক্রমে ক্রমে তাতে আকৃষ্ট হল। তারপরে কখন যে সে লর্ড ওয়েলেসলীর কূট নীতি আর মারাঠাদের ঘরোয়া মনোবিবাদের কথা পড়িয়ে দিলে—ঘণ্টা বাজাবার আগে পর্যন্ত কেউ টেরও পেলে না। হেড মাস্টার সামনের বারান্দা দিয়ে যখন চলে গেলেন, দেখে গেলেন ক্লাসে নিবিড়

শান্তি বিরাজ করছে। আপন কৃতকার্যতায় সুকুমারের সাহস বেড়ে গেল। সে খুব উৎসাহের সঙ্গে পড়াতে লাগল।

টিফিনের সময় যখন সে কমন-রুমে এল, তখন সেখানে শিক্ষকদের মেলা বসে গেছে। হরেক বয়সের শিক্ষক। বুড়ো আছেন, আধ-বুড়ো আছেন, ছোকরাও আছে। আর বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়ায়, আর হুঁকোর শব্দে ঘর সরগরম। তৃতীয় শ্রেণীর ইংরিজি পড়িয়ে ফিরতে সুকুমারের একটু দেরিই হয়েছিল। অর্থাৎ সকলে যেমন ঘণ্টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে কমন-রুমে এসে জুটেছিলেন, সুকুমার তা করেনি। সে তার পড়ান শেষ করে এসে জুটেছে।

অঙ্কের মাস্টার যদুপতিবাবু লিক্‌লিকে লম্বা। খিট্‌খিটে মেজাজ। বললেন, কি মশাই, এত দেরি যে! ঘণ্টা শুনতে পাননি নাকি?

সুকুমার একটু অপ্রস্তুত হয়ে সকলের মুখের দিকে চাইতে চাইতে বললে, না, এই তো ঘণ্টা পড়ল।

ভুগোলের মাস্টার অশ্বিনীবাবুর আফিম খাওয়ার অভ্যাস আছে। রোগা। গাল ভাঙা। গলাটা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে। চোখ সকল সময়েই অর্ধনিমীলিত। একটু রসিক লোক।

বললেন, এইতো নয় মশাই, পাঁচ মিনিট হল। পণ্ডিত মশাই একটা কলকে শেষ করেছেন। করে আমারটার দিকে মার্জারের ন্যায় দৃষ্টি হানছেন।

সুকুমার হাসতে হাসতে ছোকরাদের দলে গিয়ে বসল।

সায়ান্সের রমেশও সদ্য পাশ করা এম-এস্ সি। বললে, ক্লাস ছেড়ে আসতে ইচ্ছে করে না। না মশাই?

সুকুমার মাথা চুলকুতে লাগল।

বাংলার আশুবাবু সিগারেট শেষ করে বললেন, এখন নতুন নতুন খুব ভালো লাগবে মশাই। তারপরে···আপনার বুঝি এই প্রথম, না, আরও দু-পাঁচ জায়গায় হয়েছে?

—এই প্রথম।

—তাইতেই। পড়ান, পড়ান। কি ওটা?
ইতিহাসের শিববাবু একখানা 'দেশের কীর্তি' নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। কাগজখানা খুলতে খুলতে বললেন, 'দেশের কীর্তি'—শুনুন :

কোমরেতে চন্দ্রহার, হাতে ফুলের বালা,
চিনতে পার কে নটবর এমন ভুবন আলা?
ফুল-ধনুকে টান জুড়েছে পৃথ্বী টলমল,
কোন তরুণীর বুকের মাঝে ফুটল শতদল!

সমবেত শিক্ষকেরা লাফিয়ে উঠলেন।
—দেখি, দেখি, দেখি!
—কোথায় পেলেন?
—আমি শুনে পর্যন্ত খুঁজছি। বাজারে এক কপি নেই।
—দেখি, দেখি।
শিববাবু সকলের হাত থেকে কাগজখানা সুকৌশলে বাঁচিয়ে একটা বসবার স্থান খুঁজতে খুঁজতে বললেন, সেকেণ্ড ক্লাসের একটা ছেলে ক্লাসে বসে লুকিয়ে পড়ছিল। দেখতে পেয়ে ধমক দিয়ে কেড়ে এনেছি।
বলে পরিতৃপ্তির সঙ্গে হাসলেন।
অশ্বিনীবাবু পরম সমাদরে তাঁকে নিজের পাশে বসিয়ে বললেন, বেশ করেছেন। পড়ুন।
শিববাবু পড়তে লাগলেন :
একটি চড়ুই পাখী আমাদের কানে কানে এক গোপন সংবাদ দিয়া গিয়াছে। অল্প কয়েক দিন হইল, দার্জিলিঙে বাংলার ভাবী যুবরাজ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এত বড় আনন্দ সংবাদ বাংলার মুকুটহীন রাজা কেন যে গোপন রাখিয়া তাঁহার অগণিত দেশভ্রাতার মনঃপীড়ার কারণ হইয়াছিলেন তিনিই জানেন। শুনিলাম,

নবকুমারের পিতামহ সূতিকাগৃহের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রসূতির জন্য মাসিক ৩০০৲ টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করিয়াও তিনি দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। আশা করিতেছি, আগামী সংখ্যায় ফটোগ্রাফসহ এ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিতে পারিব।

যদুপতিবাবু লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, দেখছেন মশাই কাণ্ড! কি সর্বনাশ!

পণ্ডিত মশাই কেশবিরল ছোট মাথাটি নেড়ে টিপে টিপে বললেন, ডুবে জল খাওয়ার মতলব। ভেবেছিল, শিবের বাবাও টের পাবে না।

আশুবাবু চিৎকার করে বললেন, বাবা, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। হ্যাঁ, কাগজ বটে 'দেশের কীর্তি'। একেবারে হাঁড়ির খবরটি টেনে বার করে। আর কি ভাষা! কলম ধরতে শিখেছিল বটে। একটা কার্টুনও দিয়েছে না? দেখি, দেখি।

শিবুবাবু তাঁর হাতে কাগজখানা দিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, আসছে সংখ্যাটা বের হওয়ামাত্র কিনতে হবে, নইলে আর পাওয়া যাবে না। শতদলবাসিনীর ছবিটা তো একবার দেখা দরকার। কি বলেন?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

যদুপতিবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, শতদল বুঝি সেই মাগীর নাম।

অশ্বিনীবাবু চোখে একটা বিলোল কটাক্ষ হেনে বললেন, হুঁ। তবে আর শুনলেন কি? কনক-শতদলের···কি হে?

আশুবাবু ছড়াটা বোধ হয় ছাত্রদের ছন্দশিক্ষাদানের অভিলাষে মুখস্থ করছিলেন। বললেন,

কনক-শতদলের হল দার্জিলিঙে ছেলে।
নগরবাসী, দেখবি আয় সমস্ত কাজ ফেলে।

অনবদ্য!

ক'টি ছেলে কমন-রুমের বাইরে উঁকি দিচ্ছিল। অন্য শিক্ষকেরা ছড়ায় মশগুল

থাকায় তাঁদের দৃষ্টি পড়েনি। সুকুমারের চোখে চোখ পড়তেই তারা সরে গেল।

তাদের জন্যেই হোক, অথবা অন্য যে কারণেই হোক, একজন দেশমান্য নেতার সম্বন্ধে এই প্রকার উক্তি, ভদ্র-মহিলাকে মাগী সম্বোধন, সুকুমারের কোথায় যেন বিঁধছিল। কিন্তু এতগুলি লোকের আনন্দ উল্লাসে বাধা দিতে সে সঙ্কোচ বোধ করছিল।

একটু ইতস্তত করে বললে, কিন্তু এ সব মিথ্যেও তো হতে পারে।

আশুবাবু জবাব দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শিববাবু তাঁকে ঠেলে দিয়ে গলা বাড়িয়ে বললেন, পারে। তাহলে কনক চৌধুরী মানহানির মামলা আনুক না কেন।

তাঁর জ্বলন্ত চোখের ভঙ্গি দেখে সুকুমার থতমত খেয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে একবার শুধু আবৃত্তি করলে, মামলা · তা মামলা···

টেবিলে একটা চাটি দিয়ে শিববাবু বললেন, হ্যাঁ, মামলা করুক। তাহলে বুঝব।

রমেশ সুকুমারের সাহায্য করতে এল। বললে, দেখুন, কংগ্রেসের নেতা কোর্টে যান কি করে!

শিববাবু জিভে টাকান দিয়ে বললেন, হুঁ, হুঁ, কোর্টে যান কি করে! মশাই, এ 'দেশের কীর্তি'। বডলোকের কেলেঙ্কারী বার করা ব্যবসা। বিশেষ প্রমাণ না পেলে কখনই অত বড় কথা ছাপতে সাহস করত না। তা জানেন? ও তো আর আমাদের মতো নিরীহ স্কুল-মাস্টাব নয়।

বলে সকলের দিকে সগর্বে চাইতেই সকলে মাথা নেড়ে একবাক্যে তাঁর কথায় সায় দিলেন এবং এই নিয়ে যখন কলগুঞ্জন উঠছে তখন যদুপতিবাবু হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দু'টো নিচের ক্লাসের ছোট ছেলের কান ধরে হিড়হিড় করে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে এলেন। তাঁর ক্লাসে ভয়ে কারো ট্যাঁ ফোঁ করার উপায় নেই। ছেলেরা নিশ্বাস ফেললে শুনতে পান, কান এমন সজাগ।

—ওখানে আড়ালে দাঁড়িয়ে কি করছিলি রে ?

ছেলের সাড়া নেই।

—কী করছিলি ?

টানের চোটে ছেলেদের কান লাল হয়ে উঠল। ছেঁড়বার উপক্রম।

ছেলেদের হয়ে জবাব দিলে রমেশ মাস্টার। বললে, আপনাদের রসালাপ শুনছিল আর কি ?

যদুপতিবাবু ছেলেদের দুই গালে দুই চড় দিতেই তারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়ে বাঁচল। মাস্টারেরা তা দেখে একটু ঠোঁট কুঁচকে হাসলেন। যদুপতিবাবু প্রহারের জন্য বিখ্যাত।

টিফিন শেষের ঘণ্টা পড়ল। রমেশ যাওয়ার সময় শিববাবুকে বলে গেল, কাগজখানা যত্ন করে বাড়ি নিয়ে যাবেন যেন শিববাবু। আপনার ছেলেমেয়েরা পড়ে খুশি হবে।

শিববাবু হঠাৎ যেন চমকে গেলেন। তারপর অপ্রস্তুত ভাবে হাসতে হাসতে ক্লাসে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় ভুল করেই হোক, অথবা ইচ্ছা করেই হোক, আশুবাবুর কাছ থেকে আর কাগজখানা চেয়ে নিয়ে গেলেন না।

৩

এক সঙ্গে পর পর তিন দিন ছুটি পড়ল। সোম, মঙ্গল, বুধ। তার সঙ্গে রবিবার। শনিবার স্কুল সেরে সুকুমার আড়াইটার ট্রেনে বাড়ি রওনা হল। এবারে আর আগে সংবাদ দিলে না। তার কেমন ধারণা হয়েছে যথারীতি চিঠি দিয়ে বাড়ি যাওয়া তার অদৃষ্টে নেই। যখনই চিঠি দিয়েছে, কোনো না কোনো কারণে শেষ পর্যন্ত তার বাড়ি যাওয়া আটকে গেছে। এবারে যে বাড়ি যাওয়া হল সে সম্ভবত এজন্যে যে, বাড়িতে চিঠি দেয়নি।

মাস্টারি সুকুমারের ভালো লেগেছে। হোক গে মাইনে কম, কিন্তু সম্মান আছে। কে জানে, তার হাত থেকে যত ছেলে বেরিয়ে যাবে তার মধ্যে কত জন হাইকোর্টের জজ হবে, কত জন হবে মন্ত্রী, কত মেয়র, কত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার। হয়তো তারই ছাত্রদের মধ্যে ভাবীকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, ঔপন্যাসিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক আছে। আজ যাদের ইতিহাস পড়াচ্ছে তারাই হয়তো একদিন ইতিহাস গড়বে নতুন করে। পৃথিবীর মানব-সভ্যতার ইতিহাসে আনবে উজ্জ্বলতম পরিচ্ছেদ। সুকুমার খুব মন দিয়ে ছেলেদের পড়াতে লাগল। শুধু ইতিহাসের শুষ্ক ঘটনার কঙ্কাল নয়, যে সমস্ত শক্তিমান ব্যক্তি একটা জাতিকে নতুন করে গড়েছেন, কোথায় তাঁর শক্তির সত্যকার উৎস—তারই সঙ্গে সে ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। যুগে যুগে সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার সংঘর্ষে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্রামে কোথাও বা উঠেছে অমৃত, কোথাও হলাহল। বারে বারে বিচিত্র ঘটনার আবর্তে কখনও সহজ হয়েছে কঠিন, কখনও অসম্ভব হয়েছে সম্ভব। সভ্যতার শিখর উঠল আকাশ ছুঁয়ে। দেখতে দেখতে তা গেল মাটির সঙ্গে মিলিয়ে। আবার নতুন কোনো দেশে জাগল নতুনতর সভ্যতা। সুকুমার বুঝিয়ে দেয়, এ সবের কিছুই মিথ্যা নয়—পুরাতন সভ্যতার মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল নতুন আবেষ্টনে নবতর সভ্যতার জন্মের জন্যে। ইতিহাসে যা কিছু ঘটে তা আকস্মিকও নয়, অনর্থকও

নয়। সবেরই প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজনে আসে শক, আসে হূন, আসে ঝড়ের মতো দুর্বার চেঙ্গিস খাঁ। রক্তস্রোতে মাটি যায় ভেসে, হাহাকারে আকাশ যায় ফেটে। সুকুমার বুঝিয়ে দেয় তারও প্রয়োজন ছিল,—রক্তস্রোতে আর হাহাকারে, দুর্ভিক্ষে আর রাষ্ট্রবিপ্লবে নতুন মানুষের জন্ম হয়। এর জন্যে সুকুমারকে পড়াশুনা করতে হয়, খাটতে হয় বেশি করে। কিন্তু সে পরিশ্রম তার ভালোই লাগে।

ট্রেনে হঠাৎ মনে পড়ল ছেলের কথা। ওটির কথা তার বড় একটা মনেই পড়ে না। ওর কথা ভাবতে সে এখনও অভ্যস্ত হয়নি। জোর করে মনে আনতে হয়। শুনেছে দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে। কার মতো হয়েছে কে জানে। বাপের চিঠিতে অত কথা লেখা নেই। মণিমালা সেই থেকে আর চিঠিই দেয় নি। হয় তো রাগ করেছে। মণিমালার কথায় কথায় রাগ। সুকুমারের দুঃখ কত এবং কোথায়, তা সে কিছুতে বুঝবে না। কার না ইচ্ছা হয় প্রিয়-পরিজন নিয়ে এক সঙ্গে দিন কাটাই। ইচ্ছা করে কে যায় আত্মীয়-স্বজনহীন দূর প্রবাসে জীবন কাটাতে। এই যে কিছুকাল আগে তার অমন কঠিন টাইফয়েড হয়েছিল, বাড়িতে তার সংবাদ পর্যন্ত দেয়নি, পাছে সবাই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। আর বাড়িও আসেনি এই লজ্জায় যে, কখনও তাদের এক পয়সা দিতে পারেনি, কেন আবার খরচ বাড়ায়। সুকুমারের মনের সামনে স্পষ্ট জ্বল জ্বল করতে লাগল, দিনের অধিকাংশ সময় একা ঘরে পড়ে ছটফট করেছে। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। চোখে ক্রমাগত ভুল দেখেছে। দেওয়ালের দিকে চাইলেই কখনও দেখেছে মরা লোকের মুখ, কখনও অদৃশ্য হাতে কে যেন খস্ খস্ করে কি লিখে দিলে। কখন আসে দিন, কখন আসে রাত—কিছুই ঠিক করতে পারত না। কি করে যে দিন রাত কেটেছে তাও আর মনে করতে পারে না। মেসের সহবাসীদের দোষ দেওয়া যায় না। সকলেরই আফিস আছে। সে সময়টা তাকে মেসের ঠাকুর-চাকরের দয়ার উপর নির্ভর করে কাটাতেই হত। তারা অবসর এবং খুশি মতো কখনও মাথায় আইস্-ব্যাগ—মুখে এক

ফোঁটা জল দিত, কখনও দিত না। কিম্বা দিত কি দিত না তাও ভালো মনে পড়ে না। রাত্রে মেসের বাবুরা শুশ্রূষার অবশ্য ত্রুটি করত না। কিন্তু বাড়ির শুশ্রূষার কাছে সে কি শুশ্রূষা! তারা অবশ্য তাদের যথাসাধ্য করেছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঔষধ দেওয়া, পথ্য দেওয়া, বাকি কিছুই রাখেনি। ভাগ্যক্রমে একটি বিনা পয়সার ডাক্তারও পাওয়া গিয়েছিল। মেসের একটি ভদ্রলোকের আত্মীয়। নইলে পয়সা খরচ করে ডাক্তার দেখাবার শক্তি তার ছিল না। হয় বিনা চিকিৎসায় তাকে মেসে পড়ে থাকতে হত, নয় চেষ্টা-চরিত্র করে হাসপাতালে যেতে হত। বিনা পয়সার ডাক্তারকে বারে বারে ডাকা যায় না। তবু আত্মীয়ের খাতিরে এবং রোগীর অবস্থা দেখে তিনি প্রত্যহ একবার করে আসতেন। আবার কখনও বা মেসের বাবুরাই তাঁর কাছে রোগীর অবস্থা জানিয়ে প্রেস্‌ক্রিপ্‌শান নিয়ে আসত। স্থকুমারের টাকা ফুরিয়ে গেলে বাবুরা নিজের পয়সা দিয়ে তার জন্যে ঔষধ-পথ্য কিনে এনেছে। সে দেনা অবশ্য সে শোধ করেছে। তবু বলতে হবে তারা স্থকুমারের অস্থখে খুব সেবা করেছে। সত্য। কিন্তু কোথায় পাবে তারা মায়ের হাতের স্নিগ্ধ স্পর্শ, কোথায় বা পাবে প্রিয়ার নিঃশব্দ ক্লান্তিবিহীনতা! কিন্তু সেই মায়ের হাতের স্নিগ্ধ স্পর্শ, প্রিয়ার হাতের স্থমধুর সেবার লোভ উপেক্ষা করে কেন সে পড়ে ছিল মেসেব সহস্র অস্থবিধার মধ্যে? কেন? কেন? কেন? কেন এ অকারণ কৃচ্ছ্রসাধন? চলন্ত গাড়ির কামরায় বসে স্থকুমার মনে মনে বার বার মণিমালাকে প্রশ্ন করতে লাগল, কেন ছিলাম পড়ে? কেন তুমি বোঝ না পুরুষের দারিদ্র্য মেয়েদের বৈধব্যের মতো—কোথাও মাথা তুলে দাঁড়াতে দেয় না? কাঁটার মতো বেঁধে—স্থির হয়ে নীড়ের নিবিড় শান্তি উপভোগ করতে দেয় না। বিদ্যা আর একালে ঐশ্বর্য নয়। ঐশ্বর্য নয় মনুষ্যত্ব। বড়বাজারের দোকানে দোকানে নুন-হলুদ-তেজপাতার মতো সমস্ত পুরিয়া বেঁধে বেঁধে বিক্রি হচ্ছে। সব ভাড়া খাটছে। মগনলাল নিমকচাঁদ ইচ্ছা করলেই আটান্ন জন এম-এ'কে দিয়ে মশলা ওজন করাতে কিম্বা চটের গাটে নম্বর দেওয়াতে পারে।

যে কালে ছিল সেকালে ছিল, একালে আর বিদ্যায় মনুষ্যত্বে ঐশ্বর্য নেই। সমস্ত ঐশ্বর্য এসে আশ্রয় নিয়েছে ব্যাঙ্কের চেকে। আভিজাত্য পেতে গেলে চাই মোটা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স। মোটা ব্যাঙ্ক-ব্যালান্স পেতে গেলে চাই আভিজাত্য বিসর্জন। এমনি জঘন্য চক্রের মধ্যে মানুষ গেছে পড়ে।

গাড়ির মধ্যেই সুকুমার উত্তেজিত হয়ে উঠল। হতাশভাবে ঘাড় নেড়ে নিজের মনেই বলতে লাগল, মণিমালা কিছুতে এ সব বুঝবে না। আমার কোনো কথা সে বুঝতে চাইবে না।

সুকুমার এবার বাড়ি এল অনেক দিন পরে। মাস ছয়েকের কম নয়। সব তার নতুন নতুন লাগছিল। দীঘির জল ঘাটের উপর পর্যন্ত থৈ থৈ করছে। তাতে চাঁদ ভাসছে। এবারের বড় ঝড়ে বটগাছটার একটা ডাল ভেঙে পড়েছে। তাদের নিজের বাড়ির পূর্বদিকের পাঁচিলের খানিকটাও বৃষ্টিতে ভেঙে গেছে। তালপাতার বেড়া দিয়ে সাময়িকভাবে অন্দরের লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা হয়েছে। ওদিকের যশোদা বৈষ্ণবীর বাড়ির শূন্য দেওয়ালগুলো চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখলে ভয় করে। যশোদা গেল বারে মারা গেছে। বেচারির ছেলেপুলে নেই। হয় তার উত্তরাধিকারী এসে চাল-ছাপ্পর ন'কড়া-ছ'কড়ায় বিক্রি করে গেছে, নয় উৎসাহী লোকে সেগুলো ভেঙে নিয়ে গিয়ে জ্বালানিরূপে ব্যবহার করেছে!

নিশুতি রাত্রি।

সুকুমার নিঃশব্দে কিছুক্ষণ বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। কাউকে ডাকতে তার লজ্জা করছিল। অনেকক্ষণ পরে ডাক দিতে, লোচন বাইরে শুয়ে থাকে, সে এসে দরজা খুলে দিলে। তার মায়ের ঘরের দরজা খোলারও শব্দ পাওয়া গেল। ঘুমের ঘোরেও তিনি ছেলের গলার স্বর চিনতে পেরেছিলেন। তবু দ্বিধাভরে বললেন, সুকু এলি নাকি?

সুকুমার গিয়ে মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে মেঝেতেই ধুপ্‌ করে বসে পড়ল বললে, ভালো তো সব?

—হ্যাঁ, ভালো। ও বৌমা, সুকু এসেছে।

মা ঘরের ভিতর থেকে আলোটা জ্বেলে নিয়ে এলেন। মণিমালাও উপরের ঘর খুলে বেরিয়ে এল। কিন্তু নিচে পর্যন্ত এল না। সিঁড়ির আড়ালে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

মা সুকুমারের গায়ে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, ওমা, এবারে তোর কি চেহারা হয়েছে সুকু! শরীরে যে আর দেহ নেই!

মা সুকুমারের টাইফয়েড হওয়ার কথা জানেন না।

—ও বৌমা, সুকুর হাত মুখ ধোবার জল দাও। সেই কোন্ কালে বেরিয়েছে ভর্তি দুপুর বেলায়।

মণিমালা বারান্দার একধারে গাড়ু গামছা রাখলে। সুকুমার আড়চোখে একবার তার দিকে চাইলে। মুখ দেখতে পেলে না, ঘোমটায় ঢাকা ছিল।

মা বলতে লাগলেন, কি দুষ্টু ছেলেই হয়েছে সুকু! কেবল ডিগবাজি খাচ্ছে আর গড়াগড়ি দিচ্ছে!

সুকুমার জবাব দিলে না। নিঃশব্দে পা ধুতে লাগল।

মণিমালা এসে শাশুড়ীর কানে কানে কি বললে। তারপরে দুজনেই উদ্বিগ্নভাবে রান্নাঘরের দিকে গেল।

ভাত যা আছে তাতে সুকুমারের খুব হবে। আলু-পটলের ডালনা আছে। আর কিচ্ছু নেই। শাশুড়ী-বৌতে অনেকক্ষণ চুপি চুপি পরামর্শের পর স্থির হল খানকয়েক পটল ভেজে দেওয়া হোক, আর দুটো ডিম। সুকুমারের বাড়িতে হাঁস আছে অনেকগুলো। ডিমের অভাব নেই। তাড়াতাড়িতে এর বেশি আর কিছু করা সম্ভব নয়। সুকুমারের ক্ষুধা পেয়েছে খুব। রাতও হয়েছে।

মণিমালা রান্না করতে লাগল। মা আবার সুকুমারের কাছে গিয়ে বসলেন।

—তোর ইস্কুলে ক'দিন ছুটি?

—চার দিন।

—মোটে! ছ'মাস পরে এলি চার দিনের জন্যে?

মা গালে হাত দিলেন।

সুকুমার হাসলে। বললে, এবারে চারদিনই বটে। তবে আর ক'দিন পরেই তো পূজোর ছুটি—প্রায় দেড় মাস। সে সময় অনেক দিন থাকব। স্কুলের মাস্টারি, আর যাই হোক ছুটির ভাবনা নেই।

রান্নাঘর থেকে মণিমালা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল।

মা বললেন, সে শুনছি না বাছা। আসছে শুক্রবারে তোর জন্মদিন। সেদিন পর্যন্ত থেকে যেতেই হবে।

সুকুমার বিব্রত হয়ে উঠল। বললে, দোহাই মা, এবারে আর দেরি করিও না। জন্মদিন আবার আসছে বছর আসবে। সেদিন আশ মিটিয়ে তোমার হাতের পায়েস-পিঠে খেয়ে যাব। এবারে একটা দিন কামাই করলে আর চাকরি রাখতে পারব না।

সুকুমার হেসে বললে, আর বাবাকে পাঁজি দেখতে নিষেধ কোরো মা। বাবা পাঁজি দেখতে বসলে আর যাত্রার দিন খুঁজে পাওয়া যাবে না। যা খুঁৎখুঁতে তাঁর মন।

মা ছেলের হাসিতে যোগ দিলেন না। মুখ অন্ধকার করে নিঃশব্দে বসে রইলেন।

আহারাদির পর সুকুমার উপরে শুতে গেল। সেই পুরানো শয়ন কক্ষ। কিন্তু রূপ যেন তার বদলে গেছে। বাইরের রূপ নয়, অন্তরের। তাই কোথায় পরিবর্তন ধরা যায় না, শুধু অনুভব করা যায়। তার খাটখানা সেই তেমনি জায়গাতেই পাতা আছে। তার সঙ্গে আর একটি ছোট খাট যোগ করা হয়েছে। কর্তাবাবু নিজে সখ করে তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। কাঁটাল কাঠের ছোট খাট, চারিদিকে পাখা দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে ঘর আলো করে শুয়ে আছে নিমীলিত কমলের মতো সুন্দর একটি শিশু। সুকুমারের শিশু?

সুকুমার তার পায়ের গোড়ায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

কাঁচা সোনার মতো টুকটুকে রং। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। নাদুস নুদুস

ছেলে। কচি পাতার মতো দুটি কান। রাঙা রাঙা হাত, মুঠি বন্ধ। ঘাড়ের গড়ন, পিঠের গড়ন, উরুর গড়ন চমৎকার, নিখুঁৎ। সুকুমারের ইচ্ছা করছিল ওকে জাগিয়ে দেয়, কাঁদিয়ে দেয়। চেয়ে দেখলে, মণিমালা দরজার গোড়ায় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর কাণ্ড দেখছে। তার ঠোঁটের কোণে কৌতুকের হাসি দেখা যাচ্ছে। সুকুমার হেসে ফেললে।

বললে, কি সুন্দর দেখতে হয়েছে!

মণিমালা জবাব দিলে না। সুকুমার খোকনের গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলোতে লাগল। একবার ওর হাতের মুঠি খুলে দেয়, সে মুঠি লজ্জাবতী লতার পাতার মতো আবার ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়। মণিমালা দরজা বন্ধ করে তার পাশে এসে দাঁড়াল।

সুকুমারের কেমন একটা বিস্ময়ের ঘোর লেগেছে। একবার ওর রেশমের মতো নরম চুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করে, একবার রাঙা রাঙা কচি পা দু'খানি আলোর দিকে তুলে ধরে কি যে দেখে সেই জানে।

মণিমালা জিজ্ঞাসা কবল, অমন করে কি দেখছ?

—কি সুন্দর দেখ!

মণিমালা মুখ টিপে হাসলে। বললে, দেখেছি।

সুকুমার আর কিছু বললে না। ওর মনে জেগেছে বিস্ময়। কোথায় ছিল এই শিশু? সে কি ছিল তার নিজের দেহের মধ্যে ছড়িয়ে? কিম্বা মণিমালার? কোথা থেকে এল? বাপ-মায়ের মনের কামনা সত্যাই কি রক্ত-মাংসের দেহ নিয়ে আসতে পারে? আর এই আশ্চর্য রূপবান শিশু, এই কি তার কামনার রূপ!

মণিমালা বললে, তোমার মতো মুখখানি হয়েছে।

সুকুমার নিজে কিছু বুঝতে পারছে না। অবিশ্বাসের সঙ্গে বললে, আমার মতো? যাঃ!

মণিমালা হেসে ফেললে। বললে, হ্যাঁ, তোমার মতো। জিগ্যেস করো সবাইকে।

—নাক, মুখ, চোখ—সব আমার মতো ?

—তাই কি হয় ? মুখের আদলটা তোমার মতো। নাকটা হয়েছে আমার বাবার মতো। নয় ?

—অনেকটা।

—অনেকটা নয়, বড় হলে ঠিক ওই রকম হবে দেখো।

—আর চোখ ? আমার মতো ?

—বরং শ্বশুর মশায়ের মতো। তোমাদের দুজনের চোখই তো অনেকটা এক রকম। আচ্ছা, ভুরুটা নান্তুর মতো হয়নি ?

নান্তু মণিমালার ছোট ভাই।

সুকুমার খোকার ভুরুতে আঙুল বুলিয়ে দেখলে। কিছুই বুঝতে পারলে না। বললে, কি জানি।

—কি জানি কি গো! তুমি কি নান্তুকে দেখনি নাকি ?

সুকুমার হেসে বললে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

সুকুমার খোকার অদূরে খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসল। খানিকক্ষণ খোকার দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ শিউরে উঠল।

—কি হল ?

সুকুমার বললে, আচ্ছা, এমন তো হতে পারে তোমার বংশের এবং আমার বংশের, যাঁদের আমরা কেউ দেখিনি, তাঁদেরও অনেক জিনিস খোকা পেয়েছে। তাঁদের দেখিনি বলে ধরতে পারছি না। হতে তো পারে।

মণিমালা হেসে বললে, পারেই তো। তাতে আশ্চর্যের কি আছে ?

—নেই ? ভাব তো, খোকা একা নয়। ওর মধ্যে দুটো বংশের বহু লোক রয়েছে বেঁচে। সবারই কিছু কিছু চিহ্ন আপন অঙ্গে ও বইছে। এ তো আমরা এখনই দেখতে পাচ্ছি। এর পরে হয় তো দেখব, ওর বসবার ভঙ্গি আমার প্রপিতামহের মতো, কথা বলবার ভঙ্গি তোমার প্রপিতামহের মতো। আরও কত কি।

উত্তরে মণিমালা হাসলে।

খোকা প্রবীণ লোকের মতো গম্ভীরভাবে হাই তুললে। ছোট ছোট হাতে বহু কসরৎ করে আড়ামোড়া ভাঙলে।

মণিমালা তাকে কোলে তুলে নিয়ে বললে, কর্তাপ্রভুর এইবার ঘুম ভাঙল। সেই কোন্ সন্ধ্যেবেলায় ঘুমিয়েছে একবারও ওঠেনি। ভারি ঠাণ্ডা হয়েছে বাপু—তোমার মতো। কোনো ঝোঁক নেই।

মণিমালা স্নুকুমারের দিকে পিছন ফিরে বসে খোকাকে কোলে নিয়ে স্তন দিতে লাগল।

আর স্নুকুমার বসে বসে ভাবতে লাগল মান্নুষের জন্ম-রহস্যের কথা। কি করে জড় থেকে এল চেতন, দেহে এল প্রাণ, মস্তিষ্কে এল বুদ্ধি—এল মন, এল আত্মা। আজ যে শিশুর ক্ষুধা আর তৃষ্ণা ছাড়া আর কোনো বোধই নেই, একদিন সে হবে বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য। এ যেন বিশ্বাস করার মতো কথাই নয়। স্নুকুমার ভাবলে, এই শিশু, কারও কাছ থেকে এনেছে চোখ, কারও কাছ থেকে মুখ, কারও কাছ থেকে প্রবৃত্তি, কারও কাছ থেকে বুদ্ধি। যেন তাজমহল। সহস্র স্থান থেকে সহস্র বস্তু দিয়ে তৈরি তাজমহল হল সহস্রের থেকে স্বতন্ত্র। স্নুকুমারের আত্মজ স্নুকুমার নয়, তার নিজস্ব একটা সত্তা আছে।

উঠতে স্নুকুমারের একটু বেলাই হয়।

মুখ-হাত ধুয়ে চা খেয়ে যখন সে বৈঠকখানায় এল তখন পূর্বদিকের দাওয়ায় বসে কর্তাবাবু গভীর মনোযোগের সঙ্গে একখানা লম্বা হলদে কাগজ দেখছিলেন। স্নুকুমার গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলে।

কর্তাবাবু সস্মিত দৃষ্টিতে একবার তার দিকে চেয়ে বললেন, বস।

স্নুকুমার একপাশে বসল। কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, কার কোষ্ঠি ওটা?

কর্তাবাবু সগৌরবে হেসে বললেন, খোকা-ভায়ের। এখনি দিয়ে গেলেন মুখুয্যে মশাই।

মুখুয্যে মশাই রাস্তার ধারের দক্ষিণ বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছিলেন। দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ। কর্তাবাবুর ডাক শুনে এদিকে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু বলছিলেন?

কর্তাবাবু কোষ্ঠিপত্র তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, ফলাফলটা একবার সুকুকে শোনান দিকি।

তিনি নিজে একবারের উপর দু'বার শুনেছেন। পুত্রের দোহাই দিয়ে আর একবার শুনতে চান। মুখুয্যে মশায়েরও আপত্তি নেই। তিনি ভালো করে বসে আবার আদ্যোপান্ত মূল সংস্কৃত শ্লোক, আর তার ব্যাখ্যা করে শোনাতে লাগলেন।

কোষ্ঠির ফল খুব ভালো। অর্থে, স্বাস্থ্যে, বিদ্যায়, শিশু পিতৃপুরুষের মুখ উজ্জ্বল করবে। পরমায়ুও দীর্ঘ। শুনে কর্তাবাবুর মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। সগর্বে পুত্রের মুখের দিকে চাইলেন। সুকুমার নতমুখে শুনে যেতে লাগল। নিঃশব্দে। মুখুয্যে মশায়ের বলা শেষ হলে সুকুমার আস্তে আস্তে বললে, আচ্ছা, মুখুয্যে মশাই, আপনি নিজে এ সব বিশ্বাস করেন?

বিস্ময়ে মুখুয্যে মশায়ের মুখ হাঁ হয়ে গেল। কি জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না।

বিরক্ত হয়ে কর্তাবাবু বললেন, বিশ্বাস করবেন না কেন? এ কি মিথ্যে নাকি?

সুকুমার ধীরভাবে বললে, আমার কোষ্ঠিটা আছে এখানে? সেও তো উনিই করেছিলেন। একবার মিলিয়ে দেখতাম।

সুকুমারের কোষ্ঠি কর্তাবাবু সেদিনও মিলিয়ে দেখেছেন, এই মুখুয্যে মশাইকে দিয়েই। তিনি জোরের সঙ্গে বললেন, এই ভাদ্র মাস থেকে তোমার অর্থভাগ্য ভালো হবে তা পর্যন্ত স্পষ্ট করে লেখা আছে। আছে কি না?

বলে মুখুয্যে মশায়ের দিকে চাইলেন।

মুখুয্যে মশাই ঘাড় নেড়ে তৎক্ষণাৎ বললেন, আছেই তো। শাস্ত্রের বাক্য কি মিথ্যে হবার যো আছে বাবা? তবে আর শাস্ত্রবাক্য বলেছে কেন।

সুকুমার একটুখানি বিদ্রূপের হাসি গোপন করে উঠে গেল। কথা বাড়াতে তার ইচ্ছা করল না। শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা হয় কি না সে তর্ক নিষ্ফল। নানা কারণে তার নিজের আস্থা কমে গেছে। ক্রমাগত ঘা খেয়ে খেয়ে কিছুরই উপর তার আর আস্থা নেই। এটা ঠিক যুগধর্মে হয়েছে বলা যায় না। কারণ মানুষের অন্য সব কিছুর উপর থেকে আস্থা চলে গেলেও জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর থেকে যায়নি। এর প্রমাণ এই যে, দেশে জ্যোতিষ ব্যবসায়ীর সংখ্যা অনেকগুণ বেড়েছে। অন্য স্থান দূরের কথা, কলেজ স্কোয়ার, ওয়েলিংটন স্কোয়ার আর হেদুয়াতেই তো অন্তত পাঁচগুণ বেড়েছে। আগে তিনটে স্কোয়ারের ফুটপাথে তিন জন উড়িয়া করতল-আঁকা ছক পেতে বসে থাকত। সে জায়গায় এখন পাঁচ-ছয় জন করে গণৎকার সার সার বসে থাকে! তাদের কাছে ছক তো থাকেই, বনমানুষের হাড়, কালো বেরালের লেজের লোম, আরও কত কি থাকে। একটু দাঁড়িয়ে থাকলেই দেখা যায় বাঙালী, মাড়োয়ারী, হিন্দুস্থানী মায় ফিরিঙ্গি খৃস্টান পর্যন্ত হাত দেখাচ্ছে। মানুষের বর্তমান যত অন্ধকার হচ্ছে ততই ভবিষ্যতের আলোর জন্যে ব্যাকুলতা বাড়ছে। সে ব্যাকুলতা হাত দেখান ছাড়া আর কিছুতে মিটতে পারে না। কিন্তু সুকুমারের সব উল্টো। ভবিষ্যতের জন্যে আকাশ-কুসুম রচনার পালা সে এর মধ্যে সাঙ্গ করেছে। সে বলে, জ্যোতিষ শাস্ত্র মিথ্যা নাও হতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ দিতে গেলে জ্যোতিষের যে জ্ঞান প্রয়োজন তা খুব কম লোকেরই আছে।

মোট কথা গণৎকারের চাটুবাক্যে সে বিচলিত হয় না। সে গ্রামের বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বার হল।

স্যাকরার দোকানে প্রাণগোপাল আর গৌরাঙ্গ দাবা পেতেছে। প্রাণগোপালের হাতে থেলো হুঁকো। গৌরাঙ্গ একটা কঠিন কিস্তি সামলাতে বিব্রত হয়ে

উঠেছে। দুজনেরই এমন অবস্থা যে সামনে দিয়ে হাতি গেলেও টের পাবে না। ব্রজবল্লভ স্বর্ণকার একটু দূরে বসে। তার এক হাতে হাতুড়ি, আর এক হাতে একটা রূপার পাত নাইএর উপর। গৌরাঙ্গের দুরবস্থায় উভয় হাতই ক্রিয়াশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। এরা তিন জনেই সুকুমারের ছেলেবেলার বন্ধু এবং সহপাঠী। ব্রজবল্লভ পাঠশালার পর আর অগ্রসর হয়নি। প্রাণগোপাল আর গৌরাঙ্গ গোস্বামী বংশধর। যথেষ্ট শিষ্যসেবক থাকায় তাদেরও বেশি লেখাপড়া শেখার শ্রম স্বীকারের প্রয়োজন হয় নি। থার্ড ক্লাস পর্যন্ত উঠে যেই বিবাহ হয়ে গেল, তারাও তখন পড়া ছেড়ে শিষ্যসেবকের আর্থিক ও পারমার্থিক কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করলে। এরা সকলেই সুকুমারের সমবয়সী। কিন্তু সাংসারিক জ্ঞান বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক এমন একটা শ্রীহীনতা এসেছে, যাতে সুকুমারের চেয়ে তাদের অনেক বড় মনে হয়।

সুকুমার তাদের কাছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে একটু খেলা দেখতে লাগল। খেলোয়াড়রা একবার আড়চোখে তার দিকে চেয়ে নিয়ে আবার নীরবে বোড়ে চালতে লাগল।

একবার একজন বললে, এস।

আর একজন বললে, কখন এলে ?

সুকুমার উত্তর দিলে, কাল রাত্রে।

আবার নিঃশব্দে খেলা চলতে লাগল। ঘোড়ার কিস্তিতে রাজার প্রাণ-সংশয় হয়ে উঠেছে। মন্ত্রী বহু পূর্বেই মৃত। একখানা নৌকো ছিল, লাভের আশায় সেও এত দূরে পাড়ি দিয়েছে যে, তার কাছ থেকে বিন্দুমাত্র উপকারের প্রত্যাশা নেই। এ অবস্থায় বন্ধুর কুশল সবিস্তারে জিজ্ঞাসা করার সময়াভাব। সুকুমার আর একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সেনেদের বৈঠকখানার দিকে চলল।

সেনেদের বৈঠকখানা তখন মসগুল। ভবতোষ সেন সুকুমারের সঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে। তার পরে আর পড়েনি, পড়বার প্রয়োজনও হয়নি। তাদের অবস্থা খুব ভালো। অল্প কিছুদিন হল পিতৃবিয়োগের পর সাবালক হওয়ায় তার

বৈঠকখানায় ছুটির দিন সকালে সন্ধ্যায় আর অন্যদিন সন্ধ্যাবেলায় জোর আড্ডা বসে। এ আড্ডায় বেশির ভাগ স্কুল-মাস্টার। বি-এ পাশ করে কিম্বা পাশ না করে সুকুমারের যে সমস্ত সহপাঠী অথবা সমবয়সী বন্ধু বাড়িতে এসে বসেছে, তারা এখন হয় গ্রামের, নয় আশেপাশের স্কুলে মাস্টারি করছে। কেউ কেউ বা শুধুই বসে বসে জোত-জমা দেখছে, আর অবসর সময়ে সেনেদের বৈঠক-খানায় তাস-পাশা খেলছে, নয় খোশ-গল্প করছে। এদের সংখ্যা বেশি নয়। বেশির ভাগ ছেলেই কলকাতায় হয় চাকরি-বাকরি করছে, নয় তার চেষ্টা করছে।

সুকুমারকে দেখে এরা হৈ হৈ করে উঠল।

ভবতোষ তার স্থূল দেহ দুলিয়ে বললে, আরে, সুকু এসেছে। Come along, Have a cup of hot tea, ওরে কেষ্টা!

কেষ্টাকে আর এক পেয়ালা চা আনবার হুকুম হল। সেনেদের এই আসরটা হল সব চেয়ে অভিজাত আসর। এর কর্তা ভবতোষ গ্রামে থাকলেও শহুরে। কথায়-বার্তায় চাল-চলনে সে খাশ শহুরেদেরও ছাড়িয়ে যায়। আর কথায় কথায় ইংরিজি বলে।

বললে, একটা মাস্টারি পেয়েছ শুনলাম। My hearty congratulations. কবে খাওয়াচ্ছ বল। কোনো একটা গভর্ণমেণ্ট সার্ভিস পেলে না? কিম্বা কর্পোরেশনে? আমার এক মামা একাউণ্টাণ্ট জেনারেলের অফিসে বড় চাকরি করেন।

সুকুমার হেসে বললে, সে তো অনেক দিন থেকেই শুনছি। একটা চাকরি-বাকরি করে দাও, তবে তো বুঝি।

—এই এদের জিগ্যেস করতে পার, তোমার কথা লিখেছিলাম কিনা। কিন্তু কোনো উপায় নেই। মামা লিখলেন, মুসলমান ছাড়া আর কারও কোনো,

—মুসলমানই হব না কি?

সুকুমার হেসে সকলের মুখের দিকে চাইলে।

সকলেই হেসে বললে, তাই হয়ে যাও সুকু, একটা কীর্তি থেকে যাবে।

ভবতোষ বললে, The idea !

চা এল। সুকুমার চায়ে মন দিলে।

ভবতোষ বললে, ভালো কথা। ইউরোপের খবর কি হে? লড়াই-টড়াই বাধবে বলে মনে হয়?

সুকুমার হেসে বললে, আমি কলকাতা থেকে আসছি। ইউরোপ সেখান থেকে অনেক দূর।

ভবতোষ হো হো করে হেসে বললে, রাইট। স্কুলে ছেলে চরাও, আর মেসে এসে ঘুমোও। এই তো স্কুল-মাস্টারের দস্তুর।

তারপর সকলের দিকে চেয়ে বললে, আমার মেশোমশাই বলছিলেন—তাঁকে চেন তো? সম্প্রতি বিলেত থেকে ডাক্তারি পাশ করে ফিরেছেন, একদম ছোকরা। আমাদেরই বয়সী। এরই মধ্যে কলকাতায় বেশ পসারও করেছেন।—তিনি বলছিলেন, লড়াই না বেধে আর যায় না। সমস্ত তৈরি, কেবল ব্যাণ্ড বাজতে দেরি। অমনি লেফট্ রাইট, লেফট্ রাইট…

ভবতোষ বসে বসেই পা দিয়ে তাল দিতে লাগল।

বললে, কি বল মন্মথ, যাবে তো?

মন্মথ পাশের গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করে। প্রত্যহ চার মাইল হেঁটে হেঁটে তার শরীরে হাড় ক'খানি ছাড়া আর কিছু নেই। মাথা নেড়ে বললে, আমি না ভাই, আমি এমনিতেই সোজা হয়ে হাঁটতে পারি না।

মন্মথর কথা বলার ভঙ্গিতে সবাই, বিশেষ করে ভবতোষ হো হো করে হেসে উঠল।

সুকুমার হেসে বললে, তা সে যাই বল, ইউরোপে একটা লড়াই না বাধলে আমাদের আর কল্যাণ নেই।

—কেন? কেন?

সুকুমার বললে, তাহলে আবার ধানের দর, পাটের দর চড়তে পারে। আবার

ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হতে পারে। তখন তোমার আমার মতো লোকের এক-আধটা ভালো চাকরিও মিলতে পারে। আর ভবতোষের মতো লোক কোনো একটা ব্যবসায় বিশ-পঁচিশ হাজার ফেলে লক্ষপতি হতে পারে।

ভবতোষ গম্ভীরভাবে বললে, ঠিক। আমার একটা ইচ্ছেও আছে,

কি ইচ্ছা আছে তা আর ভাঙল না।

সুকুমার বললে, দেখ, এইখানে আমাদের মনে যে চিন্তা উঠেছে, পৃথিবীর সর্বত্র সকলের মনে সেই একই চিন্তা। বর্তমান অনিশ্চিত আবহাওয়ার মধ্যে সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এ আর কেউ সইতে পারছে না। সর্বত্র বেকারসমস্যা। সর্বত্র হাহাকার উঠেছে। আর তারই ওপর যুদ্ধের বাজেটে ক্রমেই একটা করে শূন্য বেড়ে চলেছে। এমন আর কতদিন চলবে? তার চেয়ে যা হয় একটা হয়ে যাক। পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক, নয় শান্তি ফিরে আসুক। এই মাঝামাঝি অনিশ্চিত অবস্থায় সব হাঁফিয়ে উঠেছে। লড়াই যদি বাধে ভবতোষ, আমার মনে হয়, শুধু এই জন্যেই বাধবে।

আড্ডাতে লড়ায়ের গল্প ভালো জমে, কেন লড়াই বাধবে তা নিয়ে গবেষণা নয়। সুকুমারের ভণিতা শুনে সকলে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল। এ বক্তৃতা যদি আর এক মিনিট চলে অড্ডার রস মাটি।

প্রভাময় তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, জার্মানীতে নাকি এমন তোপ তৈরি হয়েছে যে বার্লিন থেকে ছুড়লে প্যারিস উড়ে যাবে, এ কি সত্যি?

—কি জানি!—সুকুমার বললে।

ভবতোষ বিজ্ঞের মত বললে, জার্মানীর পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। সত্যি হওয়াই সম্ভব।

—আর সেই চুম্বক, যা একশো মাইল দূর থেকে উড়ো-জাহাজ নিচে নামিয়ে আনে?

ভবতোষ বললে, তোমাকে তো এক কথা বলে দিয়েছি প্রভাময়, ও জাতের পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই। আমার মেশোমশাই বলেন,

এদের কথায় স্থকুমারের তাক লেগে গেল। এরা যে সব খবর রাখে কলকাতা শহরে বাস করে স্থকুমার তা কোনোদিন কানেও শোনেনি।

ভবতোষ ভালো করে উঠে বসে বললে, আমার মেশোমশায় বলেন, জার্মানীতে এমন ওষুধ তৈরি হয়েছে যার এক ফোঁটা খেলে সাত দিনের মধ্যে আর মানুষের ক্ষিধেও থাকবেনা, তেষ্টাও থাকবে না। আর শুনবে কথা?

এর পরে আর কথা না শোনাই ভালো। স্থকুমার চুপ করে বসে রইল, আর বন্ধুবর্গ বিস্ময়ে বদন ব্যাদান করলে।

মন্মথর দেশপ্রীতি অপরিসীম। বিদেশীর এই প্রকার কৃতিত্ব তার বুকে বাজল। সে শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, আশ্চর্য!

কিন্তু প্রভাময়ের দেশপ্রীতি তারও চেয়ে বেশি। সে তাকে একটা ধমক দিয়ে বললে, এর আর আশ্চর্য কি? আমাদের শাস্ত্রে আছে, পুরাকালে দেবতারা অমৃত পান করতেন, এও তাই আর কি!—আর একবার সকলের দিকে চেয়ে প্রভাময় সগর্জনে বললে,—ওরে বাপু, জার্মান ফার্মান কত দেখলাম, কিন্তু আমাদের দেশে যা ছিল তার চেয়ে বেশি কেউ কিছু করতে পেরেছে কি? আমাদের পুষ্পক রথ ছিল, ওরা এরোপ্লেন করেছে। অমৃত ছিল তাই আবার নতুন করে আবিষ্কার করেছে। বেশিটা কি?

ভবতোষ উৎসাহ দিয়ে বললে, ব্রাভো!

—নারদের ঢেঁকি ছিল বাহন। তাই দিয়ে তিনি দিবারাত্র স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ঘুরে বেড়াতেন। আরে বাপু, ঢেঁকি কি আর বাহন হয়? সেও এই মত এরোপ্লেন আর কি। একটু বুঝে দেখলেই তো হয়।

মন্মথও পূর্বপুরুষের গৌরবে মনে মনে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিল। কিন্তু তবু একটা সমস্যা যায়নি। একটা ঢোক গিলে বললে, কিন্তু এই তোপটা?

অর্থাৎ এই তোপটার একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই যেন মন্মথ নিশ্চিন্ত হয়।

সে ব্যবস্থা করে দিলে প্রভাময়। সে মুখ দিয়ে এক প্রকার অস্ফুট বিকৃত শব্দ করে যেন কলের তোপটাকে তিন হাজার মাইল দূরে ছিট্‌কে ফেলে দিলে। বললে, ওঃ, তোপ! আরে বাবা, মহাভারতে পড়নি? অর্জুন বাণে বাণে জয়দ্রথের মাথাটা নিয়ে গিয়ে ফেললে, তার বাপ তপস্যা করছিলেন, তাঁর কোলের ওপর। তার মানেটা কি?

সত্যিই তো, তার মানেটা কি? তার মানে পাওয়া গেলে এই কলের তোপের মানে পেতে এক মিনিটও লাগবে না। সকলেই আনন্দে হর্ষধ্বনি করতে লাগল।

সুকুমার হেসে জিজ্ঞাসা করলে, তাতে আমাদের সুবিধাটা কি হল?

—সুবিধা?—সকলে অবাক হয়ে বললে,—আমাদের সুবিধা আবার কি? যা ছিল তাই বলছি।

সুকুমারের কথাটা পাগলের প্রলাপের মতো হেসে উড়িয়ে দেবার জন্যে সকলে এক সঙ্গে অট্টহাস্য করে উঠল।

বললে, সুবিধা আবার কি? তুমি যে এম-এ পাশ করলে, তাতে সুবিধাটা কি হল? সবই কি সুবিধার জন্যে হয়?

হয় না। অন্তত সুকুমারের এম-এ পাশের বিদ্যা দিয়ে তর্ক জেতার সুবিধাও হয় না। আজ সকালে উঠেই তো কর্তাবাবুর কাছে একবার ঠকে এসেছে। আবার এখানেও সেই ঠকা।

সুকুমার একটুখানি ফিকে হেসে বললে, তা ঠিক। অন্তত আমার এম-এ পাশে যে কোনোই সুবিধা হয়নি, এ একেবারে ধ্রুব সত্য।

তারা সুকুমারকে আঘাত দেবার জন্যে ও কথা বলেনি। তর্কের মুখে বলে ফেলেছে। সুকুমারের কথায় একটু লজ্জা অনুভব করে বললে, না, না, আমরা সে ভাবে কথাটা বলিনি।

ভবতোষও সান্ত্বনা দিয়ে বললে, সুকু, মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, কথাটা সেভাবে নিওনা। ওরা সে মনে করে বলেনি।

সুকুমার তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললে, না, না, মনে আমি কিছুই করিনি। কেবল

ভবতোষ তার হাত ধরে বসিয়ে বললে, যেতে দাও। আর এক কাপ চা হোক। ওরে কেষ্টা!

৪

এবারে কলকাতায় ফিরে সুকুমার কেমন যেন একটা শূন্যতা অনুভব করতে লাগল। জীবনে এ অনুভূতি তার প্রথম। থেকে থেকে হঠাৎ তার খোকার জন্যে মন কেমন করে। পথে চলতে চলতে কোনো খেলনা দেখলে কখনও বা কিনেই ফেলে, কখনও মনে মনে স্থির করে রাখে—পূজোর সময় কিনে নিয়ে যেতে হবে। কাপড়ের দোকানের শো-কেসের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে খোকার জন্যে কি রঙের জামা কিনতে হবে। কোন্ রঙের জামা মানাবে ভালো। এমন তার কখনও হয়নি। পূজোর জন্যে কাপড়-জামা যা কিছু কেনা হয়, সব তার বাবাই কেনেন। সেজন্যে সে কখনও বিব্রত বোধ করেনি। এ সম্বন্ধে তার যে কোনো দায়িত্ব আছে তাও অনুভব করেনি। মণিমালাকেও মাঝে মাঝে তার স্মরণ হয়। কিন্তু এবারে আর একা নয়। কোলে খোকা। খোকাকে কোলে নিলে মণিমালার কেমন যেন রূপ বদলে যায়। তার সর্বদেহে কেমন যেন নতুনতর মাধুর্যের সঞ্চার হয়।

তবু নানা কাজের মধ্যে দিন তার আগের মতোই কাটে। আগের দুটো ট্যুইশান সে ছেড়ে দিয়েছে। সেখানে মাইনে বড় কম। তার বদলে তার নিজের স্কুলের দুটি বড়লোকের ছেলেকে পড়াচ্ছে। পঁচিশ টাকা করে পঞ্চাশ টাকা পায়। আর একটা সুবিধা দুটি ছেলেই ভালো। তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাও করে। সে বড় কম সুবিধা নয়। প্রাইভেট মাস্টারকে যেখানে কর্মচারী বলে

গণ্য করে, সেখানে পড়াতে আত্মসম্মানে যত ঘা লাগে এমন আর কোনোখানে নয়।

এই ঘটনায় সুকুমারের মনে আর একটা পরিবর্তন এল। শাস্ত্রবাক্য সম্বন্ধে তার যে একটা ঔদাসীন্য এসেছিল সেটা গেল ঘুচে। তার মনে হল, জ্যোতিষশাস্ত্র একেবারে হয়তো মিথ্যা নয়। ফলত ভাদ্র মাস থেকে তার অর্থাগম যে বৃদ্ধি পাচ্ছে এ তো আর ভুল নয়। একথা যদি তার কোষ্ঠিতে থাকে তাহলে শাস্ত্র মিথ্যা বলা যায় কি করে?

অন্নসমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হওয়ায় সুকুমার নিজের এবং ছাত্রদের পড়াশুনায় আরও বেশি মনোযোগ দিতে লাগল। মাঝে মাঝে দু'চারখানা ভালো বই কেনবার সঙ্গতিও এখন তার হয়েছে। তবে পরিশ্রম বড় বেশি হয়। স্কুলে সে ফাঁকি দেয় না। সে খাটুনি আছে। তার উপর দুবেলা দুটি ভালো ছেলেকে পড়ান। সেও যথেষ্ট খাটুনি। ভালো ছেলেকে পড়াবার এমনিতেই তার একটা স্বাভাবিক লোভ আছে। এই সব করে একমাত্র ছুটির দিন ছাড়া অন্য সব দিনে রাত্রি দশটার পর নইলে আর বই খোলবার সময় পায় না। তাতেও বিঘ্ন আছে। বেশি রাত্রি পর্যন্ত আলো জেলে পড়লে সে ঘরের অন্য বাবুদের নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। তারা বিরক্ত হয় এবং প্রকাশ্যে তা বলতেও দ্বিধা করে না। কিন্তু সুকুমার তা কানে তোলে না, হেসে উড়িয়ে দেয়।

প্রবীণ শিক্ষকেরা তার এই উৎসাহের আধিক্য দেখে হাসেন। আর তার সঙ্গে নিজেদের প্রথম শিক্ষক-জীবনের দিনগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেন। তাঁরাও একদিন সুকুমারের মতো উৎসাহভরেই খেটেছেন। আর আজ?

যদুপতিবাবু সেই মান্ধাতার আমল থেকে আজ পর্যন্ত একই অঙ্কের বই ছেলেদের পড়িয়ে আসছেন। ফলে অঙ্কের বই পর্যন্ত তাঁর মুখস্থ হয়ে গেছে। বললেই হল, স্যার, একাশীর উদাহরণমালার তেরোর অঙ্কটা বুঝতে পারিনি। স্যার আর অঙ্কের বইখানা দেখবারও প্রয়োজন বোধ করেন না। মুখে মুখে বলে যান,

আর ছেলেরা খাতায় লিখে নেয়। অঙ্কের মাস্টারেরই যদি এই অবস্থা হয়, অন্য মাস্টারদের তো কথাই নেই।

অশ্বিনীবাবু তো স্পষ্টই বলেন, একঘেয়ে পড়িয়ে পড়িয়ে তাঁর এমন হয়েছে যে, ক্লাসে যাওয়ামাত্র ঘুম ধরে। প্রত্যেক ঘণ্টার অর্ধেকটা তাঁর ঘুমিয়েই যায়। কিছুটা নিদ্রা অহিফেনের কল্যাণে হলেও কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়।

সুকুমার যে স্কুলে খারাপ দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে, এর ফল যে অন্য শিক্ষকদের পক্ষে খারাপ হতে পারে সে কথা ভেবে সকলের আশঙ্কাও হয়। তাঁরা প্রায়ই এজন্যে তাকে পরিহাসছলে সতর্ক করে দেন।

যদুপতিবাবু রুক্ষ মেজাজে বলেন, কি পড়ান মশাই অত করে? অত পড়াবার আছে কি?

সুকুমার লজ্জিত হয়ে বলে, পড়ান আগেই হয়ে গিয়েছিল। মারাঠাদের সম্বন্ধে একখানা বড় ইতিহাস থেকে জায়গা জায়গা পড়ে শোনাচ্ছিলাম।

অশ্বিনীবাবু চোখে বিলোল কটাক্ষ হেনে বলেন, ও, ছেলেগুলোকে আর পাশ করতে দেবেন না স্থির করেছেন!

—কেন? কেন?

—আরে মশাই, আগে ওরা পাশ করুক। তারপরে বেঁচে যদি থাকে, ওসব পড়বার সময় ঢের পাবে।

—তার মানে?

মানেটা শিববাবু বুঝিয়ে দেন:

—মশাই, অমন করে পড়ালে ওরা ছত্রিশ বছরেও পাশ করতে পারবে না। ওদের শুধু দাগ দিয়ে দিতে হবে—কোন্‌টা দরকারি, কোন্‌টা দরকারি নয়। আর যে সব প্রশ্নের উত্তর বইতে এক জায়গায় লেখা নেই, পাঁচ জায়গায় ছড়িয়ে আছে, সেইগুলোর একটা নোট লিখে দিতে হবে। বুঝলেন? আপনি নিজেও তো পাশ করেছেন। জানেন তো, কি করে পাশ করতে হয়।

বলে সকলের দিকে গূঢ় ইঙ্গিতপূর্ণ কটাক্ষ হানলেন। অর্থাৎ সুকুমার যেন ইচ্ছা করেই ছেলেদের ফেল করাবার জন্যে এমনি করে পড়াচ্ছেন।

অশ্বিনীবাবু একটু মোলায়েম হেসে বললেন, আপনি যে রকম খাটতে পারেন মশাই, তাতে অন্য লাইনে গেলে এতদিনে অনেক উন্নতি করে ফেলতেন। চেহারাখানা তো ভালো আছে, একটা দারোগাগিরির জন্যে চেষ্টা করলেন না কেন?

এঁদের কথার ভিতরে ভিতরে প্রচ্ছন্ন জ্বালা ছিল। সুকুমার মনে মনে উত্তপ্ত হয়ে উঠল। তবু এঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সে নিজে নতুন এসেছে তাই মনের রাগ মনেই রেখে চুপ করে রইল।

অশ্বিনী আবার তেমনি মিষ্টি মিষ্টি হেসে বললেন, তাহলে এতদিনে উপর-ওয়ালার নজরে ঠিক পড়ে যেতেন। কাজেরও উন্নতি হত। এখানে মুস্কিল কি জানেন, যতদিন আমরা না মরছি, ততদিন আর কারও আমাদের ডিঙিয়ে যাবার উপায় নেই। কি বলেন?

বলে সকলের দিকে চেয়ে হাসলেন। অর্থাৎ সুকুমারের অহেতুক এত বেশি পরিশ্রম করার গূঢ়ার্থ যে কি, আর কারও বুঝতে বাকি নেই।

সুকুমার অসহ্য ক্রোধে ও ঘৃণায় চুপ করে রইল। যাঁরা অবলীলাক্রমে একজন ভদ্রলোকের কাজে এমন হীন উদ্দেশ্য আরোপ করতে পারেন তাঁদের কথার কি জবাবই বা দেওয়া যায়!

রমেশ সুকুমারের সমবয়সী, কি দু'এক বৎসরের ছোট-বড়। উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ঘটবার অবকাশ না হলেও বয়সের সমতার জন্যে একটা মিল আছে। বিশেষ প্রয়োজন বোধ করলে সুকুমার তারই সঙ্গে গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করে।

এক সময় তাকেই সুকুমার নিভৃতে ডাকলে, রমেশবাবু শুনুন।

রমেশ কাছে এসে দাঁড়াল।

—আচ্ছা, ছেলেদের জন্যে আমি একটু মন দিয়ে খাটি, এটা ওঁরা ভালো চোখে দেখছেন না কেন বলতে পারেন ?

উত্তরে রমেশ একটু হাসলে।

সুকুমার আবার জিজ্ঞাসা করলে, এতে অপরাধটা কি ?

এবারও রমেশ শুধু একটু হাসলে।

সুকুমার বললে, ওঁরা বোধ হয় ভেবেছেন আমি এই করে হেড্ মাস্টারের মন ভুলিয়ে ওঁদের ডিঙিয়ে যেতে চাই। কি হীন অপবাদ !

রমেশ পকেট থেকে একটা দেশলাই কাঠি বের করে নিঃশব্দে কান খুঁটতে লাগল। এই স্কুলে তার কিছুকাল চাকরি করা হল। স্কুলের আবহাওয়া অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে।

শান্তকণ্ঠে বললে, তাতে হয়েছে কি ! যে যা খুশি বলুক না, আপনি নিজের কাজ করে যান।

—তাই পারা যায় ? মন ভেঙে যায় না ?

রমেশ তার উত্তেজনা দেখে হেসে ফেললে। বললে, তাহলে এ লাইন আপনার পোষাবে না। আমারও অভিজ্ঞতা অবশ্য বেশি নয়, কিন্তু আপনার চেয়ে বেশি। অশ্বিনীবাবুর মতো আফিম খেতে না ধরলে এ কাজে মজা পাওয়া যাবে না। বেতন বৃদ্ধি নেই, কিছু নেই—এর রস আলসেমিতে। যে পেয়েছে, সে মজেছে। তার আর নিষ্কৃতি নেই। কখনও দু'চার বছর মাস্টারি করার পর কেউ মাস্টারি ছেড়ে অন্য কিছু করলে শুনেছেন ? তার কার্য শেষ !

রমেশ হো হো করে হাসলে।

কিন্তু সুকুমারের তখন হাসবার মতো মনের অবস্থা নয়। বললে, সব মাস্টারই কি অপদার্থ হয় ?

রমেশ ঘাড় নেড়ে রায় দিলে, সব মাস্টার। এক সাহিত্যিক হওয়া ছাড়া মাস্টারের আর সব পথ বন্ধ। দুইই কুড়ের ব্যবসা। ও দুটোতে মিল খায় ভালো।

—কিন্তু

রমেশ বাধা দিয়ে বললে, এই দেখুন না, আমি এম-এস সি পাশ করে মাস্টারিতে ঢুকে হাইজিন পড়াচ্ছি। অনন্তকাল তাই পড়াব। আমার এম-এস্ সি পড়ার সার্থকতা কোথায় বলুন? আপনি ইতিহাস পড়াচ্ছেন। নতুন নতুন খুব খাটছেনও। কিন্তু এই অল্প মাইনেয় ব্যাগার খাটতে আর কতদিন ভালো লাগবে? তখন আপনিই কুড়ে হয়ে যাবেন। আর খাটবার শক্তিও থাকবে না, উৎসাহও থাকবে না। বলুন, বটে কি না!

সুকুমার আর জবাব দিলে না। ভাবতে ভাবতে নিজের ক্লাশে চলে গেল।

রমেশের কথাটা সুকুমারের মনে ঘা দিলে। কিন্তু সে দমল না। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিলে যে, যতদিন এই সম্মানিত পদে সে আছে, ততদিন ফাঁকি কিছুতে দেবে না। যখন নিতান্ত ফাঁকি দেওয়ার লোভ সম্বরণ করা কঠিন হবে, ছেলেদের মন দিয়ে পড়াতে কিছুতে আর ভালো লাগবে না, তখন মাস্টারি ছেড়েই দেবে। সে আর এমন কি হাঙ্গামা! এমন নয় যে, মোটা মাইনের চাকরি, ছাড়তে কষ্ট হবে। ভারি তো মাইনে!

মাইনে যে বেশি নয় এ কথাটা সুকুমার কিছুতে ভুলতে পারে না। কেবলই মনকে প্রবোধ দেয় এই বলে যে, অর্থের লোভ যাদের বেশি তারা বড়বাজারে মুদির দোকান করতে পারে, কিম্বা হাওড়ার পুলে ইঁটের ঠিকা নিতে পারে, নয় তো বিলেতে গরু-ভেড়া-ছাগল চালান দিতে পারে। অধ্যাপনা—অধ্যাপনা। তার গৌরব স্বতন্ত্র। তার সার্থকতার পরিমাপ অর্থে হয় না।

মনকে প্রবোধ দেয়। কিন্তু নিজেই মনে মনে বিশ্বাস করতে পারে না এবং যত বিশ্বাস করতে পারে না তত বেশি করে মনকে প্রবোধ দেয়। আরও বেশি সে দুর্বল বোধ করে যখন তার পুরোণো চাকুরে-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়।

সেদিন চন্দ্রভূষণ এসেছিল।

চন্দ্রভূষণ তারই সঙ্গে একই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছিল। বিধির

বিপাকে উত্তীর্ণ হতে পারেনি! তখন মনে হয়েছিল বিধির বিপাকে। কিন্তু যদি পাশ করত, আর তার পরে আই-এ, বি-এ পড়ত তাহলে আর রেল অফিসে অমন চাকরি যোগাড় করতে হত না। কারণ ১৯১৮ সালে আর ২২ সালে অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করেও যে চাকরি ১৯১৮ সালে পেয়েছিল, সাধ্য কি বি-এ পাশ করেও ১৯২২ সালে সেই চাকরি সে যোগাড় করে। আজ সে মাইনে পাচ্ছে একশো পনেরো।

চন্দ্রভূষণ এখন গ্রামে একজন মাতব্বর ব্যক্তি। বছর বছর কিছু কিছু জমি কিনছে। পাঁচ জন লোকে ছেলের চাকরির জন্যে তার কাছে উমেদারী করছে। যে চন্দ্রভূষণকে সোজা ইকুয়েশন বোঝাতে মাস্টারের এক গোছা ছড়ি ভেঙে কুচি কুচি হয়ে যেত, সে আজ একাউণ্টস্ ডিপার্টমেণ্টে বড় চাকরি করে। স্কুলে যে ছিল বিখ্যাত বোকা, আজ তার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা লোকের মুখে ধরে না। জটিল কোনো গোলযোগে পড়লে মানুষ তার কাছে পরামর্শ নিতে আসে। তার চাল-চলনই বদলে গেছে।

আর সুকুমার—বেচারা বহু পরিশ্রমে ভালো করে এম-এ পাশ করে এখন ত্রিশ টাকার স্কুল মাস্টার! চন্দ্রভূষণ আর বছর পনেরো পরে যখন আড়াইশো টাকায় অবসর নেবে, তখনও ওর অবসর হবে না;—সংসার প্রতিপালনের জন্যে ওই ত্রিশ টাকাতেই তখনও মাস্টারি করতে হবে। এই বৈষম্যের জোরে সেদিনও চন্দ্রভূষণ এসে যথেষ্ট মুরুব্বিয়ানা করে সুকুমারকে নানাপ্রকার হিতোপদেশ দিয়ে গেছে। সুকুমারের নিজের মনেও কোথাও দুর্বলতা আছে নিশ্চয়। সে নিঃশব্দে চন্দ্রভূষণের হিতকথা শ্রবণ করেছে। বিদ্যার আভিজাত্য দেখিয়ে অর্থের আভিজাত্য ম্লান করতে সাহস করেনি। চন্দ্রভূষণ চলে যাওয়ার পরে সে তার স্পর্ধা দেখে মনে মনে হাসবার চেষ্টা করেছে, প্রকাশ্যে নয়।

সুকুমার মাঝে মাঝে ভাবে, কেন এমন হল? বুনো রামনাথের দেশের আবহমানকালের ঐতিহ্য একেবারে বদলে গেল কি করে? সেকালে অর্থে আভিজাত্য ছিল না, ছিল অর্থের সদ্ব্যয়ে। এই আভিজাত্য লাভ করবার জন্যে

রাজাকে রাজমুকুট ছেড়ে সকলের সঙ্গে পথের ধুলোয় এসে দাঁড়াতে হয়েছে। আজ আভিজাত্যলাভ সহজ হয়েছে। তার জন্যে আত্মবিসর্জনের প্রয়োজন নেই। দেশের কল্যাণে সেই অর্থ নিয়োগ করারও আবশ্যকতা নেই। শুধু পকেটে থাকলেই হল। মধুলোভী মক্ষিকার মতো কাঙাল মানুষের দল দিবারাত্র স্তুতিগুঞ্জনে তাকে ঘিরে রাখবে। এরও পর ধনী যদি দু' এক টুকরো উচ্ছিষ্ট মাঝে মাঝে এদের দিকে ছুঁড়ে দেন তাহলে তো আর কথাই নেই। সে তো দেখতে দেখতে কলকাতার মেয়র হবে—তা তার বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র যত নিকৃষ্টই হোক না কেন। মানুষের বাজার দর এই রকমই দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু মানুষের এত কাঙালপনা এল কোথা থেকে? প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসের উপরও মানুষের লোভ যে নেই তা নয়, কিন্তু তার জন্যে সহজে সে আত্মবিক্রয় করতে চায় না।

রমেশ বলে, মানুষের এই অবস্থা এসেছে নিতান্ত পেটের তাগিদে। দিন রাত্রি অভাবের মধ্যে থেকে তার এমন হয়েছে যে, দু'বেলা পেটপুরে খাওয়ার পরেও যার প্রচুর অবশিষ্ট থাকে তাকে ভাগ্যবান বলে ভাবতে শিখেছে।

সুকুমার বাধা দিয়ে বলে, তা শিখুক। অর্থভাগ্যে তারা যে ভাগ্যবান, এ বিষয়ে তো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারা যে অসাধারণ লোক এ কথা ভাবে কেন?

—কে বললে ভাবে? হয় তো ভাবে না। তাদের নিন্দা যে এরা কতখানি উপভোগ করে সে তো 'দেশের কীর্তির' বিক্রি দেখেই বুঝতে পারেন।

এ কথা সত্য। সুকুমার নিজের চোখেই তা দেখেছে।

রমেশ বলে, যেখানে একশো জনের মধ্যে আটানব্বুই জন ভালো করে খেতে পরতে পায় না, সেখানে দু'জন যদি রোল্‌স্ রয়েস্ চড়ে বেড়ায়—তারা যে অসাধারণ এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানুষ তাতেও খানিকটা অভিভূত হয় বটে, কিন্তু লোকে সত্যিই তো আর ঘাস খায় না। এই সমস্ত অসাধারণ ব্যক্তিরা কোথায় নিতান্ত সাধারণ, তারও পরিচয় পদে পদে পায়।

—তবু কেন তার দোরেই অহোরাত্র পড়ে থাকে?

—সেই প্রশ্নই আমারও। আমার মনে হয়, ওইটুকুই কাঙালের দুর্বলতা। সে যাকে ঘৃণা করে, তারও পা না চেটে পারে না। লক্ষ্মীর প্রসাদ যারা পায় না অথচ লোভ আছে ষোলো আনা—তারা লক্ষ্মীর প্রসাদের সান্নিধ্য অনুভব করতে ভালোবাসে। ওইটেই তার রোগ।

কিন্তু এ সমস্ত বড় বড় কথা। দূর থেকে তর্ক করে এ দুর্বলতার সত্যকার পরিচয়ও পাওয়া যায় না, মীমাংসাও হয় না। কেবল দু'জনে মিলে টিফিনের সময়টা কাটানো হয়। এই মাত্র।

টিফিনের সময়টা ওদের দু'জনেই কাটে। প্রবীণ শিক্ষকদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপের জ্বালায় সুকুমার সহজে কমন-রুমে যায় না। নিতান্ত একা সময় কাটান মুস্কিল বলে রমেশকেও সাধ্য-সাধনা করে নিয়ে আসে। রমেশ কখনও ওখানে, কখনও এখানে—এমনি করে টিফিনটা কাটিয়ে দেয়।

ইতাবসরে আর একটা ঘটনা ঘটল যাতে প্রবীণ শিক্ষকদের সঙ্গে তার আপোষের আশা সুদূরপরাহত হয়ে গেল।

হেডমাস্টার স্কুলের পাঠ্য পুস্তকের নোট লিখে কিছু টাকা উপার্জন করেন। যে কারণেই হোক, হয় তো অনেকদিন ধরে নোট লেখার জন্যেই, তাঁর নামের একটা বাজার দর হয়েছে। সেই কারণে ছাত্র-মহলে যেমন তাঁর নোটের চাহিদা বেশি, প্রকাশক-মহলেও তদনুরূপ। ফলে এমনও হয় যে, অন্য লোকের লেখা নোট তাঁকে একটা রয়ালটি দিয়ে তাঁর নামে চালান হয়। যে বেচারি কষ্ট করে লিখেছেন তিনি সামান্যই পান। কিন্তু বই লেখার বিন্দুমাত্র পরিশ্রম স্বীকার না করেও হেডমাস্টার পান মোটা টাকা। কিছুকাল থেকে তাঁর মনে ছেলেদের জন্যে একখানা ইতিহাসের বই লেখবার সঙ্কল্প জেগেছে। নিজের তাঁর সময় নেই, পরিশ্রম করার শক্তিও নেই। সেই জন্যে ইচ্ছা সত্ত্বেও সে সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে পারেন নি। সম্প্রতি সংসারানভিজ্ঞ সুকুমারকে দেখে আবার সে সঙ্কল্প জেগেছে।

এই উদ্দেশ্যে তাকে একদিন নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠালেন এবং আস্তে আস্তে কথাটা ভাঙলেন।

বললেন, দেখুন আপনার পড়ানোর পদ্ধতি দেখে আমি খুশি হয়েছি। এমন কি সেক্রেটারীকে পর্যন্ত বলেছি যে,

বিনয়ে সুকুমার মুখ নত করলে।

হেডমাস্টার আরও একটু ভণিতা করে হঠাৎ বললেন, আচ্ছা, আপনি বই-টই লেখেন না কেন? এই ছেলেদের টেক্সট্ বুক? কি নোট?

সুকুমার নিজের সম্বন্ধে এ কথা কখনও ভাবেনি। কিন্তু অনেকের কাছে অনেক কথা শুনেছে তো। বললে, সে তো অনেক ঝামেলা।

—ঝামেলা অবশ্য আছে। কিন্তু একবার চালাতে পারলে লাভ আছে।

সুকুমার হাসলে। পাল্টা হেডমাস্টারের স্তুতি করবার জন্যে বললে, আমার বই তো আপনার মতো বিক্রি হবার আশা নেই।

হেডমাস্টার এ প্রশংসায় খুশি হলেন। হেসে বললেন, হতেও পারে তো।

সুকুমার ঘাড় নেড়ে বললে, তা হয় না। বই তো অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু আপনার অর্ধেক বিক্রি কারও তো হতে দেখলাম না।

—সে ঠিক।—হেডমাস্টার বললেন,—তোমাদের পাঁচজনের দৌলতে আমার বই আর পাঁচজনের চেয়ে বেশিই বিক্রি হয়। কিন্তু ক'দিন থেকে তোমার সম্বন্ধেও একটা কথা ভাবছি।

বলেই তাড়াতাড়ি মোলায়েম সুরে বললেন, তোমাকে 'তুমি' বলছি বলে মনে কিছু করলে না তো? তোমাদের আজকালকার ভদ্রতাটা আমার ঠিক রপ্ত হয়নি। হাঃ হাঃ হাঃ। প্রায়ই ভুল হয়ে যায়।

সুকুমার তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, সে কি কথা! আপনি আমার গুরুস্থানীয়। আমার বয়সী কত ছেলে আপনার হাত দিয়ে পাশ করে গিয়েছে। আপনি যে 'আপনি' বলতেন তাতেই আমার লজ্জা করত।

হেডমাস্টার খুব খুশি হয়ে বললেন যাকৃগে। তোমার সম্বন্ধে কি কথাটা ভাবছি শোন।

সুকুমার উৎসুক দৃষ্টিতে চাইলে।

হেডমাস্টার গাঢ় নিম্ন স্বরে বলতে লাগলেন, দেখ মাস্টারি অনেকে করতে আসে। অনেক মাস্টার দেখলাম। দেখে দেখে আমার ধারণা হয়েছে যে, তারা শিক্ষকতা করার উদ্দেশ্যে আসে না, আসে নিতান্ত পেটের দায়ে। স্পষ্ট কথাই বলি, তোমার সম্বন্ধেও প্রথমে সেই ধারণা হয়েছিল। কিন্তু তোমার শিক্ষাদানপ্রণালী, আর তোমার আন্তরিকতা দেখে সে ধারণা বদলে গেছে। বলে তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইলেন।

সুকুমার নতমুখে তাঁর কথা শেষ হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

হেডমাস্টার বলতে লাগলেন, কিন্তু দেখ, যারা সত্যি সত্যি চিরজীবন শিক্ষকতা করতে চায় তাদের তো আর ত্রিশ টাকায় চলবে না। ওতে আর তার আন্তরিকতা কতদিন স্থায়ী হবে? দেখছি কিনা, সব ওড়বার ওপরেই আছে। কোথাও যা হোক কিছু পেলেই হল, তখনই পালাবে—পনেরো দিনের নোটিশ পর্যন্ত দেবে না।

ভদ্রলোক আবার হাসলেন।

সুকুমার ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। সে নিজেও এই কথাটা ক'দিন ধরে ভাবছে।

হেডমাস্টার বললেন, তা সে তাদের যা হবার তাই হোক, তোমার একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। ভাবছিলাম,

হেডমাস্টার চুপ করলেন।

সুকুমার উৎসুক এবং উৎসাহিত হয়ে চাইলে।

হেডমাস্টার বললেন, ভাবছিলাম ওই বই লেখার কথাটাই। কিন্তু—একটু থেমে বললেন—দেখ স্পষ্ট কথাই ভালো। তুমি অবশ্য ছেলে ভালো, পড়াশুনাও কর, তোমার শিক্ষাদান প্রণালীও চমৎকার। তুমি যদি লেখ সে

বই নিশ্চয়ই ভালো হবে, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। তবু তোমার বই বাজারে চলবে না—

বলে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্থকুমারের দিকে চাইলেন।

একটু থেমে বললেন, যদি তোমার নামে চালাও।

স্থকুমার দ'মে গেল। বললে, সেই কথাই তো বলছিলাম।

হেডমাস্টার আর একটু দম ধরে থাকলেন। হঠাৎ আদর্শবাদের স্থর বদলে কাজের কথায় এলেন। বললেন, দেখ বাপু, সংসারে টাকা নিয়ে কথা। তুমি যদি সেই জিনিসটাই পাও, নাম নাই বা হল ?

বলে জিজ্ঞাস্থ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

স্থকুমার কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে এদিক ওদিক চাইতে লাগল। কি উত্তর দেবে ভেবে পেলে না।

হেডমাস্টার কথাটা আরও স্পষ্ট করে বলবার চেষ্টা করলেন। দেওয়ালের দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন, এই রকমই দেশের অবস্থা হয়েছে। ভালো লোকের লেখা সত্যিকার ভালো বই চলে না, আর আমার নামে ছাই পাঁশ যে যা লিখে ছাপাচ্ছে তা আর পড়তে পাচ্ছে না, হু হু করে কাটছে।

স্থকুমার অগাধ জলে ভাসছিল। এতক্ষণে যেন মাটিতে পা ঠেকল। সংসারে টাকা নিয়েই কথা কি না সে বিষয়ে অনেক কিছুই তার অবশ্য বলবার আছে, কিন্তু আপাতত কিছু টাকার তার বিশেষ আবশ্যক হয়েছে। তাদের সাংসারিক অবস্থা ভিতরে ভিতরে যাই কেন না দাঁড়াক, বাইরের ভড়ং এখনও ঠিকই আছে। সেই ভড়ং পাড়াগাঁয়ে রাখতে বেশি বেগ পেতে হয় না। কিন্তু কোনো ক্রিয়া-কর্ম পড়লেই মুস্কিল। এতদিন তাদের সে হাঙ্গামা ছিল না। কিন্তু এবারে ছেলের অন্নপ্রাশন এসে একেবারেই গলায় আটকেছে। অনেক কাল পরে বাড়িতে কাজ এসেছে। প্রথম পৌত্রের অন্নপ্রাশন। যে-সে পৌত্র নয়, অনেক সাধ্যসাধনার ধন। যেমন তেমন করে সারা চলবে না। এ ক্ষেত্রে বিশেষ একটু ধুমধাম না করলে সব গুমর ফাঁক হয়ে যাবে। ভিতরের সব কথা

জানাজানি হতে আর বাকি থাকবে না। এই সব স্মরণ করিয়ে দিয়ে কর্তাবাবু দিন কয়েক আগে সুকুমারকে পত্র দিয়েছেন যে, এক মাসের মধ্যে তাকে অন্তত একশো টাকা এই জন্যে পাঠাতে হবে। বাকি টাকা তিনি নিজে যে প্রকারে হোক সংগ্রহ করবেন। একশো টাকা এককালীন দেওয়া সুকুমারের পক্ষে অসম্ভব। তার তো ওই আয়। তাও নিয়মিত পায় না। এই অবস্থায় হেডমাস্টার মশায়ের প্রস্তাব শুনে সে আর সংসারে টাকাই বড় কথা কিনা সে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলে না।

জিজ্ঞাসা করলে, ওতে কি রকম পাওয়া যায়?

হেডমাস্টার একটু হিসাব করে বললেন, তা নিতান্ত মন্দ বলা চলে না। ফর্মা পিছু টাকা পনেরো দেয় বোধ হয়। তা সে তুমি রাজি হলে আমি একটু চাড় দিয়ে আরও এক-আধ টাকা বেশিও আদায় করে দিতে পারব। সেজন্যে আটকাবে না।

সুকুমার এর বেশি আর কিছু জানতে চাইলে না। কাকে ফর্মা বলে, কত পৃষ্ঠা লিখলে পনেরো টাকা পাওয়া যাবে, সে সব প্রশ্ন করা অনাবশ্যক বিবেচনা করলে। তার মোট প্রয়োজন একশো টাকার।

সেই হিসাবে জিজ্ঞাসা করলে, কত বড় বই লিখতে হবে?

—ফর্মা দশেক।

সুকুমার মনে মনে হিসাব করে দেখলে দেড়শো টাকা।

খুশি হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কোন ক্লাসের বই?

—এই ক্লাস ফাইভ-সিক্স।

কিন্তু সুকুমারের টাকাটা মাসখানেকের মধ্যে প্রয়োজন। তার মধ্যে কি বইখানা শেষ হবে? কিছু টাকা অগ্রিম পাওয়া যায় না?

হেডমাস্টার তাতেও রাজি হলেন। সুকুমার তাঁর ঔদার্যে মুগ্ধ হয়ে খুশি মনে বাড়ি চলে এল।

সুকুমারের টাকার কিছু ব্যবস্থা হল, কিন্তু স্কুলে আর টেঁকবার পথ রইল না।

মাস্টারেরা কি করে টের পেয়ে গেলেন, হেডমাস্টার সুকুমারকে দিয়ে বই লিখিয়ে নিচ্ছেন। তাতে তার কিছু অর্থাগমও হবে। এর পরে আর কোনো মাস্টারেরই সন্দেহ রইল না যে, হেডমাস্টারকে খোসামোদ করা ছাড়া সুকুমারের এই প্রাণপাত পরিশ্রমের আর কোনোই উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু তাঁরা প্রকাশ্যে কিছু বলতে সাহস করলেন না। কেউ পরম ঔদাস্যসহকারে পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন, কেউ বা বড় জোর মুখ টিপে একটু হাসলেন। সকলেই সর্বপ্রকারে সুকুমারের সান্নিধ্য এড়িয়ে চলতে লাগলেন। এমন কি বন্ধুবর রমেশচন্দ্রেরও তার সম্বন্ধে উৎসাহ কমে এল।

সুকুমার কি রকম একা বোধ করে। কেমন একটা লজ্জাও অনুভব করে। ইচ্ছা হয় রমেশের কাছে প্রকারান্তরে এই প্রসঙ্গ তুলে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করে। সে যে হেডমাস্টারের অনুগ্রহ ভিক্ষা করেনি, তিনিই নিজে থেকে তার এই উপকার করেছেন এ কথাটা অন্তত রমেশকেও বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু রমেশকে সে ডাকতে গিয়ে পিছিয়ে আসে। কেমন যেন সাহসে কুলোয় না। বহু লোকের ক্ষুব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে সে অকারণে সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

কিন্তু টাকার প্রয়োজন তার অত্যন্ত বেশি। অভাবগ্রস্ত লোকের চক্ষুলজ্জা বেশি দিন থাকে না। থাকা ভালোও নয়। বিশেষ মনের মতো করে একখানা ছেলেদের ইতিহাস লেখার নেশা তাকে যেন পেয়ে বসল। মনের মতো একখানা ইতিহাস। ঘটনার শুষ্ক বোঝায় তরলমতি ছেলেদের জীবন দুর্বহ মনে হবে না। তারা গল্পের মতো আনন্দের সঙ্গে পড়ে যাবে—শুধু শুক্‌নো ঘটা নয়, তার অন্তর্নিহিত তত্ত্বও। তেমনি একখানা ইতিহাস কি করে লিখতে হবে, কেমন করে ছেলেদের চিত্ত আকর্ষণ করবে সহজে, এই চিন্তাই তার মনের মধ্যে প্রবল হল। অন্য দেশে ছেলেদের ইতিহাস কি ভাবে লেখা হয় তাই জানবার চেষ্টা তাকে পেয়ে বসল। বাড়িতে এ সুসংবাদ জানিয়ে একখানা চিঠি দিলে। মাণমালা লিখলে, এ সবই তার খোকার কল্যাণে। আসবার সময় তার জন্য এক সেট রূপোর থালা-বাসন যেন আনা হয়।

তাহলেই তো বিপদ! খোকার কল্যাণে তার এই উন্নতি কি না ভগবান জানেন। হতেও পারে। অন্তত কার্য-কারণ থেকে সে কথা যদি কেউ বলে, তার বিরুদ্ধে বলবার কিছু নেই। আবার নাও হতে পারে, সমস্তই কাক-তালীয়বৎ। কাকটা তালের উপর থেকে চলে গেল, সঙ্গে সঙ্গে তালটাও পড়ল, তার থেকে একথা প্রমাণ হয় না যে কাকটাই তালের পতনের কারণ। তা হোক। তবু তার খোকা তার জন্যে এই অভাবিত ভাগ্যপরিবর্তন বয়ে এনেছে একথা ভাবতে তার ভালো লাগে। খোকা নয়ন মেলার সঙ্গে সঙ্গে তার সংসারে এল আনন্দ, এর চেয়ে খুশির খবর আর নেই। কিছু রূপোর থালা-বাসন? সে যে সুকুমারের পক্ষে অনেক বেশি টাকা? অত টাকা সে পাবে কোথায়? মোট একশো টাকাই তো পাবে। তার সমস্তটাই বাপের হাতে দিতে হবে। এক মাইনে। কিন্তু তার সম্বন্ধে নিশ্চয়তা কিন্তু নেই। স্কুলের যে অবস্থা, নিয়মিত মাইনে পাওয়া যায় না। হেডমাস্টার তার সম্বন্ধে যথেষ্ট সদয় আছেন। কেঁদে-কেটে ধরলে কিছু টাকা হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু কত টাকা কে জানে। হয় তো পাঁচ টাকা, নয় তো বড় জোর দশ টাকা। কিছুই ঠিক নেই। এক ভরসা টুইশানির। কিন্তু তাতে হাত দেওয়া চলবে না। গেল মাসে বাড়ির চাহিদা মেটাতে গিয়ে মেসের পুরো টাকা দিতে পারেনি। কিছু বাকি আছে। এ মাসে সমস্ত মিটিয়ে না দিলে তার আর সম্মান থাকবে না। অথচ রূপোর থালা-বাসন, তার খোকা শুভান্নপ্রাশনের দিন ব্যবহার করবে। খোকা কি খেতে শিখেছে? সে নাকি বড় দুরন্ত হয়েছে। বাড়িময় হামাগুড়ি দিয়ে ঘুর্ ঘুর্ করে ঘুরে বেড়ায়। দুষ্কর্ম করে, আর অখাদ্য খায়। ভাবতেও সুকুমারের হাসি আসে! রূপোর থালা-বাসনে নানারকম খাবারের সামনে বসে সে কি করতে পারে তাই সুকুমার ভাবতে লাগল। এই সর্বপ্রথম তার মনে হল সে বড় দুঃখী। নিজেকে এত বড় দুঃখী সে আর কখনও ভাবেনি। তার মনের ভিতরটা যেন হু হু করে কেঁদে উঠল। এত বড় অপদার্থ সে! এত অকর্মণ্য! তার জীবনে ধিক!

কর্তাবাবুর ইচ্ছা ছিল অন্নপ্রাশনে বিশেষ একটু ধুম করবেন। তিনি নিজে দুশো টাকা সংগ্রহ করেছেন। সুকুমার একশো টাকা দেবে। এই তিনশো টাকায় গ্রাম ষোলো আনা বেশ ভালো করেই খাওয়ান হবে। এর মধ্যে লৌকিকতা বাবদ কিছু টাকা আসবে, প্রায় শতখানেক। সুতরাং কর্তাবাবুর খরচ দুশো টাকার মধ্যেই।

স্থির হয়েছিল ফটকে নহবৎ বসান হবে। আর থাকবে একদল ব্যাণ্ড। আর দেশের মুচির বাজনা তো আছেই। আর লোক খাওয়ান হবে প্রায় হাজারখানেক। বেশি কিছু নয়—ভাত, দুটো ডাল, পটলভাজা, বড়া, কুমড়ার তরকারি, কপির তরকারি, মণ কয়েক মাছ, দই, ক্ষীর, পায়েস আর তিন রকমের মিষ্টি।

কিন্তু বাধা পড়ল।

প্রথম, মাস ছয়েক পূর্বে মুখুয্যেদের কয়েকটি ছোকরা গোপনে মুরগী খেয়েছিল। রন্ধন এবং আহার গোপনেই হয়েছিল, কিন্তু পরে এই কুখাদ্য ভক্ষণের কথাটা তারা আর গোপন রাখেনি, প্রকাশ্যেই স্বীকার করেছিল। তাদের প্রায়শ্চিত্ত করার কথা বলা হয়। কিন্তু তারা কিছুতে সম্মত হয়নি। এখন চাটুয্যেদের এবং তাঁদের অনুগত ব্যক্তিদের বক্তব্য এই যে, অন্নপ্রাশনের ভোজে মুখুয্যেদের নিমন্ত্রণ হলে তাঁরা খেতে আসবেন না।

দ্বিতীয় গোলযোগ হালদারপাড়ায়।

সুরেশ্বর হালদারের কনিষ্ঠা কন্যা কিছুকাল পূর্বে গৃহত্যাগ করেছে। একে তো তারই শোকে, লজ্জায় ও ঘৃণায় সুরেশ্বর বাড়ির বাহির হয় না। কর্তাবাবুর পৌত্রের অন্নপ্রাশনে সানন্দে যোগ দেবার মতো অবস্থা এমনিতেই তার নেই। তার উপর এই উপলক্ষ্যেই তাকে জব্দ করবার জন্যে ওর পাড়ার আত্মীয়-স্বজনরা উঠে-পড়ে লেগেছে। তারা এসে কর্তাবাবুকে স্পষ্টই জানালে, সুরেশ্বরকে নিমন্ত্রণ করলে তারা এ কাজে নেই।

সুকুমার বললে, সুরেশ্বরের দোষ কি ?

—তার কন্যা···

—তাঁর কন্যা। তিনি নিজে তো যাননি। কন্যার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি তাঁকে করতে হবে ?

—নিশ্চয়ই। সেই রকমই শাস্ত্রের বিধান।

—শাস্ত্র !

সুকুমার কি একটা কঠোর মন্তব্য করতে গিয়ে থেমে গেল।

কর্তাবাবু বিরক্তভাবে সমাগত সকলকে বললেন, বাপু, আমার নাতির ভাতে গ্রাম-ষোল-আনা খাওয়াব সেই রকমই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তা পরিত্যাগ করলাম।

তা ছাড়া উপায়ও ছিল না। চাটুয্যেরা তাঁর শত্রু নয়, মুখুয্যেরাও তাঁর কাছে কোনো অপরাধ করেন নি। একজনকে চটিয়ে আর একজনকে খুশি করে তাঁর কোনোই ইহলৌকিক উপকার নেই। সুরেশ্বর হালদারের সামাজিক অপরাধ সম্বন্ধে যদিচ তিনি সুকুমারের সঙ্গে একমত নন, তবু তার শাস্তিবিধানের উপলক্ষ্য হতেও মন সরল না। সেজন্য নিমন্ত্রণ করলেন বেছে বেছে, অর্থাৎ নিতান্ত যাদের না করলে নয় তাদেরই। ফলে আড়ম্বরও খাটো হল, ব্যয়ও সঙ্ক্ষেপ হল। কেবল সঙ্ক্ষেপ হল না সামাজিক গোলযোগ। অন্নপ্রাশনের দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, গোলযোগের সূত্রও তত বেড়ে যেতে লাগল। অবস্থা ক্রমেই অধিকতর জটিল হতে লাগল। মুখুয্যেরা চাটুয্যেদের সন্তানদের বিরুদ্ধে এমন কতকগুলি অভিযোগ আনলেন যার সামাজিক গুরুত্ব মুরগী খাওয়ার মতো অতখানি না হলেও নিতান্ত কম নয়।

চাটুয্যেদের সন্তানদের মধ্যে মদ্যপান কেউ না করলেও তাড়ি কেউ কেউ খান। দু'তিন ঘরের অবস্থা কিঞ্চিৎমলিন হওয়ায় তাঁরা বাড়ির সংলগ্ন জায়গায় শাক-সব্জির চাষ করেছেন। সেই শাক-সব্জি তাঁরা নিজেরা মাথায় করে হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রীও করেন। আরও একটা কথা বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেছে যে, প্রাণগোপাল বিদেশে

কতকগুলি বেশ্যাকে মন্ত্র দিয়ে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করেছে। তাদের গৃহে নিশ্চয়ই সে আহারও করেছে। প্রাণগোপাল অবশ্য চাটুয্যেদের কেউ নয়, কিন্তু তাদেরই দলভুক্ত। অপর দিকে সুরেশ্বর তার আরও কয়েকঘর স্বজাতির গৃহের এমন কতকগুলি সর্বজনবিদিত গোপনীয় কেলেঙ্কারী সর্বসমক্ষে ডাক পেড়ে বলতে লাগল যে, একটা বড় রকম ফৌজদারি মামলা বাধতে বাধতে নিতান্ত ভাগ্যক্রমে আটকে গেল।

এই গোলযোগের নিবৃত্তি হল অন্নপ্রাশনের দিন—যখন দেখা গেল কর্তাবাবু এই গোলযোগের পাণ্ডাদের সকলকেই বাদ দিয়ে বেছে বেছে মাত্র কয়েকজন নির্বিরোধী লোককে নিমন্ত্রণ করলেন। নিবৃত্তি হল তখনই। হঠাৎ। তখন এতবড় একটা নিমন্ত্রণ ফাঁক পড়ার জন্যে কারও মনে আক্ষেপ হয়েছিল কি না, সে প্রসঙ্গের অবতারণা নিষ্প্রয়োজন। তবে এতে পাড়ার ঘোঁটও কমল না, দলাদলিও একেবারে বন্ধ হল না। শুধু সাময়িকভাবে ধামা-চাপা রইল, আবার কারও বাড়ি ক্রিয়া-কর্ম হলে নতুন করে উঠবে।

মণিমালা বললে, রূপোর বাসন খুব তো আনলে!

সুকুমার কাঁচুমাচু করে বললে, সুবিধে হল না।

—তা হবে না তো। আমার ফরমাস কি না, তাই আর গ্রাহ্যই হল না। আমার বলাই ভুল হয়েছিল।

সুকুমার অপ্রস্তুতভাবে শুধু হাসলে।

—আমি নিতান্ত বেহায়া তাই চাই।

সুকুমার কর্মান্তরের অভাবে খোকাকে নিয়ে খেলা করতে লাগল।

মণিমালা কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, কখনও কিছু চাই না কিনা তাই। পড়তে অন্য মেয়ের পাল্লায় তো বুঝতে।

তার পরে চোখ মুছে বললে, সাত নয়, পাঁচ নয়, এই প্রথম ছেলে। তোমার প্রাণে কি সাধ-আহ্লাদ বলেও কিছুই নেই?

সুকুমার বলতে পারলে না, খোকার জন্য রূপোর বাসন কেনার স্বপ্ন সে দিবারাত্রি দেখেছে। বলতে পারলে না, দোকানের শো-কেস সে দিনের পর দিন দেখে দেখে বেড়িয়েছে, আর কোন জিনিস কেমনটি হলে খোকার জন্যে বেশ মানায় তাই কল্পনা করেছে। কেমন করে তার অন্তরে এই প্রথম দারিদ্র্যের গ্লানি জমল, তাও মণিমালাকে বুঝিয়ে বলতে পারলে না।

শুধু মাথা হেঁট করে বললে, টাকায় কুলোতে পারলাম না।

মণিমালা ছিটকে উঠে বললে, দেখ, মিথ্যে কথা বোলো না। ও বাড়ির মেজ বট্‌ঠাকুর তোমার চেয়ে অনেক কম রোজগার করেন। তিনি কি করে এনেছিলেন ?

তা তিনিই জানেন। সুকুমার এ কৌশলের কিছুমাত্র অবগত নয়। সে চুপ করে রইল।

তিথিটা বোধহয় শুক্লা-পঞ্চমী ছিল। আর তার সঙ্গে ছিল স্বপ্নের মতো চমৎকার কুয়াশা। ধীরে ধীরে চাঁদ মেঘে ঢেকে গেল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগল। একটু থামে, আবার নামে। মেঘ আর কিছুতে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয় না। সকালে উঠে সুকুমার দেখলে যতখানি মনে করেছিল তেমন বৃষ্টি হয়নি। রাস্তার যেখানটা খাল, সেখানে হয়তো একটু কাদা হয়েছে। বাকি পথে মাত্র ধূলোটাই গেছে। তবে মেঘ এখনও কাটেনি। অল্প কুয়াশাও রয়েছে—গাছের পাতায় পাতায়, বনফুলের ঝোপে ঝোপে, দূর দিগন্তের কোলে কোলে মাকড়সার জালের মতো কুয়াশা রয়েছে। ধানের পালা বেয়ে খড়ের চাল বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জলও থেকে থেকে পড়ছে। হয়তো আবার বৃষ্টি পড়বে।

শীত আছে। তার সঙ্গে জোলো হাওয়ার জন্যে ঠাণ্ডাও আছে। সুকুমার র‍্যাপারখানা গায়ে দিয়ে কোন দিকে বেরুবে ভাবতে লাগল।

তার ও-বাড়ির ভাইপো মিণ্টু এসে জিজ্ঞাসা করলে, আমার কুকুরের বাচ্ছাটা দেখেছ সুকুকাকা ? তাকে কোথাও পাচ্ছি না।

মিণ্টুর বয়স পাঁচ বৎসর পোরেনি। কিন্তু অনর্গল কথা বলতে পারে।

সুকুমার তাকে কোলে তুলে নিলে। জিজ্ঞাসা করলে, কি রঙের কুকুরের বাচ্ছা ?

মিণ্টু বুড়ো আঙুলটা মুখে দিয়ে একটুখানি গম্ভীরভাবে চিন্তা করে উত্তর দিল, লাল রঙের।

অর্থাৎ মিণ্টু ওই একটা মাত্র রঙেরই নাম জানে।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় ছিল তোমার কুকুরের বাচ্ছা ?

—গোয়াল ঘরে। ওর মায়ের কাছে শুয়ে ছিল।

একটু পরে বিষণ্ণভাবে বললে, পিসিমা বললে শেয়ালে নিয়ে গেছে।

মিণ্টুকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে সুকুমার বললে, তোমার পিসিমা জানে না।

মিণ্টু মাথা নেড়ে বললে, না, শেয়ালে নেয় যে! আরও কত বাচ্ছা নিয়ে গেছে।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। তিনটে চারটে বাচ্ছা নিয়ে গেছে। কত সুন্দর সুন্দর বাচ্ছা। শেয়াল ভারি দুষ্টু। না কাকা ?

—আজ শেয়ালটাকে মারব। কেমন ?

মিণ্টু মাথা নেড়ে শেয়াল মারার অনুমতি দিলে। বললে, রোজ কুলতলায় কুল খেতে আসে।

সুকুমার তাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বললে, আচ্ছা। আজ কুল খেতে এলে তার দেখাব মজা।

মিণ্টু খুশি হয়ে বাড়ি চলে গেল।

সুকুমার ভবতোষের আড্ডায় যাবার জন্যে বেরুল। পথে ব্রজ স্বর্ণকারের দোকানে প্রাণগোপালের সঙ্গে দেখা। একটা থেলো হুঁকোয় সে নিবিষ্টমনে তামাক খাচ্ছে, আর বোধ হয় গৌরাঙ্গর জন্য অপেক্ষা করছে। মুখ কিঞ্চিৎ চিন্তান্বিত।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার ?

প্রাণগোপাল সমাদরে তাকে একখানা চাটাই এগিয়ে দিলে। সহাস্তে বললে, সামান্য ব্যাপার। হাজার দশেক টাকার।

—সামান্যই বটে। কি হবে ওতে?

প্রাণগোপাল হাত উঁচিয়ে বললে, গাঁয়ের ক'ব্যাটার মাথা আগে কাটব। তারপর যা হবার তাই হবে।

সুকুমার হেসে বললে, আমার মাথাটা কেট না ভাই। আর যার কাটবার কেট।

—আচ্ছা, তোমাকে রেহাই দিলাম।—বলে গম্ভীরভাবে ধূমপান করতে লাগল। একটু পরে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, গোটা দশেক টাকা ধার দিতে পার? জিনিস বন্ধক রাখব।

সুকুমার হো হো করে হেসে বললে, দশ হাজার থেকে দশ! প্রাণগোপাল অপ্রস্তুত হয়ে বললে, যা বলেছ! দশ হাজার টাকা আমার নিতান্তই আবশ্যক হয়ে পড়েছে। আমি স্বর্গ চাই না, মোক্ষ চাই না, মুক্তি চাই না, শুধু হাজার দশেক টাকা। ব্যস্!

—আর তোমার তিলক-মালা-টিকি-নামাবলি?

—ওটাও ছাড়া হবে না, বুঝেছ? ওর মধ্যেও অনেক গুহ্য তত্ত্ব আছে। সে তোমরা বুঝতে পারবে না। ওটাও থাকবে, তার সঙ্গে হাজার দশেক টাকা।

—তা মন্দ হবে না। কিন্তু তোমার গৌরাঙ্গ কই? এখনও দাবা পড়েনি যে!

—আর বোলো না। সে চাল সংগ্রহে বেরিয়েছে।

—চাল?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। যা সিদ্ধ করে ভাত হয়। আর বড়লোকে মাছের ঝোল দিয়ে, আর আমরা নুন দিয়ে খাই।

—ও।

—তবে আর দশ হাজার টাকা চাইছি কেন?

—চাল কেনবার জন্যে?

—হ্যাঁ। আর কিনব একটা রূপোর গড়গড়া আর একটা রিস্টওয়াচ। ব্যস্‌।

হুঁকোটা নামিয়ে রেখে প্রাণগোপাল বললে, তোমার কি বল! দিব্যি ঠাকুর-বাড়ির প্রসাদ মারছ. চালের দর জানবার দরকার হয় না। এবার কি আর ধান কারও হয়েছে? সব কেনা-চালের ভাত খাচ্ছে। দেখছ কি, গ্রাম সব শহর হয়ে উঠল! বেলা বারোটার পর কোনো গেরস্তর হাঁড়িতে এক মুঠো ভাত পড়ে থাকে না। হুঁ, হুঁ!

হঠাৎ দূরে গৌরাঙ্গকে আসতে দেখে প্রাণগোপাল উল্লসিত হয়ে উঠল। চিৎকার করে বললে, এই যে জননী! চাল মিলেছে? ধারে দিলে তো? না, দিলে না?

গৌরাঙ্গ এক মুখ হেসে বললে, দিয়েছে।

—এত দেরি হল যে?

—কত পট্টি দিতে হল ভাই! সহজে কি দেয়?

বলে প্রাণগোপালের হাত থেকে হুঁকোটা নিয়ে ক্ষুধার্তের মতো টানতে লাগল। তারপর সুকুমারের দিকে চেয়ে বললে, ছুটি আর ক'দিন?

—রবিবার রাত্রে যেতে হবে।

—বেশ, বেশ! প্রাণগোপাল, দাবার ছক্‌টা পাত? গোটা কতক ভালো চাল শিখে নাও।

প্রাণগোপাল হো হো করে হেসে বললে, তবেই হয়েছে! তোমার সঙ্গে খেলাই মিথ্যে, নিতান্ত সঙ্গীর অভাবে খেলি। তা যখন বলছ, ওরে বেজা, ছক্‌টা নামা। ভুবাজি দিয়ে দিই।

সুকুমার উঠল।

প্রাণগোপাল বাধা দিয়ে বললে, কোথায় যাও? গৌরাঙ্গের দুর্দশাটা একবার দেখে যাও।

সুকুমার হেসে বললে, নাঃ, খেল তোমরা। আমি একবার ভবতোষের ওখানে একটা ঢুঁ দিয়ে আসি।

প্রাণগোপাল তাড়াতাড়ি তার হাত ছেড়ে দিয়ে বললে, ওরে বাবা, হাই সার্কেলে! যাও, যাও।

সুকুমার ওদের কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচল।

মনে মনে ভাবলে, বেশ আছে এরা। তার হংস-বলাকার এরাও একটি জোড়া। কোথায় মানস সরোবর, আর কোথায় বেজা স্যাকরার দোকান! কিন্তু বেশ আছে। সমস্তক্ষণ দুটি শাকান্নের জন্যে অশেষবিধ দুঃখ-কষ্ট-গ্লানি ভোগ করছে, হয়তো সমস্ত জীবনভোরই করবে। তারই মধ্যে এই কটি মুহূর্ত দাবার কল্যাণে সব ভুলে থাকে। এইটুকুই ওদের জীবনের পরম মুহূর্ত। এ সংসারে ওদের কিছুমাত্র কামনা নেই, কামনা মাত্র দশটি হাজার টাকার। তাই নিয়ে ওরা চাল কিনবে, ডাল কিনবে, আর কিনবে একটা রূপোর আলবোলা—আর নিকেলের রিস্টওয়াচ, আর গোটা কয়েক লোকের মাথা কাটবে। ব্যাস্। ওরা স্বর্গ চায় না, মোক্ষ চায় না, মুক্তি চায় না, কিছু চায় না।

সুকুমার আপন মনে হাসলে।

ভবতোষের ওখানে দারুণ তর্ক লেগে গেছে। একে আধ্যাত্মিক বিষয়ে তর্ক, তার সঙ্গে জুটেছে চা এবং সিগারেট। সুতরাং তর্ক যে নিফাঁক হয়ে জমেছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রশ্নটা উঠেছে নিবারণ মণ্ডলের অকাল মৃত্যুতে। নিবারণ জোয়ান পুরুষ। যেমন লম্বায়, তেমনি চওড়ায়। শরীরেও যথেষ্ট সামর্থ্য। সমস্ত দিন ধান কেটেছে। সন্ধ্যার সময় শরীর একটু খারাপ করছিল। কিন্তু সে কিছুই নয়। তার উপর সে গরু-বাছুরকে খেতে দিয়েছে, নিজে খেয়ে-দেয়ে শুয়েছে। অকস্মাৎ তার শরীরটা কি রকম করে উঠেছে এবং আধঘণ্টার মধ্যে সব শেষ হয়ে গেছে। ডাক্তার আনবার সময় পর্যন্ত পায়নি।

এই একটা আকস্মিক ঘটনায় ভবতোষের চিত্তে বৈরাগ্য এসেছে। তার মনে প্রশ্ন জেগেছে, সুখ কি, দুঃখই বা কি? এসব এলই বা কোথা থেকে?

মন্মথ বললে, সমস্তই এসেছে সেই সচ্চিদানন্দ পরম-পুরুষের কাছ থেকে। কারণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একমাত্র তিনিই·সৎ। সুতরাং ভালো-মন্দ, সৎ-অসৎ, সুন্দর-কুৎসিত সবই তাঁর থেকে উৎপন্ন।

এ কথা প্রভাময় মানে না। তার মতে যিনি সৎ তাঁর মধ্যে অসতের স্থান নেই, যিনি আনন্দময় তাঁর মধ্যে শোকের স্থান নেই, যিনি সুন্দর তাঁর মধ্যে কুৎসিতের অস্তিত্ব অসম্ভব।

তাহলে ব্যাপারটা কি ?

প্রভাময় বললে, বিকৃতি। দুঃখ বলে কিছু নেই, আছে আনন্দ। আনন্দের অভাবই দুঃখ। কুৎসিত বলে কিছু নেই, আছে সুন্দর। সুন্দরের বিকৃতি কুৎসিত।

—সে কি রকম ?

—আলো আর অন্ধকারের মধ্যে যে বস্তুটা আছে, সে আলো। সেই আলোর অসদ্ভাব ঘটার নাম অন্ধকার।

—ঠিক বোঝা গেল না। স্পষ্ট দেখছি অন্ধকার আছে।

তুমুল তর্ক বেধে গেল। বাটি বাটি চা, আর তার সঙ্গে চলতে লাগল বাক্স বাক্স সিগারেট। মন্মথ এবং প্রভাময় হিন্দু শাস্ত্র থেকে, আর ভবতোষ বাইবেল থেকে শ্লোক ঝাড়তে লাগল। কিন্তু মীমাংসা ক্রমেই দূর থেকে দূরে সরতে লাগল। সুকুমার যখন এল তখন তর্কটা এসে পৌচেচে এই জায়গায়—ভক্তিমার্গ বড়, কি জ্ঞানমার্গ বড় ? তর্কটা ওখান থেকে কি করে এইখানে এল কেউ জানে না।

মন্মথের মতে ভক্তিমার্গ বড়। শুষ্ক জ্ঞানের দ্বারা কিছুই লাভ করা যায় না। প্রভাময়ের মতে মূঢ় অন্ধ ভক্তির কোনো মানেই হয় না। জ্ঞানমার্গে না গেলে পরাভক্তি আসতে পারে না। ভবতোষ এখানে পৌছে তার মতেই সায় দিলে।

এমন সময় সুকুমার এল।

তর্ক করে ওরা তখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সুকুমারকে পেয়ে সবাই নিজের নিজের দলে টানবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার কি মত ?

সুকুমার সমস্ত কথা শুনে সবিনয়ে বললে, আমি ভক্ত নই, জ্ঞানীও নই। আমি কি বলব বল?

—সে তো আমরা কেউই নই। তবু?

অর্থাৎ চা এল, সিগারেট এল, পান এল এবং জ্ঞানী অথবা ভক্ত এর একটাও না হওয়া সত্ত্বেও সুকুমারকে তর্কে নামতে হল। সে প্রথমে বললে, যার যেরকম প্রকৃতি তার তাই পথ। জ্ঞানীর পথ জ্ঞানমার্গ, ভক্তের ভক্তিমার্গ। সব পথই ভালো।

কথাটা কারও মনঃপূত হল না।

মন্মথ বললে, কিন্তু মুক্তি কোন্ পথে আসবে?

সুকুমার হেসে বললে, কোনো পথেই না। মুক্তি নেই।

মুক্তি নেই? সবাই বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইল।

সুকুমার সুর করে বললে,

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি?
আপনি প্রভু সৃষ্টি-বাঁধন ডোরে।

বুঝলে? মুক্তি কোথাও নেই।

অর্থাৎ তুমি মুক্তি মান না?

সকলেই সুকুমারের উপর চটে গেল। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, এরা মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। মানে এই যে, মুক্তির একটা সম্ভাবনা থাকা ভালো। বাইরে থেকে এদের কোনো অসুবিধা হচ্ছে বলে বোধ না হলেও ভিতরে ভিতরে স্ব স্ব অবস্থায় খুশি কোনো মানুষই নয়, এরাও নয়। স্কুল-মাস্টার চায় জমিদার হতে, জমিদার চায় মার্চেন্ট অফিসের কেরানী হতে। কেরানীর ইচ্ছা ছিল হাইকোর্টের জজ হবার, আর জজের ইচ্ছা সব ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হন। বিচিত্র মানুষের মন, অহেতুক তার ইচ্ছা! সুতরাং মুক্তির তার বিশেষ প্রয়োজন! বর্তমান অবস্থা থেকে উৎকৃষ্টতর অবস্থায় মুক্তি এবং তাতেও না পোষালে চরম একটা মুক্তি। অতএব তারা সুকুমারের উপরেই চটে গেল!

চোখ পাকিয়ে বললে, তুমি মুক্তি মান না ?

সুকুমার হাসলে। বললে, আমার মানামানির তো কথা নয়। মুক্তিই নেই। স্বয়ং ভগবান সৃষ্টির বাঁধনে বাঁধা।

মন্মথ চোখ লাল করে বললে, তুমি তাহলে নাস্তিক !

—না।

—আর না ! নাস্তিক আর কাকে বলে !—বলে একটা বড় কথা বলার গর্বে সকলের দিকে চাইলে। প্রভাময় তার সঙ্গে একমত। কিন্তু ভবতোষ এখনও মত স্থির করতে না পেরে নির্বাক রইল। সে প্রভাময় কিম্বা মন্মথর মতো ন্যাংটা নয়। তার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে অনেক বিলেত-ফেরৎ। যারা নয় তারা আবার আরও সাহেব। সুতরাং তাকে মত স্থির করতে গেলে অনেক দিক ভেবে করতে হবে। ধর্ম সম্বন্ধে বর্তমান ফ্যাশানটা কি তা জানা প্রয়োজন। সুতরাং সে নীরব রইল এবং মনোযোগের সঙ্গে সুকুমারের কথা শুনতে লাগল। সুকুমার শিক্ষিত এবং কলকাতায় থাকে। তার মতের উপর কলকাতার আধুনিকতম ফ্যাশানের প্রভাব থাকাই সম্ভব।

সুকুমার বললে, তোমরা তো বৈষ্ণব। বৈষ্ণবরাও সাযুজ্য মানেন না। জানো ?

—সাযুজ্য আর মুক্তি কি এক ?

সুকুমার উত্তর দিলে, চরম মুক্তিই সাযুজ্য। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে ঃ

"ভট্টাচার্য কহে—মুক্তি নহে ভক্তি-ফল।
ভগবদ্বিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেই সত্য নাহি মানে।
যেই নিন্দা-যুদ্ধাদিক করে তার সনে ॥
সেই দুইয়ের দণ্ড হয়—ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তি।
তার মুক্তি ফল নহে—যেই করে ভক্তি ॥"

আবার বলছেন ঃ

"সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়।
নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয়॥"

আবার স্পষ্ট করে একথাও আছে ঃ

"মুক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় ঘৃণা ত্রাস।
ভক্তি শব্দ কহিতে মনে হয় উল্লাস॥"

আরও শুনতে চাও ?

এর পরে আর তর্ক চলে না! সুকুমার একেবারে মূল ধরে টেনেছে। ওদের কারও একখানিও ধর্মগ্রন্থ পড়া নেই। সুতরাং এদিক দিয়ে তর্ক করা সুবিধা বিবেচনা করলে না।

ভবতোষ বললে, তাহলে মুক্তি নেই এ কথা বলছ কেন ?

সুকুমার স্বীকার করে নিলে বৈষ্ণবের মতে মুক্তি আছে বটে, কিন্তু তা কাম্য নয়। তার চেয়ে নরকও ভালো।

ভবতোষ আর একটু চেপে ধরলে সুকুমারকে কোণঠাসা করতে পারত। কারণ, সুকুমারেরও ধর্ম সম্বন্ধে কৌতূহলও কম, পড়াশুনাও কম। চৈতন্যচরিতামৃত একবার পড়েছে। আর তার মধ্য থেকে তর্ক করার উপযোগী কয়েকটা স্থান মুখস্থ করেছে। উদ্ধৃত শ্লোকগুলি তারই উদ্গার। কিন্তু ভবতোষরা তা ধরতে পারলে না। সুকুমার যা হোক গোটাকতক শ্লোকও তো বললে, ওরা তাও পারে না। ওরা কোনো ধর্মগ্রন্থের মলাট পর্যন্ত দেখেনি। সুতরাং এ সম্বন্ধে সুকুমারের সঙ্গে অধিক তর্ক করতে সাহসে কুলোল না।

প্রভাময় ক্ষুব্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আরে বাপু, তুমি স্বর্গ নরক মানো তো ?

সুকুমার হেসে বললে, মানি। কিন্তু তোদের মতো করে নয়।

মন্মথ হতাশভাবে বললে, এই দেখ, সেই মানবে তবু একটু রকম-ফের করে।

ভবতোষ সুকুমারের পিঠ চাপড়ে বললে, নিশ্চয়। তা নইলে আর অত পয়সা খরচ করে এম-এ পাশ করেছে কি করতে! আমার রাঙাদা বলেন—

রাঙাদাকে তোমরা জান না—হার্ভার্ড থেকে গেল বার ডক্টরেট নিয়ে ফিরেছেন। তিনি বলেন,

সুকুমার গম্ভীরভাবে বললে, আমার নরকে যন্ত্রণা নেই। স্বর্গও সকলের পক্ষে সমান সুখের আকর নয়। সে হচ্ছে,

বলে এ সম্বন্ধে বার্ণার্ড শ'র মতামত যা সে বুঝেছে তাই ওদের বুঝিয়ে দিতে লাগল।

ভবতোষ বার্ণার্ড শ'র নাম শুনে খুব ভক্তি-বিহ্বলচিত্তে সুকুমারের বক্তৃতা শ্রবণ করতে লাগল এবং মাঝে মাঝে সায় দিতে লাগল। মন্মথ ও প্রভাময় আপত্তি জানাতে সাহস না করলেও তেমন মন দিয়ে মেনে নিতে পারলে না। ঠাকুরমার রূপকথায়, জ্ঞানী-গুণীর উপদেশে তাদের কল্পনায় স্বর্গ-নরক অন্যরূপে জ্বল জ্বল করছে। সে রূপ তাদের সংস্কারে দৃঢ় হয়ে বসেছে। তাদের ধমনীর রক্তস্রোতে রয়েছে নরকের ভয়, আর স্বর্গের কামনা। অত সহজে সে ভয় ঘুচবে এ আশা করাও ভুল। সুকুমারেরই কি ঘুচেছে? কিন্তু একটা অজ্ঞাত মতের অভিনবত্ব তাকে মুগ্ধ করেছে। তার বুদ্ধিকে দিয়েছে আনন্দ। বার্ণার্ড শ'র মত মেনে নিয়েছে তার বুদ্ধি, চিত্ত নয়। সেখানে এখনও কিছু কিন্তু আছে। তা হোক। সুকুমার এই নতুন মত বুদ্ধি দিয়ে যতখানি উপলব্ধি করতে পেরেছে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলতে লাগল। বলতে বলতে তার অনেকখানি নতুন উপলব্ধিও হচ্ছিল, মনে বেশ আত্মপ্রসাদও অনুভব করছিল। এমন সময় দৈবজ্ঞ মুখুয্যে মশাই এসে উপস্থিত হলেন।

এই যে বাবাসকল। ভালো তো?

—আসুন, আসুন।

চায়ের উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি তখনও ফরাশের উপর পড়ে ছিল। অপাঙ্গে সেদিকে চেয়ে ব্রাহ্মণ একটা পৃথক কম্বলাসনে উপবেশন করলেন। ভবতোষ তাঁর জন্যে চাকরটাকে তামাক সাজতে বললে।

আব জিজ্ঞাসা করলে, এদিকে কোথায় আসা হয়েছিল?

পার্শ্বে রক্ষিত চালের পুঁটুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মুখুয্যে মশাই বললেন, একটা স্বস্ত্যয়ন ছিল বাবা।

সুকুমার খুব বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, স্বস্ত্যয়নের ফল কি ?

মুখুয্যে মশাই উৎসাহিত হয়ে বললেন, স্বস্ত্যয়ন ? বল কি বাবা ! মনে শান্তি আসবে, গৃহে শান্তি আসবে,

—দারিদ্র্য ?

—দারিদ্র্যও নাশ হবে। নইলে শান্তি আসবে কি করে ?

সুকুমার চুপ করে রইল। মুখুয্যে মশায়ের গৃহের খবর সকলেরই জানা। কোনো দিন অন্ন জোটে, কোনো দিন জোটে না। যিনি পরের দারিদ্র্য নাশ করে বেড়াচ্ছেন তাঁর নিজের দারিদ্র্য দূর হয় না কেন ? তাঁর তো সর্বাগ্রে নিজের গৃহেই স্বস্ত্যয়ন করা উচিত।

জিজ্ঞাসা করলে, দারিদ্র্য কি নাশ হচ্ছে দেখছেন ?

মুখুয্যে মশাই থতমত খেয়ে গেলেন। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলে শান্তি হয় এই কথাই সকলে জানে। তাই তাঁকে ডাকে। স্বস্ত্যয়নের পর শান্তি এল কি এল না—এ খবর নিজের হলেও ক'জন রাখে ?

মুখুয্যে মশাই বললেন, তা কিছু কিছু হয় বই কি ! নইলে আর মানুষ স্বস্ত্যয়ন করবে কেন ?

ভবতোষ হেসে বললে, ও সব কথা ওঁকে জিজ্ঞাসা করা ভুল সুকুমার। হোক না হোক, ওই ওঁর জীবিকা।

মুখুয্যে মশাই সরল লোক। উল্লসিত হয়ে বললেন, যা বলেছ বাবাজি। সবারই কি হয় ? যার হবার তারই শুধু হয়। নইলে, 'নিয়তি কেন বাধ্যতে' ? তবে হ্যাঁ কিছু কিছু

ভবতোষ বললে, যাকগে ও কথা। বেলা অনেক হল। এইখানে স্নানাহার করে তবে যেতে পাবেন।

মুখুয্যে মশাই তাড়াতাড়ি উঠে বললেন, না, না, বাবা। তোমাদের খেয়েই

তো আছি। খাওয়ার জন্যে কি! বাড়িতে বিশেষ কাজ আছে, যেতেই হবে। কেবল বাবাসকলের গলার সাড়া পেয়ে এদিকে এলাম। আচ্ছা বাবা। মুখুয্যেমশাই আর দাঁড়ালেন না। সকলকে আশীর্বাদ করে পথে নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও উঠে দাঁড়াল।

বাড়িতে জনমনুষ্যের সাড়া শব্দ নাই। মা খোকাকে কোলে করে পাশের বাড়ি বেড়াতে গেছেন। কর্তাবাবু স্নান করতে গেছেন। তাঁর ফেরবার দেরি নেই। মণিমালা একখানা চওড়া লালপাড় মটকার শাড়ি পরে তাঁর আহ্নিকের জায়গা করছিল। মাথায় আধ-ঘোমটা, আঁচলটি গলায় বেড় দেওয়া। সম্মুখের জানালা দিয়ে খানিকটা আলো এসে তার মুখে ললাটে পড়েছে। নির্জন বাড়ি। সুকুমার আর লোভ সামলাতে পারলে না। তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

তার জুতোর শব্দে চম্‌কে মুখ তুলে চেয়েই মণিমালা বলে উঠল, ওকি, ওকি!

সুকুমার থমকে দাঁড়িয়ে বললে, কি?

—জুতো পরে পূজোর ঘরে ঢুকছ কি?

—ও বাবা!—সুকুমার হেসে উপরে চলে গেল।

গায়ের কাপড় জামা আলনায় খুলে রেখে সুকুমার খাটে পা ঝুলিয়ে বসল। শীতের বেলা। এমনিতে বোঝা যায় না, কিন্তু বেলা অনেক হয়েছে। মণিমালাকে দেখে বোধ হল রান্না হয়ে গেছে। সকালবেলায় ভবতোষের ওখানে কয়েক পেয়ালা চা খেয়ে তার ক্ষুধা ছিল না। তবু রান্না যখন হয়ে গেছে তখন মধ্যাহ্ন-ভোজনের হাঙ্গামাটা চুকিয়ে ফেলাই ভালো।

সুকুমার স্নানের জন্যে উঠছিল। এমন সময় মণিমালা এসে দরজার কাছে দাঁড়াল।

মুখ টিপে হেসে বললে, কি! একেবারে সাহেব হয়ে গেছ নাকি?

—কি রকম?

—জুতো পরে বাবার পূজোর ঘরে ঢুকছিলে যে বড় !

সুকুমার উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললে, অপরাধ হয়ে গেছে সুমধ্যমে, তোমার বদনকমলের লোভে আকৃষ্ট হয়ে আমি আশ্রমপীড়ার কারণ ঘটিয়েছিলাম।

লজ্জায় মণিমালার কানের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল। বললে, আহা, মিথ্যে কথা বলতে সাহেবের বাধে না !

বাঁ হাতটা বুকে রেখে আর ডান হাতটা সম্মুখের দিকে প্রসারিত করে বক্তৃতার ঢঙে সুকুমার বললে, মিথ্যা নয় বরাননে, এ সত্য !

মণিমালা ধমক দিয়ে বললে, থাম। এতটা বেলা হল একটু জল পর্যন্ত মুখে দাও নি। কোথায় ঘুরছিলে ?

সুকুমার সগর্বে বললে, ভবতোষের ওখানে। তিন পেয়ালা চা, আর তুমুল তর্ক !

—কি নিয়ে তর্ক ?

—সে কি একটা বিষয় ? জন্ম-মৃত্যু, স্বর্গ-নরক, শাস্তি-স্বস্ত্যয়ন—কত কি।

—কি মীমাংসা হল ?

সুকুমার হেসে বললে, মীমাংসা আবার কি! তর্কের কি মীমাংসা হয় ? না মীমাংসার জন্যে লোক তর্ক করে ? বিরোধে আরম্ভ, বিরোধেই শেষ।

মণিমালা বললে, বল মুখোমুখিতে আরম্ভ, হাতাহাতিতে শেষ।

—প্রায় তাই।

—তবে কেন তর্ক কর ?

সুকুমার বললে, রোগে।

তারপর বললে, কি জান, তর্কটা জীবনের লক্ষণ। মানুষের মনে জিজ্ঞাসা যখন আসে তখনই তর্ক করে। তার মানে তার মনে জানবার ইচ্ছা এসেছে। তর্ক করে না কে ? এক, যে সমস্ত তত্ত্ব জেনেছে, যার জানবার শেষ হয়েছে—

আর যে পাথর হয়ে গেছে, যার কোনো তত্ত্ব জানবার কৌতূহল নেই, যার মনে জিজ্ঞাসা ওঠেই না।

মণিমালা হেসে বললে, আর আমি। যে জেনেছে কিছুই শেষ পর্যন্ত জানা যায় না। কি বল? কিন্তু যে তর্কে মীমাংসা হয় না, কেবল বিরোধ বাধে, সে তর্কে লাভ কি?

হাতের কাছে ভালো মতো একটা উত্তর না পেয়ে সুকুমার বললে, কিছু লাভ হয় বই কি।

—ছাই হয়। বিরুদ্ধ মন নিয়ে কি জ্ঞান লাভ হয়? তার জন্যে শ্রদ্ধা চাই।

মণিমালার মুখে এসব কথা শুনে সুকুমার অবাক হয় না। মণিমালার বাবা প্রকাণ্ড বড় পণ্ডিত। তাঁর কাছে সে বই পড়েছে অনেক। কিন্তু আসল বস্তু পেয়েছে তার মায়ের কাছ থেকে। বাবা সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং অনভিজ্ঞ। রাত্রিদিন তিনি পুঁথিপত্র নিয়েই থাকেন। আর মা নিঃশব্দে হাসিমুখে সংসারের সকল বোঝা বয়ে চলেছেন। তাঁর মনের পাতায় কোথাও স্বামীর শুষ্ক জ্ঞানের আঁচ লাগেনি। ইতু-পূজো, ষষ্ঠী-পূজো থেকে আরম্ভ করে বার-ব্রত, নিয়ম-আচার কোনোটি তাঁর বাদ দেবার উপায় নেই। অথচ স্বামী যখনই প্রশ্ন করেন, ওতে কি হয়? সুলজ্জিত ক্ষীণ হাসি ছাড়া আর কোনো উত্তরই তিনি দিতে পারেন না। স্বামীর সমস্ত শাস্ত্রকথা তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে শোনেন। কিন্তু কি বুঝলেন আর কি বুঝলেন না, তা বোঝা যায় না।

মণিমালা বললে, আমার মা বলেন জ্ঞানের জন্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে অপেক্ষা করতে হয়। ছটফট করে বেড়ালে কিছু পাওয়া যায় না।

সুকুমার একটুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবলে। তার পর বললে, শ্রদ্ধার সঙ্গে অপেক্ষা করার মানে কি? কত কাল অপেক্ষা করতে হবে?

মণিমালা হেসে বললে, তা জিজ্ঞাসা করিনি!

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা, বার-ব্রত, জটার জল, মাদুলি-কবচ এসব তো তুমিও মানো ?

—মানি বই কি ?

—ওর কিছু ফল বুঝতে পার ?

—নিশ্চয়।

সুকুমার কিছু বললে না, শুধু অবিশ্বাসের সঙ্গে একটু হাসলে।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে, শ্বশুর মশাই কি জামা-জুতো একেবারে ছেড়েই দিলেন ?

মণিমালা হেসে বললে, একেবারে। মায় সাবান পর্যন্ত। অথচ তেল গায়ে ছোঁয়াতে পারতেন না। একটা দিন সাবান নইলে চলত না !

—মাছ-মাংসও ছেড়ে দিয়েছেন ?

—হ্যাঁ। হবিষ্যি করেন !

সুকুমার হাসলে। বললে, হঠাৎ ?

—কি জানি।

তারপর বললে, বাবা বলেন চাকরির খাতিরে অনেক কিছু করেছেন। অনেক পেয়েছেন, আবার অনেক হারিয়েছেনও। মূলে লাভ জমেনি কিছুই। এবারে সত্যিকার কিছু পেতে চান।

—তার মানে ?

মণিমালা ভালো করে মেঝের উপর বসে একটুক্ষণ কি যেন ভাবলে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, তাঁর সব কথা আমি বুঝতে পারি না। মনে হয়, তাঁর ধারণা জন্মেছে পাঁচ ফলে ঠুকরে বেড়ালে আসল বস্তু পাওয়া যায় না। কিছুটা যাজ্ঞবল্ক্য, পতঞ্জলি-মনু-পরাশর-ব্যাস, আর কিছুটা কাণ্ট-হেগেল-মিল-শোপেন-হার, এ চলবে না।

—কি চলবে ?

—তিনি বলেন, এঁরা সকলেই সত্যদ্রষ্টা। কিন্তু সত্যোপলব্ধি পাঁচ ফুলে সাজি

ভরিয়ে হয় না। তিনি বলেন, যাকে হোক একজনকে অনুসরণ করতে হবে। আর নিজেকে অন্তরে-বাইরে তাঁরই অনুগামী করতে হবে। ভাবে চিন্তায় কর্মে যারা ফিরিঙ্গি হয়ে গেছে,—না এদিক না ওদিক—তাদের কোনো আশাই নেই।

—তাই তিনি অন্তরে-বাইরে খাঁটি বাঙালী হবার সাধনায় লেগেছেন?

—হ্যাঁ।

সুকুমার চুপ করে রইল। ভালো মন্দ কোনো মতামতই প্রকাশ করলে না। জিজ্ঞাসা করলে, আর কি বলে গেছেন?

—আর একটি শ্লোক দিয়ে গেছেন, তোমাকে দেখাই দাঁড়াও।

মণিমালা দেরাজ থেকে একটা কাগজে লেখা শ্লোক এনে সুকুমারের হাতে দিলে। তাতে লেখা আছে:

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বো রামঃ কমললোচনঃ॥

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, এর মানে বলে দিয়ে গেছেন?

মণিমালা হেসে বললে, না। তোমার কাছ থেকে বুঝিয়ে নিতে বলে গেছেন। ওর উল্‌টো পিঠে আরও একটা শ্লোক লিখে দিয়ে গেছেন। সেটাও দেখ।

সুকুমার উল্‌টো পিঠ পড়লে:

স্থিতং সর্বত্র নির্লিপ্তমাত্মরূপং পরাৎপরম্।
নিরীহমবিতর্কঞ্চ তেজোরূপং নমাম্যহম॥

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ

মণিমালা সকৌতুকে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে, ওটারও মানে বুঝিয়ে দিতে হবে—বিশেষ করে ওই 'অবিতর্কং' কথাটার।

সুকুমার খোঁচাটা বুঝলে। শুধু বললে, হুঁ।

তারপর কাগজখানা ফিরিয়ে দিয়ে বললে, এই কাগজখানা ঝাড়লে একসেট রূপোর বাসন বেরুতে পারে?

—চেষ্টা করে দেখিনি।

—ওখানা লক্ষবার মাথায় ঠেকালে আমার মাইনে বাড়তে পারে ?

—চেষ্টা করে দেখতে পার।

—রান্না হয়ে গেছে ?

—অনেকক্ষণ।

—তেল কি নিচে আছে ?

—আনব ওপরে ?

—না থাক। আমিই নিচে যাচ্ছি।

সুকুমার মৃদু হেসে পাশ কাটিয়ে নিচে চলে গেল।

৬

ক'দিন পল্লীর নির্জনতার পর আবার কলকাতার কর্ম-কোলাহল। পথে মোটর-বাস-ট্রাম-ঘোড়ারগাড়ির ঘর্ঘর শব্দ, আর মেসে বিভিন্ন ঘরে বিভিন্ন জটলা—কোথাও সঙ্গীত, কোথাও পাশা খেলা।

পরের দিন যথাসময়ে স্কুলে গিয়ে দেখে স্কুল বন্ধ। দারোয়ান জানালে সেক্রেটারীর মায়ের শ্রাদ্ধ। সকল মাস্টারই সেখানে গেছেন, সুকুমারকেও যাবার জন্যে হেড মাস্টার বলে গেছেন। সেক্রেটারীর মায়ের শ্রাদ্ধ আজকেই বটে! সুকুমারের স্মরণ ছিল না। সেও সেক্রেটারীর বাড়ির উদ্দেশে রওনা হল।

সেক্রেটারীর বাড়ি ঢুকতে গেটের মুখেই রমেশের সঙ্গে দেখা।

—স্কুল হয়ে আসছেন বুঝি ?

সুকুমার উত্তর দিলে, হ্যাঁ। আমি ভুলে গিয়েছিলাম। অনর্থক খানিকটা ঘুরলাম। আরও একটা দিন থেকে এলেও পারতাম।

রমেশ হেসে বললে, তাতে কিন্তু একটা দিনের মাইনে কাটা যেত।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। এই তো ক'দিন পরেই বড় দিনের ছুটি। মিছিমিছি কেন আর

—তা বটে।

একটু আগেই হেড-মাস্টারের সঙ্গে দেখা। চাদরখানা কোমরে জড়িয়েছেন। দেখতে কন্যা-কর্তার মতো লাগছে। খুব ব্যস্তভাবে সেক্রেটারীর সঙ্গে পরামর্শ করছেন! সেক্রেটারী দুজনকে দেখামাত্র হাতজোড় করে অভ্যর্থনা করলেন।

মধুর হেসে বললেন, আমার কিন্তু সহায়-সম্বল বলতে যা কিছু সব আপনারা। এ বাড়িতে যা কিছু কাজ-কর্ম হয়েছে সব আপনাদের হাত দিয়েই। নিন্দেও কখনও হয়নি। এবারও

কি যে বলেন!—হেড-মাস্টার হা হা করে হাসলেন,—এ কি আমাদের পরের বাড়ি নাকি! বেশ!

বলে এদের দুজনের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে চাইলেন।

তারপর বললেন, আপনাদের কথাই ভাবছিলাম। যদুপতিবাবু, পণ্ডিত মশাই আর আশুবাবু রয়েছেন রান্নার তদারকে। অশ্বিনীবাবু আর শিববাবু শ্রাদ্ধমণ্ডপে আছেন। আপনারা এলেন ভালোই হল। একবার 'মিষ্টান্নভবনে' গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হবে যে সন্দেশের বায়না দু'মণ নয়, তিন মণ। একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

তাদের সম্মতির অপেক্ষা না করেই হেড-মাস্টার সেক্রেটারীর দিকে চেয়ে বললেন, এই তো সন্দেশের ব্যবস্থা হয়ে গেল। আপনি শ্রাদ্ধমণ্ডপে যান। এদিকে আমরা যখন রয়েছি তখন কোনো ভাবনা নেই। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। আরও সকালে বসা উচিত ছিল। কেবল পুরোহিতের জন্যে···যান, আর দেরি করবেন না।

হেড-মাস্টার একাই একশো। যেন ঝড়ের মতো ছুটোছুটি করছেন। মুখে খই ফুটছে।

—তাহলে আপনারা আর দেরি করবেন না সুকুমারবাবু। এখনই খবরটা না দিয়ে এলে সন্ধ্যের মধ্যে জিনিস দিতে পারবে কি না সন্দেহ। ওদের আবার টেলিফোন নেই। না হলে

সেক্রেটারী বললেন, আমার গাড়িখানা কি ফিরেছে মাস্টার মশাই? তাহলে গাড়িখানা নিয়ে

বাধা দিয়ে হেড-মাস্টার বললেন, গাড়ি? গাড়ি কি হবে? এই তো মির্জাপুরের মোড়। পায়ে-পায়ে খুব যেতে পারবেন!

—দেখুন, যদি কষ্ট না হয়

সেক্রেটারী শ্রাদ্ধমণ্ডপের দিকে চলে গেলেন। হেড-মাস্টারও আর একদিকে যেন কাকে ডাকবার জন্যে ব্যস্তভাবে চলে গেলেন। আর এরা দুজনে বাইরে এসে পরস্পরে মুখপানে চেয়ে হেসে ফেললে।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, আমরা স্কুলের মাস্টার, না সেক্রেটারীর মাহালের গোমস্তা ঠিক করতে পারছেন?

—কিছু কিছু।

—বেশ!

রমেশ হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে বললে, কিন্তু মনে করুন যদি আমাদের উপর মিষ্টি মাথায় করে বয়ে আনবার হুকুমই হত, কি করতে পারতাম আমরা?

—তা তো বটেই।

—এইটুকুই যে কত কষ্টে যোগাড় হয়েছে তাও তো মনে আছে?

—আছে বই কি!

—তবে আসুন, আমরা সেই অনুগ্রহের জন্যেই ভগবানকে ধন্যবাদ দিই।

সুকুমার হেসে বললে, শুধু ভগবানকে নয়, সেই সঙ্গে ওঁদের দুজনকেও।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়!

অতি দুঃখেও দুই বন্ধু হেসে ফেললে।

'মিষ্টান্ন-ভবনে' খবর দিয়ে ফেরার পথে রমেশ জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা আপনার তো দেশে জমি-জায়গা আছে বলছিলেন না?

—আছে। কেন বলুন তো?

—তাহলে

—Back to Village?

—হ্যাঁ।

—মরেছেন! ওটা আর একটা ভাঁওতা।

—কি রকম?

—চাষ-বাসের কোনো খবরই রাখেন না তো? বেশ। তাহলে আমার কাছে শুনুন।

বলে সুকুমার রমেশকে সামনের একটা পার্কে নিয়ে গেল। শীতের দুপুর বেলা। পার্ক নির্জন, রোদও গায়ে লাগে না। একটা ঝোপের আড়ালে নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়ে দুজনে ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে বসল। গল্পের উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টির জন্যে দু'পয়সার চীনাবাদামও কেনা হল। কিছুক্ষণ সময় কাটানও প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি ফিরে গেলে আবার হয়তো নতুন ফরমাস চাপবে। তার চেয়ে পার্কে বসে থাকা ঢের ভাল।

সুকুমার বলতে লাগল:

—আমাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে মুরুব্বিরা যে সব এ্যামেচার উপদেশ দেন সে সব শুনবেন না। আমার বাড়ি পাড়াগাঁয়ে, আমি জানি সেখানকার সত্যি অবস্থা কি। চোখ মেলে দেখেন নি, সেখানকারই কামার-কুমোর-তাঁতি-নাপিত-ছুতোর-ধোপা হুড় হুড় করে কলকাতার দিকে ঠেল দিচ্ছে? দশ-পনেরো বছর আগে এদের দেখেছিলেন?

—এত দেখিনি।

রমেশের হাঁটুতে একটা চাপড় দিয়ে সুকুমার বললে, তবে ? এরা এল কেন ? কি দুঃখে ? দেশের মাটি ছেড়ে আসতে ওদের কত অনিচ্ছা সে আমি জানি। সেখানে দু'বেলা-দু'সন্ধ্যে যদি শাকান্নও জুটত, কিছুতে বিদেশে পা দিত না।

—শাকান্নও জোটে না বলতে চান ?

—তাও জোটে না। কত দুঃখে ওরা ঘরের বাইরে পা দেয় জানেন না তো। গেল বছর আমাদের গ্রামের একটি ছোকরা আমার সঙ্গে কলকাতায় আসে। সে কি দৃশ্য! ওর বিধবা পিসিমা কাঁদতে কাঁদতে আগে আগে চলেছে যাতে ছেলের চোখে অশুভ কিছু না পড়ে। কোন বুড়ী শূন্য ঘড়া কাঁখে নিয়ে কেবল রাস্তায় পা দিয়েছে তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতর ঢোকান হল। কে জলভরা কলসী নিয়ে আসছে তাকে বাঁ-দিকে করা হল। এমনি কত কি! আর ওর যাবতীয় আত্মীয়া ওর সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে আর এক কথা একশো বার করে মনে পাড়িয়ে দিতে দিতে আসছে। গ্রামের এবং আশ-পাশের দশখানা গ্রামের যতগুলি দেবতা আছেন তাঁদের পুষ্পে, বিল্বপত্রে আর চরণ-তুলসীতে ছোকরার চাদরের খুঁট ফুলে এতখানা হয়েছে।

সুকুমার হাত দিয়ে ফোলার পরিমাণ দেখিয়ে হাসলে। তারপর বলতে লাগল :

—মাঠের অর্ধেক পর্যন্ত তারা ফোঁপাতে ফোঁপাতে এল। আর কি কথা না বললে, কি উপদেশই না দিলে! সেইখানে ছোকরা যখন তাদের কাউকে প্রণাম করে, আর কারো প্রণাম নিয়ে বিদায় নিলে—শোকের ভারে তাদের দেহ তখন কেঁপে কেঁপে উঠেছে। ছোকরারও চোখ শুকনো ছিল না। আমি একরকম জোর করেই তাকে ঠেলতে ঠেলতে স্টেশনে নিয়ে এলাম। মেয়েরা সেইখানেই বোধ হয় ট্রেন না অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল।

সুকুমার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

—ট্রেন ছাড়তে ছোকরা হঠাৎ কি ভেবে একেবারে ছেলেমানুষের মতো ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল, আমাকে

এইখানে নামিয়ে দাও দাদাঠাকুর। অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, আমি কলকাতা যাব না। ঘরে না খেয়ে মরে পড়ে থাকব সেও ভালো। কত করে তবে তাকে শান্ত করি।

সুকুমার একটা চীনাবাদামের খোসা ছাড়িয়ে টপ্ টপ্ করে দুটো বাদাম মুখে ফেললে।

চিবুতে চিবুতে আকাশের দিকে চেয়ে বললে, এমনি দুঃখে মানুষ ঘর ছাড়ে, বুঝলেন রমেশবাবু, সহজে নয়।

রমেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলে না।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে, চাষেও কি কিছু হয় না ?

উদাসীনভাবে সুকুমার উত্তর দিলে, আমাদের দেশে চাষ মানে তো আকাশবৃত্তি। না আছে খাল, না আছে পুকুরের জল। দেবতা যদি জল দিলে তো হল, নয় তো নয়।

একটু ভেবে আবার বললে, তাও যদি ফসলের দর থাকত। যা কিছু হয়ও, দরের অভাবে তাতে জমিদারের খাজনা দিয়ে চাষার নিজের মেহনতের মজুরি পোষায় না। এই হল দেশের সত্যিকার অবস্থা। শহরে বসে যারা গ্রামে ফিরে যাওয়ার উপদেশ দেয় তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না।

সুকুমার চুপ করল।

বেলা তিনটে বাজে। ফিরিঙ্গিদের ক'টা ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ইতিমধ্যেই আয়ার সঙ্গে এসে মাঠে ছুটোছুটি লাগিয়েছে। আর দেরি করা সঙ্গত হবে না। হেডমাস্টার নিশ্চয়ই কে কি করছে তার খবর রাখছেন।

রমেশ উঠে বললে, আর গল্প নয় সুকুমারবাবু। টের পেলে কিন্তু বিপদ হবে।

—হ্যাঁ। তখন আবার পুঁটলি বেঁধে back to village !

দু'জনেই হেসে উঠে পড়ল।

এবারে সব মাস্টার মিলে একটা নতুন নিয়ম স্থির করলেন। সেটা এই যে,

যিনি যে ক্লাসে যে বিষয় পড়ান তাঁকে সেই ক্লাসের সেই বিষয়ের পরীক্ষক করা হবে না। আজকাল রমেশ আর স্থকুমারে খুব ভাব হয়েছে। স্কুলে দুজনে সর্বক্ষণ একসঙ্গে থাকে। রমেশের সঙ্গে অবশ্য প্রবীণ শিক্ষকদের কোনো বিরোধ নেই। কিন্তু বয়সের মিলের জন্যে স্থকুমারের সঙ্গে কথা বলে আর গল্প করে সে আনন্দ বেশি পায়। সেই জন্যে অন্য শিক্ষকদের কাছ থেকে ধীরে ধীরে সরে এসেছে। আরও একটা উদ্দেশ্য আছে। স্থকুমারের মারফৎ হেড-মাস্টারের প্রীতি আকর্ষণ করে একখানি বিজ্ঞানের বই লেখার সঙ্কল্পও তার মনে আছে। অনেকটা লেখাও হয়েছে। এখন হেড-মাস্টার মশাই অনুগ্রহ করলেই তাঁর নামে বইখানা ছাপিয়ে কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে।

পরীক্ষার বিষয় নিয়ে স্থকুমার আর রমেশ প্রথমে আপত্তি করেছিল। কিন্তু প্রবীণ শিক্ষকদের মিলিত চিৎকারে তা আর টেঁকেনি। ওরা অবশ্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আপত্তি করেনি। ওদের আপত্তির বিষয় ছিল এই যে, যিনি যে ক্লাসে যে বিষয় পড়ান, তিনি সেই ক্লাসে সেই বিষয়ে ছেলেদের উপযোগী করে যেমন প্রশ্ন করতে পারবেন, এমন বাইরের লোকে পারবে না। সে আপত্তি এই ভাবে খণ্ডিত হয়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তো বাইরের লোকেই প্রশ্নপত্র তৈরি করবেন। কথাটা ঠিক। ওদেরও এ নিয়ে বিশেষ কোনো জেদ ছিল না। বিশেষ করে রমেশের তো নয়ই। কারণ, এ স্কুলে বিজ্ঞানের শিক্ষক একমাত্র সেই। তার বিষয়ে আর কেউ দন্তস্ফুট করতে পারবেন না। ওরা আর এ নিয়ে বিশেষ আপত্তি করলে না।

স্থকুমারেরও এই সময় অনেক ঝঞ্ঝাট চেপে গিয়েছিল। তার ছাত্র দুটির পরীক্ষা আসন্ন। তারা ছেলেও ভালো। স্থতরাং মাস্টারকে যথেষ্ট খাটিয়ে নেয়। পরীক্ষার পূর্বে অন্য শিক্ষকদের অবশ্য ক্লাসের খাটুনি নেই বললেই হয়। কিন্তু তার কমেনি। সে যা পড়িয়েছে তা আবার সমানে পুনরাবৃত্তি

করতে হয়। সকাল থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত এই পরিশ্রম করার পর তাকে কোনোদিন বারোটা কোনোদিন একটা পর্যন্ত রাত জেগে প্রুফ দেখতে হয়। ইতিহাসের বইখানা সে হেড-মাস্টারকে দিয়ে দিয়েছে। সেখানা ছাপা আরম্ভ হয়েছে। প্রুফও সে ভালো দেখতে জানে না। এই উপলক্ষ্যে নতুন শিখেছে। সেজন্যেও অনেকটা অসুবিধা হয়।

সুকুমার আরও একটা ঝঞ্ঝাট বাধিয়েছে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে অধ্যয়নের সময় সুলেমান কররাণি এবং দাউদ শা'র আমলের কতকগুলো ঘটনা তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেইগুলো নিয়ে এবং আরও কিছু খেটে সে 'মোগলের বঙ্গ-বিজয়' নামে একটা বড় প্রবন্ধ লিখে ফেলে। সেটা কিছু কাল 'ভারত-দীপিকা' আফিসে পড়ে থাকার পর গেল মাসে প্রথম দফা প্রকাশিত হয়। 'ভারত-দীপিকা' কাগজ বড় হলেও অপরিচিত লেখকের প্রথম লেখা খুব অল্প লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ মাসে দ্বিতীয় দফা বেরুতে সুধীসমাজে তার আদর হয়। লেখাটার মধ্যে কিছু মৌলিকতা আছে। তারও চেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় লেখকের নিরপেক্ষতা। লেখার মধ্যে সেকালের ইতিহাস সম্বন্ধে কোনো নতুন মত প্রচারের প্রয়াস নেই। কোনো প্রতিপাদ্য প্রমাণের উদ্দেশ্য নিয়েও মুখবন্ধ আরম্ভ করেনি। পুরোনো প্রামাণ্য বইতে এ সম্বন্ধে যে ঘটনা সে পেয়েছে তাই পরের পর সাজিয়েছে। সে সমস্ত ঘটনার কতক জানা, কতক অজানা। সুকুমার শুধু এইটে স্মরণ রেখেছিল যে, তাতে যারা অংশ নিয়েছিল তারা নাটকের চরিত্র নয়, রক্ত মাংসের মানুষ। আর সেকালের মানুষও একালের মানুষের মতোই দোষে-গুণে জড়ান। তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে চোখা চোখা বিশেষণ প্রয়োগের দায়িত্ব ঐতিহাসিকের নয়। সে নিরপেক্ষ এবং বিচ্ছিন্ন দৃষ্টি নিয়ে তাদের দেখেছে, স্থান কাল পাত্র ও ঘটনা সংস্থান থেকে সম্ভবপর অনুমান সংগ্রহ করেছে এবং পরবর্তী ফলাফলের সঙ্গে সেই সকল অনুমানের সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস পেয়েছে। এর বেশি আর কিছুই করেনি। সে পাঠানেরও পক্ষ

নেয়নি, মোগলেরও পক্ষ নেয়নি এবং উপসংহারে দাউদ খাঁ'র দুর্ভাগ্যে বিগলিত হয়ে তাঁর পক্ষে কি ভাবে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত ছিল, এতকাল পরে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সদুপদেশ বর্ষণ করে নিজের রাজনীতিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় প্রদানের চেষ্টা করেনি।

তার লেখার এই গুণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আর এই সূত্রে একদিন অভাবিতরূপে বিখ্যাত বাংলা দৈনিকপত্র 'রত্ন-প্রভাকরের' সম্পাদক মনোমোহনবাবুর সঙ্গে তার পরিচয় হয়ে গেল। মনোমোহনবাবুর মতো লোকের সঙ্গে কোনোদিন কোনো কারণে তার পরিচয় হতে পারে একথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। সুতরাং এই সৌভাগ্যে সে যে উল্লসিত হয়ে উঠবে এ আর বিচিত্র কিছু নয়।

কিন্তু সে তো জানে না, দৈনিক কাগজের ক্ষুধা কি প্রচুর! শুধু তাই নয়, খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ নির্বিকার। যে কোনো বিষয়ে যে কোনো প্রবন্ধ দৈনিক কাগজ বিনা দ্বিধায় ছাপতে পারে। এইভাবে প্রত্যহ বহু প্রবন্ধ তার দরকার। বাংলা দেশের অধিকাংশ কাগজই লেখককে টাকা দেওয়া পছন্দ করেন না। সেজন্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই "cheapest is the best"—কারণ তাঁরা জানেন, বাংলার পাঠকদেরও খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে বিচার নেই। তাদের কাছে 'দারা-সেকোর নিকট শাজাহানের পত্রাবলী'ও যা 'বৈষ্ণব সাহিত্যে কান্তভাব'ও তাই। 'বাগর্থ-বিজ্ঞান' এবং 'বীমায় লগ্নী প্রথা' উভয় সম্বন্ধেই তাদের সমানই আগ্রহ। তাতে একটা সুবিধা এই হয়েছে যে, যে কোনো বিষয়ে ভালো-মন্দ যা হোক কোনো লেখাও যখন ভাণ্ডারে থাকে না, তখন হাতের কাছে যে কোনো একখানা সাময়িক পত্র থেকে দু'কলমের মতো একটা কিছু কেটে ছাপতে দিলেও চলে যায়।

এ সমস্ত না জানা থাকায় মনোমোহনবাবু যখন তার প্রবন্ধের ভূয়সী প্রশংসা করে 'রত্ন-প্রভাকরের' জন্য লেখা চাইলেন সে তখন হাতে স্বর্গ পেলে।

জিজ্ঞাসা করলে, কি নিয়ে লিখব?

—যা খুশি ।

যা খুশি লেখবার মতো মাল-মশলা তার কাছে কিছুই ছিল না। দাউদ খাঁ একটি প্রবন্ধেই নিঃশেষ হয়ে গেছেন। এ সম্বন্ধে আর কখনও তাকে কিছু লিখতে হবে, কিম্বা সেজন্যে কেউ তাকে অনুরোধ করতে পারে—তা সে ভাবেও নি। ভাবলে একটা প্রবন্ধেই সব শেষ না করে কিছু যদি হাতে রেখে দিত! তাছাড়া প্রবন্ধটাও 'ভারত-দীপিকার' মতো বড় কাগজ যে সত্যি সত্যিই ছাপবে এমন আশাও করেনি। বস্তুত পক্ষে যেদিন ছাপা প্রবন্ধটা তার চোখে পড়ে সে নিজেই সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছিল। কেমন অদ্ভুত লেগেছিল। তার নিজের নাম উপাধি সমেত ছাপার অক্ষরে ওইভাবে বেরুতে পারে—এ যেন সেদিন সে চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিল না।

কিন্তু নাম ছাপানর নেশা এখন তাকে পেয়ে বসেছে। দাউদ খাঁ সম্বন্ধে আর কোনো বলবার মতো কথা তার জানা নেই, মনাইম খাঁ সম্বন্ধেও না। অন্য কোনো কথা নিয়েও সে ইতিপূর্বে বিশেষ কিছু ভাবেওনি, গবেষণাও করেনি। তবু মনোমোহনবাবুর মতো একজন লোক যখন নিজে তাকে অনুরোধ করেছেন, তখন লিখতেই হবে। নইলে অভদ্রতা হয়। হয়তো তিনি ভাববেন একটা প্রবন্ধ লিখেই ছোকরার মাথা গরম হয়ে গেছে। ভাবা বিচিত্র নয়।

সে স্থির করলে, তার সংগৃহীত মাল-মশলা থেকে মনাইম খাঁ সম্বন্ধে যে সব ঘটনা ঝড়তি-পড়তিতে মূল প্রবন্ধ থেকে বাদ গিয়েছিল তাই নিয়ে একটা যেমন তেমন প্রবন্ধ আপাতত দাঁড় করান হবে। তার পরে সামনেই ছেলেদের পরীক্ষার পড়া তৈরির জন্যে যে ছুটি হবে, সেই ছুটিতে আরও গবেষণা করে একটা ভালোমত প্রবন্ধ দিয়ে মনোমোহনবাবুকে খুশি করবে। এ ছাড়া আর উপায় নেই।

এই স্থির করে সে একটা প্রবন্ধ লিখলে, দিনে ছেলে পড়িয়ে এবং রাত্রে প্রুফ দেখার পরেও যেটুকু সময় পায় সেই সময়ে। লেখাটা তেমন ভালো হল না। সান্ত্বনা রইল, পরের লেখাটা ভালো হবে। কিন্তু 'রত্ন-প্রভাকরে' ওটা বেরিয়ে

যাবার পর সে আর ছুটি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে না। দাউদ খাঁ সম্বন্ধে অনাবশ্যক যে সব মাল-মশলা ছিল তাই দিয়েই আর একটা প্রবন্ধ লিখে ফেললে এবং তার অব্যবহিত পরেই আরও একটা।

অবশেষে 'অবকাশ' কাগজে তাকে খেতাব দিলে 'মোগলাই সুকুমার' এবং তার লেখাগুলোর মধ্যে যে কিছুমাত্র মৌলিক গবেষণা নেই—ও সব যে যে-কোনো স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে আরও ভালো করে লেখা আছে তাও জায়গা জায়গা তুলে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে ; অর্থাৎ সুকুমার বিখ্যাত হয়ে গেল।

কিন্তু সে অত বুঝল না। ভাবলে 'অবকাশে'র এই গালাগালির পরে তার আর লোক-সমাজে মুখ দেখান চলবে না। ট্রামে-বাসে যেখানে যাবে লোকে কেবলই তাকে আঙুল দেখাবে আর আড়াল থেকে পরিহাস করে ডাকবে, মোগলাই সুকুমার। কিন্তু দিনের পর দিন গেল তবু তার স্কুলের মাস্টাররা পর্যন্ত তাকে একদিন ঠাট্টা করলে না। সুকুমার লাজুক মানুষ। সে নিজে কোনোদিন নিজের লেখা সম্বন্ধে কাকেও কিছু বলেনি। সুতরাং তাকে 'মোগলের বঙ্গ-বিজয়ের' লেখক বলে কেউ সন্দেহ করেনি। হয়তো তাঁরা প্রবন্ধটা কেউ পড়েনও নি। সেইটেই বেশি সম্ভব। কারণ, মাস্টারির একটা সুবিধা এই যে তাঁরা প্রায়শই বাজে জিনিস পড়ার প্রয়োজন অনুভব করেন না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ঝোঁক চড়ে গেল এবং পরীক্ষার পূর্বে স্কুল বন্ধ হওয়া মাত্র চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ ও শিখজাতি সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ একটা প্রবন্ধ লেখবার জন্যে আহার-নিদ্রা বন্ধ করে দিলে।

বড়দিনের আগেই স্কুলের পরীক্ষার ফল বার হল।

সুকুমার ভালো শিক্ষক বলে যে খ্যাতি রটেছিল এই একটা পরীক্ষাতেই তার সমাধি হয়ে গেল। সে যে যে-ক্লাসে ইতিহাস পড়াত তার একটাও ভালো ফল করতে পারেনি। এই প্রসঙ্গে একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, যারা ভালো ছেলে তারা ফল খুবই ভালো করেছে। বস্তুত এক একটি ছেলে প্রশ্নের উত্তরে

এমন মৌলিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে যে চমৎকৃত হতে হয়। কিন্তু বাকি সবাই, যাকে বাংলায় বলে, গোবর গুলেছে। তাদের উত্তর দেখলে মনে হয় তারা প্রশ্নও বোঝেনি, কি যে উত্তর দিচ্ছে তাও জানে না। কয়েকখানি খাতা সুকুমারকে দেখান হল। সে দেখে হাসি রাখা দায়।

সুকুমার তো চটে আগুন। তার একনিষ্ঠ পরিশ্রমের কি এই ফল হল ?

প্রশ্নপত্র এমন কিছু কঠিন হয়নি। কঠিন হয়েছিল তার বোঝান। যাদের বই দেখে দেখে বই অনুযায়ী পড়ালেও ঠিক বুঝতে পারে না, তাদের মুখে মুখে পড়ালে যা হয় তাই হয়েছে। সুকুমার বহু বই দেখে বহু কথা ক্লাসে বলেছে। যারা ভালো ছেলে তারা সে সব মনে রেখেছে। অন্য ছেলেরা সে সব তো মনে রাখতে পারেইনি, বরং বইতে যা পড়েছে তাও গোল পাকিয়ে ফেলেছে।

হেড-মাস্টার মশাই তাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি একটা তালিকা তৈরি করেছেন। তাতে প্রত্যেক শিক্ষকের কাজের ফল তোলা হয়েছে। সুকুমার যে-যে ক্লাসে যত ছাত্রকে যে-যে বিষয় পড়িয়েছে এবং তার মধ্যে যত ছাত্র উত্তীর্ণ হয়েছে তা তাকে দেখান হল। মোট একশো ছত্রিশ জন ছাত্রকে সে ইতিহাস পড়িয়েছে। তার মধ্যে মাত্র পঁচিশ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। পাশে শতকরা কষা আছে। আর তার পাশে লেখা আছে—অসন্তোষজনক। কিন্তু তার ইংরিজি ক্লাসের ফল খুব ভালো হয়েছে। একশো বারো জনের মধ্যে নিরানব্বুই জন উত্তীর্ণ হয়েছে এবং তারই ক্লাসের একটি ছাত্র ইংরিজিতে প্রথম চার ক্লাসের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে।

অন্যান্য শিক্ষকদের ফল যেমন সুকুমারের ইংরিজি ক্লাসের মতো অত ভালো হয়নি, তেমনি তার ইতিহাসের মতো অত শোচনীয়ও হয়নি। তাঁদের ক্লাসের কোনো ছাত্র যেমন অত্যধিক নম্বর পেয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিতে পারেনি, তেমনি অত বেশি ফেলও করেনি। মোটামুটি গড়ে শতকরা আশীজন উত্তীর্ণ হয়েছে। তবু তাঁদের মাঝে মাঝে অল্প-স্বল্প বিরুদ্ধ মন্তব্য সইতে হল। কিন্তু সুকুমারের কাছ থেকে একেবারে কৈফিৎ তলব হল !

সুকুমারের মাথায় তখন চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধ ও শিখজাতি মাকড়সার জাল বুনছিল। এক কৈফিয়তের আঘাতেই মুহূর্তে তা ছিন্ন হয়ে গেল।

সে বলল, আপনি তো জানেন আমি পড়াতে কোনো দিন ফাঁকি দিইনি, আর কি ভাবে দিনের পর দিন খেটেছি।

এর বেশি তার আর কিছু বলবার ছিল না।

হেড-মাস্টার দুঃখিতভাবে বললেন, আমি তো জানি, কিন্তু সেক্রেটারীকে কি বলা যায় ?

সুকুমারের উপর হেড-মাস্টারের সত্যিই একটা স্নেহ পড়েছে। সে যে অন্য শিক্ষকদের চেয়ে ক্লাসে ঢের বেশি খাটে এ বিষয়েও তাঁর সংশয় নেই। কিন্তু সেক্রেটারীকেও তিনি জানেন। তাঁর মাথায় সঙ্কল্প এসেছে, বড়দিনের পূর্বে সুকুমারকে এই উপলক্ষ্যে কর্মচ্যুত করে পুনরায় বড়দিনের পরে আবার লাগান। যা পনেরোটা দিনের মাইনে বেঁচে যায়। অথচ একটা উপলক্ষ্য না হলেও এ নিয়ে কেলেঙ্কারী হতে পারে। সেটা স্কুলের পক্ষে খারাপ। আরও একটা লাভ হবে এই যে, সুকুমারের উপর এই শাস্তি দেখে অন্য শিক্ষকরাও বন্ধের আগে মাইনের জন্যে বিশেষ চাপ দিতে সাহস করবেন না। বন্ধের আগে পুরো মাইনে মিটিয়ে দেওয়া সম্ভবও হবে না। কারণ, মাতৃশ্রাদ্ধের সময় স্কুলের তহবিলের কিছু টাকা তিনি ভেঙেছেন।

হেড-মাস্টার এ সবই জানেন। কিন্তু তিনিও অসহায়। সেক্রেটারী মস্ত বড় লোক, তাঁর সঙ্গে বিরোধ করার সাহস তাঁর নেই। তার উপর অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে তাঁকে ঘর করতে হয়। সুকুমারকে কোন কথা বলার আগেই তিনি সেক্রেটারীকে তার জন্যে অনেক অনুরোধ করেছেনও। কিন্তু সেক্রেটারী কিছুতে টলেননি। এরও পরে তাঁকে আর কিছু বলার অর্থ, নিজের বৃদ্ধ বয়সের শেষ সম্বলটি খোয়ান। পরের জন্যে অতখানি উদারতাই বলুন, আর মাথাব্যথাই বলুন, আর হঠকারিতাই বলুন, দেখাবার বয়স তাঁর পার হয়ে গেছে। তিনি মনে মনে বেশ বুঝছেন, সুকুমারকে সরতে হয়েছে।

সুকুমার উত্তর দিলে, তাঁকেও ওই কথাই বলবেন।

হেড-মাস্টার তার ছেলেমি দেখে হাসলেন। বললেন, পরীক্ষার এই রকম ফলের পর সে কথা কি কেউ বিশ্বাস করবে?

—আপনার কথাতেও করবেন না?

হেড-মাস্টার শুধু হাসলেন।

সুকুমার বললেন, আপনার কথাও যিনি বিশ্বাস করবেন না, তাঁকে আমি কি কথা বলতে পারি?

হেড-মাস্টার একটুক্ষণ কি যেন ভাবলেন। সুকুমারের নিষ্কৃতি কোন দিকেই নেই। তবে ক্ষমা-টমা চাইলে যদি বড়দিনের পর আবার কাজটা পায়।

বললেন, ও সব কৈফিয়ৎ দিও না। বরং মার্জনা চেয়ে লিখে দাও, যা হবার হয়ে গেছে—আর কখনও এ রকম হবে না। আমিও আর একবার বলে দেখব।

সুকুমার বললে, না।

—না কেন?

সুকুমার ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, সত্যি কথায় যাঁর বিশ্বাস উৎপন্ন করা যায় না, তাঁর কাছে কিছুই আমার বলবার নেই। মিথ্যে কথা তো নয়ই।

—মিথ্যে কিসের?

সুকুমার জোরের সঙ্গে বললে, মিথ্যে নয় তো কি! আপনি জানেন দোষ আমি কিছুই করিনি। যা পড়িয়েছি তার চেয়ে বেশি পড়াবার সাধ্য আমার নেই। কেন মিথ্যে ভবিষ্যতের আশ্বাস দোব?

ওর উষ্মা দেখে হেড-মাস্টার হেসে ফেললেন। বললেন, তাহলে কি করবে?

—কিছুই করব না।

—কিন্তু একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ তো দিতে হবে।

সুকুমার চুপ করে রইল।

হেড-মাস্টার গম্ভীরভাবে বললেন, শোন সুকুমার, ছেলেমি কোরো না।

সেক্রেটারী যখন চেয়েছেন তখন হয় চাকরি ছেড়ে দিতে হবে, নয় কৈফিয়ৎ দিতে হবে। সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ। কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক মনে না করলে সেক্রেটারী তোমাকে ছাড়িয়ে দিতে পারেন।

চাকরি ছাড়ার কথায় স্থকুমার প্রথমটা যেন একটু দমে গেল। কিন্তু তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত দৃঢ়স্বরে বললে, আমি চাকরিই ছেড়ে দোবো। কৈফিয়ৎ দোব না।

হেড-মাস্টার বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেন। কি যে বলবেন ভেবে পেলেন না।

স্থকুমার মুখে একটু হাসি আনবার চেষ্টা করলে। বললে, আমার জন্মে আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না। চাকরি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আমার আর সন্তোষজনক পথ নেই। আমি মার্চেণ্ট অফিসের কেরানী নই, স্কুলের শিক্ষক। আমাকে পিছুলে চলবে না।

বিস্ময় কাটিয়ে হেডমাস্টার বললেন, তুমি কি সত্যি সত্যিই চাকরি ছেড়ে দিতে চাও স্থকুমার ?

মাথা নামিয়ে সে বললে, সত্যি সত্যিই। আমি একমিনিটের মধ্যে পদত্যাগ পত্র লিখে এনে দিচ্ছি।

স্থকুমার হেড-মাস্টারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

৭

এক মিনিটের মধ্যে না হোক, পদত্যাগ-পত্র দিতে স্থকুমার দেরি করলে না। পাশের ঘর থেকে এক খানা কাগজে খস্ খস্ করে দু'লাইনে চিঠিখানা শেষ করে নিয়ে এসে হেড-মাস্টারের হাতে দিলে। দু' লাইনের চিঠি,—তাতে ভণিতা নেই, কাঁদুনি নেই, কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আত্মদোষস্খালনের চেষ্টা নেই, কিছু নেই। স্রেফ মামুলি কটি কথায় একখানা চিঠি। হেড-মাস্টার

অবাক হয়ে তার দিকে চাইলেন। বোধ হয় কিছু বলতেও যাচ্ছিলেন, কিন্তু সুকুমার আর তিলার্ধ বিলম্ব করলে না। বেরিয়ে চলে গেল।

চলে গেল ক্লাসে নয়, মাস্টারের বিশ্রামকক্ষেও নয়—সোজা ফটকের বাইরে। বয়স তার যদিচ বেশি নয়, কিন্তু ঘা খেয়েচে প্রচুর। নইলে সে নিশ্চয় একবার ক্লাসগুলোয় যেত। ছেলেদের সামনে উন্নত শিরে ভাস্বর ললাটে গিয়ে দাঁড়াত, যেন এইমাত্র ওয়াটার্লু জয় করে ফিরে এল। দুই পকেটে হাত দিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করত। ভাবে ভঙ্গিতে এই কথাটা প্রকাশ করত যে চাকরিকে সে গ্রাহ্য করে না। আত্মসম্মানে আঘাত লাগলে সে লক্ষ টাকার চাকরিও বাঁ পায়ের কড়ে আঙুল দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। তার ভাব-ভঙ্গি দেখে সহকর্মিদের চোখে শ্রদ্ধা এবং বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠত। সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অন্তরের দৈন্যে তাঁরা লজ্জা বোধ করতেন। ছেলেরা চারিদিকে তাকে ঘের করে দাঁড়িয়ে বিদায়াশ্রু ফেলত, আর সে সকলের মাথায় হাত দিয়ে মানুষ হবার জন্যে আশীর্বাদ করত—কর্মজীবনে নেমে তারা যেন চরম দুঃখের ভয়েও আপন আত্মাকে অবনমিত না করে। বিপদের ঝঞ্ঝা একদিন থেমে যাবেই, যাবেই কেটে দুঃখের মেঘ। সে দিন ভয়ে যারা আপন আত্মাকে দিয়েছে গ্লানি, তাদের আর লজ্জা রাখবার স্থান থাকবে না। এমনি অনেক বড় বড় কথাই বলত। কিন্তু এ সব কথা তার মনেই এল না। বরং সে মাথা নিচু করেই বেরিয়ে গেল। কাকেও মুখ দেখাতে লজ্জা করছিল। সে জেনেছে, ন্যায়ে হোক, অন্যায়ে হোক, যে কোনো কারণেই হোক, চাকরি যার যায়, তার আর লোকসমাজে মাথা উঁচু করে চলবার কোনো পথই থাকে না।

সে চলল পথে পথে; অকারণে, উদ্দেশ্যবিহীন। কলেজ স্ট্রীট থেকে সোজা ধর্মতলা, সেখান থেকে এস্‌প্লানেড, তার পরে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হয়ে মেসের দিকে। মনের মধ্যে যে চাঞ্চল্য এসেছে তার কিছুটা দৈহিক প্রকাশ না হলে সে যেন স্বস্তি পাচ্ছিল না। তাই বক্ষস্পন্দনের তালে তালে জোরে জোরে চলতে লাগল।

চিন্তা অনেক :

আবার যে ভবঘুরে সেই ভবঘুরে। সম্বলের মধ্যে সকাল-বিকাল দুটি ট্যুইশান। তাতে মেস খরচ চলে গিয়েও কিছু অবশ্য বাঁচবে। কিন্তু সে আর কত! এই ক'মাস চাকরির ফলে সংসারের আংশিক ব্যয়ভার তার ঘাড়ে এসে পড়েছে। সে বোঝা আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মত। এখন আর কাঁধ থেকে নামান শক্ত, বোধ করি অসম্ভবই। সংসারে তার সাহায্যের পরিমাণ অবশ্য মোটা অঙ্কের নয়। কিন্তু বাঙালী সংসারের এমনি দস্তুর যে, তারই অভাবে পরিবারের দূরবিস্তৃত শিকড়ে, ডালপালায় টান পড়বে। চারদিক থেকে উঠবে গেল গেল রব। তার উপর সংবাদটা পৌছানমাত্র মুদী উঠ্‌নো জিনিস দেবার সময় একটু সন্দিগ্ধভাবে চিন্তা করবে। কয়লাওলা তার কয়লার সামান্য কটা পয়সাই একদিন বাকি রাখতে দ্বিধা করবে। ধোপার হিসাব মিটতে একদিনের উপর দু'দিন দেরি হলে সে বিরক্তভাবে বিড় বিড় করবে। এমনি নানান ঝঞ্ঝাট।

এর উপর আরও একটা চিন্তার বিষয় আছে। স্কুলে তার প্রায় তিন মাসের মাইনে বাকি। প্রায় তিন মাসের এই জন্যে যে, একটা মাসের দরুণ সাত টাকা আদায় হয়েছে। বিশেষ দরকারে একবার সে দশটা টাকা চেয়েছিল। সেক্রেটারী পাঁচ টাকা মঞ্জুর করেন। অনেক কচ্‌লাকচ্‌লির পর সে সাতটা টাকা আদায় করে। এই নিয়ে কিছু বচসাও হয়েছিল। কে জানে তার কর্মচ্যুতির তাও একটা কারণ কি না। কর্মচারী পরিশ্রমলব্ধ বেতনও ভিক্ষুকের মতো চাইবে এইটেই রেওয়াজ। তার ব্যতিক্রমে মনিবের পক্ষে ক্রুদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক।

এখন এই যে প্রায় তিন মাসের বেতন, এটা কি ভাবে আদায় করা যেতে পারে ভেবে পেলে না। কোর্টে যাওয়া তার সাধ্যের অতীত। আর্থিক এবং মানসিক উভয় দিক দিয়েই। মামলা-মোকদ্দমার হাঙ্গামা পোহানর চেয়ে টাকা ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে সহজ। সেক্রেটারী স্বেচ্ছায় যদি না দেন, তার আর করবার কিছুই নেই। সে সহায়সম্বলহীন বিদেশী। যে সময়টা মিছামিছি সেক্রেটারীর

পিছনে পিছনে ঘুরে অপব্যয় করবে, সে-সময়টা অন্তভাবে কাজে লাগাতেও পারে। কটা প্রবন্ধ লেখবার ছিল। কয়েকখানি কাগজ থেকেই তার লেখা চেয়েছে। সময়াভাবে লিখতে পারেনি। এখন সময় অঢেল। দ্বিতীয় চাকরি না পাওয়া পর্যন্ত তাকে অনেকগুলো লেখা শেষ করে রাখতে হবে। এ রকম অফুরন্ত অবকাশ আর পরে নাও মিলতে পারে। সুকুমার মনে মনে প্রথম প্রবন্ধের খসড়া করতে লাগল।

যখন সে মেসে পৌঁছুল, চাকরটা সংবাদ দিলে তার ঘরে ক'টি ছোকরা বাবু বসে আছে।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। তার ঘরটি ছোট। পায়খানার সন্নিকটে বলে দরজাটা সব সময়েই ভেজিয়ে রাখতে হয়। উত্তর দিকে একটি মাত্র জানালা আছে। তাতে হাওয়া তেমন না খেললেও ঘরের দূষিত বাষ্প বেরিয়ে যেতে পারে। ঘরে দুখানি মাত্র ছোট ছোট আমকাঠের তক্তাপোষ হাত খানেক ব্যবধানে অবস্থিত। সমস্ত ঘরের মধ্যে ওইটুকু স্থানই ফাঁকা।

একখানি তক্তাপোষে রায়মশাই আলোর দিকে পিছন ফিরে শুয়ে। অপর-খানিতে ক'টি ছেলে সম্ভবত অনেকক্ষণ থেকে বসে বসে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সুকুমারকে দেখে তারা সসম্ভ্রমে তক্তাপোষ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—বোসো, বোসো।

সুকুমার আর কি বলবে ভেবে না পেয়ে ওদের দিকে পিছন ফিরে গায়ের শার্টটা খুলতে লাগল।

দেখা করতে এসেছে তারই ক'টি ছাত্র। কারও বয়স চৌদ্দ-পনেরোর বেশি নয়। এরাই তাদের নিজের নিজের ক্লাসের সব চেয়ে ভালো ছেলে, সুকুমারের অত্যন্ত প্রীতিভাজন। তার পড়ান শুনতে শুনতে আর সবাই যখন হাই তুলত, তখন এরাই শুধু গভীর মনোযোগ এবং অসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে তার পড়ান শুনত। তাকে নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত। এরা সত্যকার জিজ্ঞাসু। এসেছে তাকে শেষ সম্ভাষণ জানাতে।

সুকুমারের জলভরা চোখ বিজলীর আলোয় চিক্‌চিক্‌ করে উঠল। ছেলে ক'টি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। সুকুমারের অন্তরের সীমাহীন বেদনা-পারাবার যেন চাঁদের আলোয় হেসে উঠল। যেন বলে উঠল, পেয়ে গেছি, পেয়ে গেছি। একটি মুহূর্তে শিক্ষকতার পারিশ্রমিক প্রাপ্যেরও অধিক আদায় হয়ে গেছে।

গলা ঝেড়ে অবরুদ্ধস্বরে সুকুমার আবার বললে, বোসো।

ওরা একে একে সুকুমারের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে, পায়ের ধুলো নিলে। সুকুমার তাদের মাথায় হাত দিয়ে নীরবে এক মুহূর্তের মধ্যে যে কত আশীর্বাদ করলে তার আর সীমা সংখ্যা নেই।

তার পর ধীরে ধীরে ওদের পাশে বসল।

একটু পরে ওরা জিজ্ঞাসা করলে, আমাদের সঙ্গে দেখা না করেই যে চলে এলেন স্যার ?

সুকুমার একটু হাসলে। বললে, দেখা ? এই তো হল।

—সকলের সঙ্গে তো হল না।

—তাহলে তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার বোধ হয় আবশ্যকও ছিল না।

ছেলেরা কথাটা ঠিক বুঝলে না। বললে, কেন স্যার ?

সুকুমার হেসে বললে, আবশ্যক থাকলে নিশ্চয়ই দেখা হত। যেমন তোমাদের সঙ্গে হল।

—তারা যে ঠিকানা জানে না স্যার।

—আবশ্যক থাকলে তোমাদের মতন জেনে নিত।

ছেলেরা চুপ করে রইল। সুকুমারের কর্মত্যাগের কারণ তারাও জানতে পেরেছে। কেবল জানতে পারেনি যে চাকরি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া তার আর উপায় ছিল না। সুকুমার ভালো পড়াতে পারে না, সেক্রেটারীর এই মন্তব্যই নাকি তার কর্মত্যাগের কারণ, এইটুকুই তারা শুনেছে এবং শুনে অবাক হয়েছে। সকলেই অবাক হয়েছে। কারণ যারা ভালো ছেলে নয়, পড়ার নামেই যাদের

তন্দ্রাকর্ষণ হয়, তারাও এ কথা স্বীকার করবে যে স্থকুমার তাদের পিছনে যে পরিশ্রমটা করে, অন্য কেউ তার সিকির সিকিও করেন না।

অনেকক্ষণ পরে ছেলেরা বললে, আপনি স্যার এইখানেই থাকবেন তো?

—আর যাব কোথায়?

—আমরা মাঝে মাঝে আসব স্যার। আপনি এই সময়ে প্রায়ই থাকেন তো?

—আসবে বই কি। মাঝে মাঝে এস। তোমাদের সঙ্গে দেখা হলে আমার খুবই আনন্দ হবে। এই সময়ে আমি প্রায়ই থাকি। বিশেষ কাজে কোনো দিন একটু দেরি হলে,

—তাতে কিছু ক্ষতি হবে না স্যার। আমরা একটু বসব।

—হ্যাঁ। একটু বসলেই আমার দেখা পাবে।

আর কি কথা বলা যায়? উভয়েই আসল প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলছে। স্থকুমার আশা করছে, ছেলেরাই প্রথম কথাটা তুলুক্। ছেলেরা সাহস পাচ্ছে না। স্থকুমার তাদের ছেড়ে চলল এতে তারা যে খুশি হয়নি তা তাদের মুখ দেখেই বোঝা যায়। এই স্বল্পভাষী, প্রিয়বাদী শিক্ষককে এরা অত্যন্ত ভালোবেসেছে। স্থকুমার শুধু যে ভালো পড়াত তাই নয়, সে কখনও কোনো ছেলেকে রূঢ় কথা বলেনি। কেউ কোনো অন্যায় আচরণ করলে, সে হয় একটুখানি হাসত, নয়তো নিঃশব্দে গম্ভীর হয়ে বসে থাকত। এতেই ছেলেদের লজ্জার অবধি থাকত না। এমনি করে ধীরে ধীরে স্থকুমারের উপর সকলেরই শ্রদ্ধা জেগেছে। তাদের প্রতি স্থকুমারের স্নেহের প্রতিদানে তারাও তাকে পরমাত্মীয়ের মত ভালোবেসেছে। তাই সে শিক্ষকতা ত্যাগ করায় তারা অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তারা এই ভেবে গৌরব এবং গর্ব অনুভব করেছে যে, তাদের অন্তত একজন শিক্ষক আছেন যিনি এতটুকুও লাঞ্ছনা সইতে প্রস্তুত নন, মনুষ্যত্বে আঘাত লাগলে ক্ষতিকে যিনি ভয় করেন না। ছেলেদের মন ভাবের রাজ্যে বিচরণ করে। সেখানে তারা যথেষ্ট সমারোহ করে খুব উঁচুতে স্থকুমারের আসন তৈরি করলে। এই ব্যাপারে দুঃখের মধ্যেও এইটুকুই সান্ত্বনা।

রাত্রি হয়ে যাচ্ছে দেখে ছেলেরা আর দাঁড়ালে না। সুকুমারের পায়ের ধূলো নিয়ে চলে গেল। বলে গেল—সময় পেলেই তারা মাঝে মাঝে বিরক্ত করতে আসবে।

সুকুমার শুধু হাসলে, জবাব দিলে না।

ওরা চলে গেলে সে আলোর দিকে পিছন ফিরে নিঃশব্দে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। মনে তার এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে। নির্দিষ্ট করে কোন কিছুই সে ভাবতে পারলে না। মনের বল্‌গা যেন তার হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। যেন মনের সঙ্গে যোগই গিয়েছে ছিঁড়ে। নিশ্চিন্ত নিঃশব্দে সুকুমার দাঁড়িয়ে রইল।

গলা ঝেড়ে রায়মশাই জিজ্ঞাসা করলে, চাকরিটা গেল নাকি সুকুমারবাবু?

সুকুমার চমকে উঠল। সে যেন এ সময় মানুষের কণ্ঠস্বর শোনবারই আশা করেনি। চেয়ে দেখলে, রায়মশাই ঘুমোয়নি। পিট পিট করে চেয়ে আছে।

সুকুমার বললে, আপনি ঘুমোন নি?

রায়মশাই মুখের ঢাকা আরও একটু খুলে হেসে বললে, ঘুম আমার খুব কমই হয়, বুঝলেন?

সুকুমার হেসে জিজ্ঞাসা করলে, তবে সন্ধ্যে ছ'টা থেকে সারা রাত করেন কি?

—একটু বিশ্রাম। সারাদিনের খাটুনির পরে

—ঘুম আসে না?

রায়মশাই ঝেড়ে উঠে বসল। বললে, আসবে কোথা থেকে মশাই? এই সেদিন ছেলেটার পরীক্ষার ফি দিলাম পঁচিশ টাকা। দেখলেন তো? আজ চিঠি এল মেয়ে-জামাইএর শীতের তত্ত্ব পাঠাতে আর একটা দিনও দেরি করা চলবে না।

—শীতের তত্ত্ব এখনও করেননি?

রায়মশাই চটে গেল। ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, আপনি তো মোলায়েম করে বললেন করেননি? কিন্তু করি কোথেকে? ওই তো মাইনে। তার ধুতে-

বাছতে কি থাকে বলুন তো? আমি তো আর এখানে টাকা জাল করি না! বাঁধা মাইনে।

—তা বটে।

সুকুমারের সমর্থন এবং সহানুভূতি পেয়ে রায়মশাই একটু শান্ত হল। বললে, সেখানে একটা সংসার আছে। এখানে মেসের খরচও মন্দ নয়। এ সব চালিয়ে কিই বা বাঁচবে!

সুকুমার অন্যমনস্কভাবে বললে, তা আর নয়!

রায়মশাই হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল, তবে?

সুকুমার মাথা চুলকে বললে, কিন্তু দিতে তো হবে। মেয়ের বিয়ে যখন দিয়েছেন, তখন

রায়মশাই বিমর্ষভাবে বললে, সেই কথাই তো ভাবছি মশাই। দিতে হবেই। যেখান থেকেই পাই। কিন্তু পাই কোথা থেকে? অ্যাঁ?

রায়মশাই আবার শুয়ে পড়ল।

সুকুমার বললে, আবার শুলেন যে! খেতে হবে না?

—খেতে আবার হবে না? বিলক্ষণ! যত চিন্তাই থাক একটি বেলা খাওয়া বন্ধ রাখবার উপায় নেই।

রায়মশাই উঠে বসল। টিনের কৌটো থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরিয়ে বললে, আমার আবার এমনি ধাত, জানলেন, যে একটি মিনিট ক্ষিধে সইতে পারি না। বাবা আমায় টাকা দিয়ে যান নি বটে, কিন্তু এই সব ভালো ভালো গুণ কতকগুলো দিয়ে গেছেন। পৈতৃক ঋণের মত সেই সব মহৎ গুণগুলি আর কিছুতে সঙ্গ ছাড়ে না।

রায়মশাই হো হো করে হেসে উঠল।

সুকুমারও হেসে ফেললে। বললে, চলুন তবে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও আর দেরি করা কাজের কথা নয়। যে বাহারের রান্না, ঠাণ্ডা হলে ও আর মুখে দেওয়া যাবে না।

—যা বলেছেন!

সকাল বেলায় রমেশ এল পান চিবুতে চিবুতে। বাঁ হাতে এখনও একটি পান রয়েছে। ডান হাতে একটি পানের বোঁটায় চুণ।

রমেশ বয়সে সুকুমারের সমান হলেও একটু হিসেবী। মেসে বেশি খরচ হয় বলে সে মেসে থাকে না। তাদের গ্রামের একটি লোকেব ওষুধের দোকান আছে, তারই একখানা অব্যবহার্য ঘরে সে এবং দোকানের কয়েকজন কম্পাউণ্ডার থাকে। খায় একটা হোটেলে। এই দিকে একটা চায়ের দোকানে দুবেলা চা খায়। পথে একটা উড়ের দোকানে পান কিনে সুকুমারের মেসে এসেছে।

রমেশকে দেখে সুকুমারের মন খুশিতে ভরে উঠল। ওকে নিয়ে সে যে কি করবে, কোথায় বসাবে ভেবে পেলে না। তার ঘরে আসনের মধ্যে ছোট একখানি আমকাঠের তক্তাপোষ। তার উপর অত্যন্ত পাতলা একখানি তোষক। বিছানার চাদরটিও সময় বুঝে ময়লা হয়েছে।

এক গাল হেসে সুকুমার রমেশকে স্বাগত জানালে। বললে, কি ভাগ্যি! আসুন, আসুন।

উত্তরে রমেশ একটুখানি ফিকা হাসলে। অবহেলার সঙ্গে সঙ্কীর্ণ ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। পরে গম্ভীরভাবে বললে, কাল কাউকে কোনো কথা না জিগ্যেস করে সাত তাড়াতাড়ি কি করে এলেন বলুন তো?

সুকুমার হো হো করে হেসে বললে, কি করে এলাম?

রমেশ বুঝলে তার গাম্ভীর্য যথোচিত হয়নি। ভালো করে বসে আরও বেশি গম্ভীর হল। ছোট করে বললে, ভালো করেন নি!

সুকুমারও গম্ভীর হল। বললে, তা ছাড়া আর কি পথ ছিল বলুন?

—পথ থাকে না। আমাদের জন্যে কোথাও পথ তৈরি করা নেই। তৈরি করে নিতে হয়।

—কেমন করে?

রমেশ বিজ্ঞের মত হেসে বললে, তাই কি কেউ বলতে পারে ! অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।

—বেশ। আমার অবস্থায় কি ব্যবস্থা করতেন বলুন।

—একটা কিছু সম্ভব হত নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি যে বিনা বিবেচনায় হাতের ঢিল ছুঁড়ে দিলেন।

রমেশের কথাগুলো যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে চলে গেল।

সুকুমার মাথা নেড়ে বললে, কিচ্ছু হত না রমেশবাবু, যেতে আমাকে হতই। এ বরং মানে মানে বিদায় নিলাম।

—অন্য কোথাও কিছু জুটেছে নাকি ?

—কোথাও না।

—সে তো বুঝতেই পারছি। তাহলে ?

রমেশ চিন্তিতভাবে পা দোলাতে লাগল।

সুকুমারের হঠাৎ মনে হল, রমেশ তার চেয়ে এক ধাপ উপরে। গত কালের আগে পর্যন্ত সে-ই রমেশকে, অনুকম্পার সঙ্গে না হোক, সহানুভূতির সঙ্গে দেখে এসেছে। স্কুলের বেতন দু'জনেরই সমান হলেও ট্যুইশানে এবং ছেলেদের নোট লিখে সুকুমারের আরও কিছু আসত। রমেশকে দেখে অনেক বার তার মনে হয়েছে, আহা বেচারা ! এই সামান্য বেতনে কি করে যে চলে তার ! এখন রমেশের পা দোলানো দেখে তার মনে হল, হায় ! সে যদি সুকুমার না হয়ে অন্তত রমেশও হত—তাহলে কি সুখেরই না হত !

সুকুমার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

রমেশ একটু হেসে বললে, আপনার চাকরি যে থাকবে না সে আমি আগেই জানতাম।

বিস্মিতভাবে সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, কি করে ?

—আপনার পড়ানোর ভঙ্গি দেখে।

—কি দোষ হত ?

—দোষ কিছুই নয়। ছেলেদের জন্যে আপনি যে কত পরিশ্রম করতেন সে বুঝি।

—তবে ?

রমেশ একটু বাঁকা হেসে বললে, ওতে ছেলেদের পাস করার কোন সুবিধা হয় না।

সুকুমার বিরক্তভাবে চুপ করে রইল। এ অভিযোগ সে ইতিপূর্বে বহুবার শুনেছে। কিন্তু তার সত্যতায় তার তখনও আস্থা হয়নি, এখনও না। এদের মন জমে বরফ হয়ে গেছে। বুদ্ধি পাথর হয়ে গেছে। এরা নিজেরাও ফাঁকি দেয়, তরলমতি ছেলেদেরও ফাঁকি দিতে শেখায়। যারা গতানুগতিকতা ছেড়ে কোন মৌলিক পন্থায় চলে, তাদের সম্বন্ধে এদের একটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন আতঙ্ক আছে। সুকুমার বুঝেছে এদের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তর্ক সে করেও না। এখনও চুপ করে রইল।

রমেশ বলতে লাগল, অশ্বিনীবাবু যে বলেন,

সুকুমার অশ্বিনীবাবুর নাম শুনে তেলে-বেগুণে জ্বলে উঠল। এই লোকটিকে সে কোনোদিনই প্রীতির এবং শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারেনি। ওর বকের মত মাথা নেড়ে নেড়ে চলা, শেলায়ের কলের সূচের মত বিজ্ঞভাবে মাথা দোলানো,অপরের ভাবালুতায় হাস্যপূর্ণ অবজ্ঞা এবং অযথা প্রহারে প্রীতি—তার মনে নিদারুণ বিতৃষ্ণা উদ্রেক করে। অশ্বিনীবাবুর নাম করতেই সে আর সহ্য করতে পারলে না। বলে উঠল, অশ্বিনীবাবুর কথা থাক। তিনি কি বলেন সে আমিও জানি। কিন্তু আপনিই বলুন তো, ছেলেদের পরীক্ষা পাস করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কি শিক্ষকদের ?

—নিশ্চয়ই ! নইলে মাইনে দিয়ে আমাদের রেখেছে কেন ?

—মাইনে দিয়ে। তা বটে।—সুকুমার যেন একটা ধাক্কা সামলে নিলে। বললে, আমাদের রেখেছে সেজন্যে নয়। পাঁচ সিকের বইতে যা পাওয়া যায় না, রেখেছে সেই কথা শোনাবার জন্যে। ভাষার আড়ালে যে কথা গোপন থাকে, রেখেছে সেই কথা জানাবার জন্যে। যে জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান ছেলেরা এখনও পায়নি, আমাদের কাজ সেই সম্বন্ধে লোভ জাগানো।

সুকুমারের ভাবালুতায় হেসে রমেশ যেন তার কথাকে ব্যঙ্গ করবার জন্যে বললে, তারপরে ?

—তারপরে ছেলেরা নিজে খাটবে! যা নিজেদের বইতে নেই তা অন্য বইতে পাওয়ার জন্যে খুঁজবে। নয় তো আমাদের জিগ্যেস করবে। নিজেরাই বুঝবে কোনটা মনে রাখা বেশি দরকারি। কালের স্রোতঃপথের ধারাবাহিকতার সন্ধান পেলে উৎসের দিকে উজান চলা তাদের কিছুমাত্র কষ্টকর হবে না।

—কিন্তু তাতে যদি পরীক্ষায় ফেল করে ?

—পরের বৎসর পাস করবে। তখন আর সে-পাসের মধ্যে ফাঁকি কোথাও থাকবে না।

রমেশ ঠোঁট টিপে হাসলে। বললে, একটা বৎসর এইভাবে লোকসান করার মানে জানেন ?

—না।

—মানে প্রায় পাঁচশো টাকা।

—কি করে ?

—অতিরিক্ত এক বৎসরের পড়ার খরচ আছে। আর যে বৎসরটা নষ্ট হল সেই বৎসর একটা ত্রিশ টাকারও চাকরি পেলে কত হয় হিসেব করুন।

সুকুমার ব্যথিতভাবে বললে, এটা কী হিসেব হল ?

—বেনের হিসেব।

—বেনের হিসেব কি এখানেও চলবে ?

—চলবে না? এ শিক্ষার পরিণতিই যে বেনের দোকানে মোটা মোটা খাতায়!

রমেশ পরিহাস করছে, কিম্বা সত্য সত্যই বলছে বুঝতে না পেরে সুকুমার তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

রমেশ হেসে বললে, অবাক হবেন না সুকুমারবাবু! বেনের দোকানে চাকরি করা ছাড়া লেখাপড়া শেখার আর কি উদ্দেশ্য আছে বলুন ? আর সেই বেনের

দোকানে ইতিহাস-ভূগোল-ফিলজফি-কেমিস্ট্রির কতখানি দরকার লাগে তাও বলুন।

—লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন কি ওইতেই শেষ হয়ে গেল ?

—গেল বই কি! যাওয়া উচিত হয়নি মানি, কিন্তু গেল। আপনার আমার গেছে, যাদের পড়বার ভার নিয়েছি তাদের ওইতেই শেষ হয়ে যাবে। এ ধ্রুব।

জোরের সঙ্গে মাথা নেড়ে সুকুমার উত্তেজিতভাবে বললে, আমি মানি না!

রমেশ হো হো করে হেসে বললে, নাই বা মানলেন। আপনার মানা-না-মানার অপেক্ষাও রাখে না।

ওর হাসি সুকুমার কানেই তুলল না। উত্তেজনার বশে বলে চলল, আমি কি স্থির করেছি জানেন ? সওদাগরি অফিসে চাকরি যদি পাই তো নোব না। যে পথে সবাই চলেছে গড্ডালিকার মতো, সে পথে যাব না। তার জন্যে যে মূল্যই দিতে হোক না কেন।

উত্তেজনায় ওর নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে উঠল। ঘন ঘন উচ্চ নিশ্বাস বইতে লাগল। ওর মুখ-চোখের উত্তেজিত ভাব দেখে রমেশ হাসতে গিয়েও থমকে গেল।

ধীরে ধীরে বললে, ভালোই। পারলে খুবই ভালো। কিন্তু সে পথ কিছু স্থির করেছেন ?

—না।

হাসি চেপে রমেশ বললে, তবে ?

চিন্তিতভাবে সুকুমার বললে, কোনো খবরের কাগজে যদি একটা কিছু পাই তো করি। অন্তত সেজন্যে খানিকটা চেষ্টা করব। কিছুদিন থেকে কতকগুলি খবরের কাগজের আফিসের সঙ্গে জানা শোনাও হয়েছে। মনে হয়,

—লেগে যেতে পারে ?

—অসম্ভব নয়।

—দেখুন চেষ্টা করে।

সুকুমার নিঃশব্দে কি ভাবে চেষ্টা করা যায় ভাবতে বসল।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে রমেশ হঠাৎ বললে, আর ওদিকের কি ব্যবস্থা করবেন ?

—কোন দিকের ?

—স্কুলের বাকি টাকার ?

সে সমস্যা সুকুমারের মনেও আছে। সে বিব্রতভাবে বললে, কি করা যায় বলুন তো ? অন্তত কিছু টাকা বোধ হয় মারাই যাবে।

হাত নেড়ে রমেশ বললে, গেলেই হল ! ন্যায্য খেটেছেন, মাইনে মারা যাবে কেন ?

অসহায়ভাবে সুকুমার বললে, কি করব তবে ? না দিলে আমি কি করতে পারি ? এই সামান্য কটা টাকার জন্যে আমি কোর্টে ছুটোছুটি নিশ্চয়ই করতে পারব না।

রমেশ এইবার ভাল করে গম্ভীর ভাবে চেপে বসল। বললে, ওই তো আপনাদের মত স্বভাবের লোকের দোষ। নিজেও মারা যান, পরকেও মেরে যান।

—কি করে ?

—না তো কি ! আপনাকে আজ ফাঁকি দিতে পারলে, কাল আমাকেও ফাঁকি দেবার সাহস বাড়বে। জানবে এ বেচারাও হয়তো আর কিছু করতে পারবে না। এদের নির্বিবাদে exploit করা চলবে। আর আজ যদি আপনার কাছে ঠেলা পায়,

—কি করে পাবে ?

রমেশ নড়বড়ে তক্তাপোষটায় সজোরে একটা চাপড় দিলে। সে প্রচণ্ড চাপড়ে তক্তাপোষখানা থর-থর করে কেঁপে উঠল।

বললে, সেই কথা বলতেই এলাম। আপনাকে তো জানি কি না ! একদিনের ওপর দুদিন হয়তো তাগাদা করতে যাবেন। তারপর বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেবেন।

—আর কি করব ?

—ওই তো ! ওতে হবে না।

—কিসে হবে তাই বলুন না !

—দরকার হলে ইন্‌স্পেক্টার অফিসে দরখাস্ত করতে হবে। আপনি বোধহয় জানেন না, এর আগে আরও দুজনকে তাই করে টাকা আদায় করতে হয়েছে। তাতেই তো ইন্‌স্পেক্টার অফিস চটে আছে, এর ওপর আপনার দরখাস্ত গেলে recognitionই বন্ধ হয়ে যাবে !

জিভ কেটে সুকুমার বললে, না না। অতখানি করা ঠিক হবে না। তবু তো যাহোক কতকগুলি শিক্ষকের অন্নসংস্থান হচ্ছে। অনেকগুলি ছেলে পড়ছেও।

হা হা করে হেসে রমেশ বললে, পাগল হয়েছেন ! অতখানি করবার হয়তো আবশ্যকই হবে না। কিন্তু ওই ভয় দেখাতে হবে। আপনি আমাদের অন্ন সংস্থানের কথা ভাবছেন মশাই, কিন্তু স্কুল রাখার প্রয়োজন আমাদের চেয়েও সেক্রেটারীর বেশি।

—কেন ?

রমেশ আরও জোরে হেসে বললে, আপনি মশাই একেবারে ছেলেমানুষ। যা হোক কিছুকাল ধরে মাস্টারি তো করলেন, কিন্তু চোখ মেলে কিছুই তলিয়ে দেখেন নি। খালি গাধার মত খেটেছেন, আর ছেলেগুলোকে ফেল করার রাজপথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

ওর কথা শুনে সুকুমারও বোকার মত হাসতে লাগল। আর চকমক করে চেয়ে চেয়ে ভাবতে লাগল, কোন দিকটা সে ভাল করে তলিয়ে দেখেনি।

প্রায় ওর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে রমেশ বললে, স্কুল থেকে বছরে যে টাকাটা সেক্রেটারী পায় তাও না হয় ছেড়েই দিন। তা ছাড়াও কি কম সুবিধাটা পায় !

সুকুমার তথাপি বুঝতে পারলে না। বোকার মত ফ্যাল ফ্যাল করে চাইতে লাগল।

রমেশ তার এই নির্বুদ্ধিতায় বিরক্ত হয়ে বললে, আরে মশাই, এই স্কুলটা না থাকলে ও কি কর্পোরেশনে যেতে পারত ভেবেছেন ? পাঁচজনের পাঁচটা ছেলে পড়ে, তারা কিছু খাতির না করে পারে না। তার ওপর আমরা আছি। গেল ইলেক্‌শনের সময় ছিলেন না তো। পড়াশুনো সব বন্ধ। ছেলেরা সাজগোজ করে স্কুলে আসে, আর পাঁচটা পর্যন্ত হো হো করে, মার্বেল খেলে, লাট্টু ঘুরিয়ে বাড়ি যায়। আর আমরা কোমরে চাদর জড়িয়ে ভোটারের বাড়ি-বাড়ি দিনরাত ঘুরে বেড়াই। বড় বড় ছেলেরাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। এমনি চলেছিল পূরো একটি মাস। বিনা পয়সায় এতগুলি ক্যানভাসার কোথায় পেত বলুন তো ?

সুকুমার মাথা নেড়ে বললে, তা বটে।

—এবার আবার কাউন্সিলে দাঁড়াচ্ছে, শুনেছেন ?

—হ্যাঁ।

—কি সাহসে দাঁড়াচ্ছে বলুন তো ? স্কুলটি না থাকলে পারত ? জনসাধারণের কাছে ভোট চাইবার কি অধিকার ওর আছে ?

সুকুমার চুপ করে রইল।

—তবেই বুঝুন, স্কুল ও ওঠাতে পারবে না। যতদিন না তাড়াচ্ছে ততদিন আমরাও আছি। যদি দেখেন টাকাটা দেবার মতলব নেই, অমনি ইন্‌স্পেক্টার অফিসে দরখাস্ত করার ভয় দেখাবেন। দেখবেন, ভড়্‌কে গেছে।

যুক্তিটা সুকুমারেরও ভালো মনে হল ! বললে, এটা আপনি মন্দ বলেন নি। আসছে রবিবারে সকালের দিকে আসবেন একবার—আপনি তো চা খেতে এদিকে রোজই আসেন।

রমেশ হেসে বললে, প্রত্যহ আসি। এত দুঃখদুর্দশার মধ্যেও ওইটুকু বিলাসিতা রেখেছি। ড্রিঙ্ক ওয়েল কেবিনের চা আর উড়ের দোকানের গুণ্ডি-দেওয়া পান, এ না হলে একটি বেলা আমার চলে না।

—কিন্তু আপনার বাসা তো অনেক দূরে।

—দেড় মাইলের কম নয়, মানে উজিয়ে উড়ের দোকান পর্যন্ত যাওয়ার জন্যে। এই দেড় মাইল সকালে একবার, বিকেলে একবার।

দুজনেই হাসলে।

রমেশ তক্তাপোষ ছেড়ে উঠে একটা হাই তুলে বললে, তাহলে তাই হবে। রবিবার সকালে এসে জেনে যাব কি স্থির হল। আপনি থাকবেন যেন।

—নিশ্চয়।

—আমি এই আজ যেমন সময়ে এলাম এই রকম সময়েই আসব।

—তাই আসবেন।

—আচ্ছা, নমস্কার। নটা বাজেনি নিশ্চয়ই। আজও পর্যন্ত আবার স্কুল আছে তো।

সুকুমার বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে, আজও পর্যন্ত মানে? আপনার আবার কি হল?

—হয়নি কিছুই। কিন্তু হতে কতক্ষণ! হয়তো গিয়েই শুনব আমাকে আর দরকার নেই। আমাদের তো এই রকমের চাকরি কিনা! যাও বললেই উঠতে হবে।

সুকুমার হেসে বললে, সে ঠিক। স্থায়িত্ব বলে কিছু নেই।

রমেশ উঠছিল, ফের বসল। বললে, ওই জন্যই তো আমাদের এত দুর্দশা। সর্বদা মাথা নিচু করে চলতে হয়। প্রভুর মর্জি বুঝে দাঁত বের করে হাসতে হয়। মাঝে মাঝে প্রভুগৃহে গিয়ে তাঁর পুত্রকন্যাকে কোলে নিয়ে আদর করতে হয়। ওই স্থায়িত্ব নেই বলে না এত গ্লানি! নিজেদেরও মনুষ্যত্ব খর্ব হচ্ছে, অন্যের মনুষ্যত্ব বিকাশেও বাধা দিচ্ছি। এমনি করে আমরা কেরানীর অধম হয়ে পড়েছি।

রমেশ যেন বিষণ্ণভাবে কি ভাবলে।

একটু পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, আজকে তাহলে উঠলাম সুকুমারবাবু। রবিবারে থাকবেন, আমি আসব।

রমেশ নমস্কার করে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

হংসবলাকার একটি যাত্রী আজ পর্যন্ত চলতে চলতে কত দূরে এসে পৌঁছল? মাঝে মাঝে সুমুখ পানে কতক দূর এগিয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে যাত্রা হয়েছে থামাতে—আবার কখনও পিছিয়েই আসতে হয়েছে। গতিও সর্বত্র এক নয়। কখনও দ্রুত, কখনও মন্থর, কখনও শৃঙ্খলিত। জীবনের যাত্রাপথ কোথাও মসৃণ, কোথাও বন্ধুর; কোথাও ঋজু, কোথাও বক্র। সুকুমার তার এই ছাব্বিশ বৎসরের জীবনকালে কতদূর এল?

অলস মধ্যাহ্নে সুকুমারের মুদ্রিত চোখের দৃষ্টি দূর অতীতে পিছিয়ে চলে। যে বিশেষ গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশে সে জন্ম নিয়েছে, সেই বিশেষ মুহূর্তে আরও কত কোটি কোটি শিশুর জন্ম হয়েছে কে জানে। জ্যোতিষ যদি সত্য হয় তাহলে তারা সবাই কি এই মুহূর্তে তারই মত অসহায় অবস্থায় পাখা ঝাপ্‌টাচ্ছে? সে তাহলে একা নয়? আরও যে কোটি কোটি ছেলে ভগবানের দেওয়া অন্ধকারে পথ হারিয়েছে, সে তাদেরই একজন—কোটিতম। অকারণে সুকুমার উল্লসিত হয়ে উঠল। মনে মনে বললে—ভগবান, জ্যোতিষ যদি সত্য হয়! জ্যোতিষ যেন সত্য হয়! সংসারে দুঃখ পাওয়ার দুঃখ অনেক, কিন্তু একা দুঃখ পাওয়ার দুঃখ আরও বেশি। সে দুঃখ একেবারে মানুষের পৌরুষে গিয়ে আঘাত দেয়। শৈশবে তার সঙ্গে যারা যাত্রা করেছিল, আজকে তারা কত দূরে! যাদের সঙ্গে একদা সে নিজেকে অচ্ছেদ্য ভেবেছিল, আজ আর তাদের কথা মনেও পড়ে না। এখন তারা কেউ মাঠে কাটছে সোনার বরণ ধান, কেউ আগুনের মত টকটকে লাল লোহাকে পিটিয়ে বানাচ্ছে লাঙলের ফাল। কেউ সোনার পাতে তুলছে নানা রকমের ফুল-লতা-পাতা, মাকুর একটানা শব্দের মধ্যে আপন মনে কেউ বুনে চলেছে বিচিত্র বর্ণের গামছা। কেউ কর্মহীন শীতের দ্বিপ্রহরে মুক্ত প্রাঙ্গণে রোদে বসে খেলছে তাস-পাশা-দাবা, আবার কেউ বা চারতালা বাড়ির একটা প্রায়ান্ধকার কক্ষে বসে ডেবিট ক্রেডিট মিল করছে, নয় তো ল্যাট্রিনের পাশে

দাঁড়িয়ে লুকিয়ে বিড়ি ফুঁক্‌ছে। তার ছেলেবেলার সঙ্গীরা কেউ কামার, কেউ কুমোর, কেউ তাঁতী, কেউ বা কেরানী। এককালে এদের সঙ্গ তার অচ্ছেদ্য মনে হত। ঘুরতে ঘুরতে আজ সে তাদের কাছ থেকে কত দূরেই না সরে এসেছে! তার পরেও কত বিচিত্র আবহাওয়ায় কত বন্ধুর দল এসেছে গেছে, আবার নতুন বন্ধু এসে তাদের স্থান পূর্ণ করেছে। শুধু কি তারাই? তার জন্মভূমিও যেন আর তাকে তেমন করে টানতে পারে না! জলভরা পুকুরের উঁচু উঁচু পাড়, বাঁশের বন, কোমল গ্রাম্যপথ, সমস্ত থেকে কেমন করে যেন সে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছে। সেখানে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা মিছে। সুমুখে তাকে চলতেই হবে।

কিন্তু কোথায়? একটা মাস তার মাস্টারি নেই। এই একটা মাস সে কি করেছে, আর কি যে করেনি—তার ঠিক নেই। এর মধ্যে সে যায় নি এমন স্থান নেই, ধরে নি এমন লোক নেই। ভেবেছিল এই সময়টা সে ক্রমাগত লিখবে, অনেক কিছু লিখবে। কিন্তু একটা লাইনও লিখতে পারেনি। এই অস্থির মন নিয়ে লেখা অসম্ভব। পড়েও নি। আগে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে যাওয়ার সময় পেত না বলে কত দুঃখই করেছে। এখন সময় অঢেল। কিন্তু যাওয়া আর ঘটে ওঠে না। যাওয়ার ইচ্ছাই হয় না। লাইব্রেরির টিকিটখানাই খুঁজে পাচ্ছে না। বোধ হয় হারিয়েই গেছে।

এখন সে শুধু ভাবে। খাওয়া-দাওয়ার পরে জনহীন মেসের একটি নির্জন কক্ষে বসে কেবল ভাবে। কি যে ভাবে তার মাথা-মুণ্ডু নেই। হয় তো ভাবে—সে যেন একজন মস্তবড় গ্রন্থকার হয়েছে। মাসে মাসে তার বইয়ের সংস্করণ হচ্ছে। মোটা মোটা অঙ্কের আসছে চেক। তার থেকে বালীগঞ্জে উঠছে বাড়ি, আর হচ্ছে প্রকাণ্ড বড় গাড়ি। সেই গাড়িখানা নিয়ে একদিন সে চন্দ্রভূষণের নাকের নিচে দিয়ে হাঁকিয়ে যেতে পারে তো মনের ঝাল মেটে। এই লোকটির উপর সে বেজায় চটে গেছে। মেসের তাগাদায় অস্থির হয়ে ক'দিন আগে দুটি টাকা ধার করবার জন্যে চন্দ্রভূষণের কাছে গিয়েছিল। চন্দ্রভূষণ টাকা না দিয়ে দিলে

বিস্তর উপদেশ। প্রথমে মাস্টারি ছেড়ে দেওয়ার জন্যে খুব এক চোট তিরস্কার করলে এবং ভবিষ্যতে এমন দুষ্কার্য আর কখনও না করবার জন্যে সতর্ক করে দিলে। উপসংহারে তার নিজের আসন্ন তিন শত টাকা ব্যয়ের ফর্দ দিয়ে এমন কাঁদুনি আরম্ভ করলে যে সুকুমার একেবারে অথই জলে হাবুডুবু খেতে লাগল। অবশেষে বহু কষ্টে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। ওঠবার সময় চন্দ্রভূষণ তাকে সান্ত্বনার সুরে বলেছিল—ভাই রে, মোটা টাকা মাইনে পাই বলে যদি ভেবে থাক আমার কাছে সব সময় টাকা থাকে, সে ভুল। সবাই সমান। তুমি দু'টাকার ভাবনায় ব্যস্ত, আমার ভাবনা তিনশো টাকার।

এই ক্রোধ সুকুমার কিছুতে ভুলতে পারে না। যখনই মনে পড়ে, বিছার কামড়ের যন্ত্রণার মত তার বুক জ্বলে জ্বলে ওঠে। অথচ একটা কথা ভাবে না, চন্দ্রভূষণ যখন তাকে এই সব উপদেশামৃত বর্ষণ করছিল তখন তার এই তেজ ছিল কোথায়? তখন তো সে মুখ বুজেই সমস্ত সহ্য করেছিল—একটা কথাও বলেনি। আসলে নিজের কাছেই সে সব চেয়ে আগে ছোট হয়ে গেছে। সেইটেই তার নিজের চোখে পড়ে না। অথচ শুধু এই জন্যেই লোকে যখন তার মাথায় চোখা চোখা উপদেশ ঘা দিয়ে দিয়ে বসিয়ে দেয়, সে একটা কথাও বলতে পারে না। ফলে প্রকারান্তরে তাদের উপদেশ দেবার অধিকারকেই স্বীকার করে আসে। এসে বাড়িতে বসে নিষ্ফল আক্রোশে ফুলতে থাকে। অবশ্য আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি যাওয়া সে ছেড়েছে। কিন্তু পথে অকস্মাৎ দেখা হয়ে গেলে আর উপায় কি?

শুধু আত্মীয়-স্বজন নয়, বাড়িতেও এই একটা মাসের মধ্যে সে একখানাও চিঠি দেয়নি। তার বাবার অবশ্য চিঠিপত্র দেওয়ার অভ্যাস কম। বিশেষ এই খামখেয়ালি ছেলের কাছে উত্তরের আশা কম বলেই আরও চিঠি দেন না। কিন্তু মণিমালার কাছ থেকে পর পর তিনখানা চিঠি এসেছে। তার চিঠি না পেয়ে বাড়ির সকলে যে কি দুশ্চিন্তায় কাল কাটাচ্ছে সে সংবাদ তো আছেই, তার উপরে পরবর্তী শনিবারে অন্তত একটি দিনের জন্যেও বাড়ি যেতে বার বার মাথার দিব্য দেওয়া আছে। কিন্তু সুকুমার যায় কি করে? রেল কোম্পানী বিনা

ভাড়াতে যাতায়াত করতে দেবে না, ধারেও না। আর যদি বা রেলভাড়া কোন রকমে যোগাড় হয়, এই মন নিয়ে প্রিয়জনের কাছে যাওয়া যায়? তিনখানা চিঠিই সে একবার করে চোখ বুলিয়ে বিছানার নিচে রেখে দিয়েছে। বিছানায় শুলেই সেগুলি তার বুকে কাঁটার মত বেঁধে এবং সে মণিমালার উপর চটে ওঠে।

মাঝে মাঝে তার মনে একটা আশ্চর্য অনুভূতি জাগে। কিছুই যেন তার বিশ্বাস হয় না। বড় রাস্তা থেকে দূরে একটা সঙ্কীর্ণ গলির ভিতর তার মেস। নগরের কর্ম-কোলাহল এতদূর পৌছায় না। এই নিস্তব্ধ পরিবেশের মধ্যে হয় তো ছুটি তিনটি কাক কলতলায় এঁটো বাসনের চারদিকে কলরব তুলেছে। জানালার বাইরে এক ফালি ধোঁয়াটে আকাশ যেন চিররোগীর অর্থহীন চাহনি। অত্যন্ত দুর্বল পাণ্ডুর রোদের একটি শীর্ণ রেখা জানালা দিয়ে ঘরের মেঝেয় এসে পড়েছে। শীতের দ্বিপ্রহরের এই চিরপরিচিত রূপ। কিন্তু সুকুমারের কেমন আশ্চর্য মনে হয়। যেন বিশ্বাস হয় না। এই দুপুর—তার মধ্যে সে শুয়ে আছে একা—হাতে কোনো কাজ নেই—এ যেন তার বিশ্বাস হয় না। এমন কর্মহীন, নিঃসঙ্গ, অলস দিনযাপনে সে এখনও অভ্যস্ত হয় নি। এই সেদিনও তার স্কুল ছিল, সমস্ত দুপুর খাটুনির আর অন্ত ছিল না। অকস্মাৎ এল ছেদ—যেমন অকস্মাৎ মধ্য আফ্রিকায় আসে রাত্রি। এই অবিশ্রান্ত আকস্মিকতার অস্থিরতায় সে ছটফট করতে থাকে। বহুদিনের আগে পড়া সেই ইংরিজি কবিতার ক'টি লাইন মনে পড়ে :

> 'Man's happiest lot is not to be;
> And when we tread life's thorny steep,
> Most blest are they who earliest free
> Descend to death's eternal sleep.'

সুকুমার শুয়ে শুয়ে এই পরম লোভনীয় মৃত্যুর কথা ভাবতে থাকে। তার মনে হয় এই পাণ্ডুর রবিকর, নিঃশব্দ প্রাণস্পন্দহীন দ্বিপ্রহর, শীতল নিঃসঙ্গতা, এ

কখনই জীবলোকের নয়। মেসের ছোট ঘর তার চোখে পরম রহস্যময় হয়ে ওঠে। একটি অপূর্ব আনন্দময় দুঃখে অন্তর প্লাবিত হয়ে যায়। মনের খোপে খোপে জমে রস।

হংসবলাকা ১৪৩

ওর মনে এখনও প্রচুর ভাববিলাসিতা রয়েছে। যে কবি জীবনের সাফল্যে হতাশ হয়ে মৃত্যুকেই মানুষের পরমতম সৌভাগ্য বলে স্থির করেছিলেন তাঁর সঙ্গে সুকুমারের যথেষ্ট অনৈক্য। জীবন সংগ্রামে এখনও তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হয়নি, স্বপ্ন রচনাতেও ক্লান্তি আসেনি। তার দুঃখ যতখানি সত্য, আরও ঠিক ততখানি কাল্পনিক। যতখানি সত্য, তা যেন তার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। যন্ত্রণায় সে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে কাল্পনিক দুঃখ তাকে রঙিন ফানুসের মত অনন্ত আকাশে উড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

সুকুমার শুয়ে শুয়ে ভাবছিল, death's eternal sleep-এর কথা। এমন সময় মেসের চাকর তাকে একটা চিরকুট দিয়ে গেল। পড়ামাত্র তার 'মৃত্যুর চিরনিদ্রার' স্বপ্নজাল ছিঁড়ে খান খান হয়ে গেল।

একটি চিরকুটে ভুল ইংরিজিতে কয়েক ছত্র লেখা। মেসের ম্যানেজার আফিস যাওয়ার সময় রেখে গেছে। এ মাসে জগদীশ ম্যানেজার। ওই দুটি ছত্রে সে সুকুমারকে আজ, নিদেন পক্ষে কাল রাত্রির মধ্যে অগ্রিম টাকার জন্যে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে অবহিত করে গেছে। সেই সঙ্গে অদ্যকার তারিখটা যে আঠারোই সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছে।

সুকুমারের মাথার ভিতরে যেন খানিকটা তরল আগুন শন শন করে বয়ে গেল। জগদীশ একটা কেওকেটা ব্যক্তি নয়। সে তাকে স্বচ্ছন্দে মুখে-মুখেই চাইতে পারত। কোনো দিন যে চায়নি তাও নয়। তাকে বলাও হয়েছে যে স্কুলের বাকি মাইনেটা সে কাল নয় পরশু পাবে। তৎসত্ত্বেও তাকে কাল দেবার জন্য তাগাদা করা এবং তাও মুখে নয়, লিখে—এ যেন তাকে অনাবশ্যক অপমান করার উদ্দেশ্যেই বলে ধরে নিলে।

অবশ্য দশ তারিখের মধ্যেই মেসে অন্তত পাঁচ টাকা অগ্রিম দেওয়াই নিয়ম। ক্বচিৎ কখনও ব্যতিক্রম হলেও সাধ্যমত সে এই নিয়ম এতকাল পালন করেই এসেছে। ক্বচিৎ কখনও ব্যতিক্রম হলেও তখন কেউ কোনো কথা বলেনি। কথা উঠল এই প্রথম। তার অসাক্ষাতে এ নিয়ে মাঝে মাঝে ঘোঁট চলে এ সন্দেহ করারও সম্প্রতি যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। কেন? তারা কি মনে করেছে সুকুমার টাকা না দিয়েই পালিয়ে যাবে? সুকুমার কি এতই অপদার্থ যে তার মেস খরচের টাকাটাও রোজগার করতে পারবে না? তার ট্যুইশান দুটো তো এখনও যায় নি!

এই পাঁচটা টাকা সে এতদিন ফেলেও দিত। কিন্তু বাড়িতে সে এখনও তার চাকরি ছাড়ার কথা জানাতে চায় না। এ খবর শোনামাত্র সংসারে নানা অবশ্যম্ভাবী বিশৃঙ্খলা এসে যাবে। এই ভেবে সে যে তারিখে যে পরিমাণ টাকা এতদিন ধরে বাড়িতে মণি-অর্ডার করে এসেছে, এবারও তাই পাঠাল। তাই মেসের অগ্রিম টাকা আর দিতে পারেনি। ভেবেছিল স্কুলের টাকাটা, অন্তত কিছুও, অবিলম্বে পেয়ে যাবে। সেক্রেটারীও সেই রকমই কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু বড় লোকের কথা ঠিক না রাখলেও চলে, চলে না গরীবের। সুকুমারও তাঁদের কথার উপর ভরসা করে মেসে দু'বার কথার খেলাপ করেছে। খুব সম্ভবত সেই জন্যেই এই পত্রাঘাত। মেসের বাবুরা তথা স্বয়ং ম্যানেজারও বিশ্বাস করেনি যে, সে সত্যই পরশু টাকা দিতে পারবে। সুকুমার নিজেও সে বিষয়ে সুনিশ্চিত নয়। তার নিজেরও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবু অপরের সন্দেহ কিছুতে সহ্য করতে পারলে না। মনে হল ওদের পক্ষে এটা নিতান্তই অনধিকারচর্চা। সে ভীষণ চটে গেল। স্থির করলে, কাল কারও কাছে ধার করেও এই টাকাটা ম্যানেজারের নাকের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু ধার? কার কাছে? কে দেবে? চন্দ্রভূষণের কাছে নয় নিশ্চয়ই। সুকুমার তার অন্য বন্ধুদের নাম স্মরণ করতে লাগল।

চাকরটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। সুকুমার তাকে হাত-ইসারায় চলে যেতে বললে।

চাকরটা বললে, জবাব ?

—জবাব আবার কি ?

—ম্যানেজারবাবু জবাব চেয়েছেন।

সুকুমার উষ্মার সঙ্গে বললে, সে যা দেবার আমি দোব। তুই যা।

চাকরটা আর কিছু বলতে সাহস করলে না। কিন্তু সুকুমারের মনে হল, ওর মুখে যেন একটা বিদ্রূপের হাসি দেখা গেল। সে উত্তেজিতভাবে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু ভেবে দেখলে এ নিয়ে চাকরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করা শোভন নয়, করে লাভও নেই। হয়তো ভুল দেখেছে। কিন্তু ভুলও নয়। ক'দিন থেকেই দেখে আসছে তার সম্বন্ধে ঠাকুর-চাকরেরও আর যেন তেমন সমীহ ভাব নেই। না থাকাও বিচিত্র নয়। মেস-পলিটিক্স আলোচনার প্রকৃষ্ট স্থান হচ্ছে থাবার ঘর। ঠাকুর-চাকরের সামনে। তার সম্বন্ধেও সেখানে আলোচনা হয়, এ সে টের পেয়েছে। তাই কি দিনে কি রাত্রে সে সকলের শেষে খেতে বসে। প্রায়ই একা, কখনও বা রায়মশাই থাকে। যে দিন রায়মশাই থাকে সে দিন গরম ভাতটা পায়। যে দিন থাকে না সে দিন দেখে, তার ভাত ঢাকা আছে। ফলে কড়কড়ে হয়ে গেছে। ঠাকুর-চাকরের খাওয়া শেষ। কিন্তু এই ব্যাপার এতই তুচ্ছ যে এ নিয়ে কোন কথা বলাই সে লজ্জাকর এবং অমর্যাদাজনক মনে করে। আজও সেই ভেবেই ফের শান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। নিজের শোচনীয় অসহায়তায় হাসিও এল। আপন মনে হেসে ভাবলে, Man's happiest lot is not to be ? অ্যাঁ ?

সকালে উঠেই সুকুমার বেরিয়ে গেল। বেরিয়ে যাওয়ার সময় পর্যন্ত স্থির করতে পারলে না কার কাছে প্রথমে যাবে। বন্ধুবান্ধব অনেকেই আছে। ইচ্ছা করলে পাঁচটা টাকাও অনেকেই ধার দিতে পারে। কিন্তু দেবে কি ? মাস্টারিতে নিয়মিত মাইনে না পাওয়া গেলেও তার কল্যাণে ধারটা অনায়াসেই

মিলত। যার হাতে টাকা থাকে, সে ধার শোধ না দিলেও যায় আসে না। যার নেই সে যথাসময়ে ধার শোধ না করলেই পাওনাদারের দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না। তাকে ঘনিষ্ঠতম বন্ধুতেও ধার দিতে দ্বিধা করে। তার নিজেরও ধার চাইতে লজ্জায় মাথা কাটা যায়।

কিছুক্ষণ পথ চলার পরেও যখন সে মন স্থির করতে পারলে না, তখন সম্ভবত মন স্থির করবার জন্মেই পাশের চায়ের দোকানে উঠে পড়ল। এক বাটি চায়ে মাথাও থানিকটা স্থির হবে, একটু চিন্তা করবার অবসরও পাবে। সুকুমার এক পেয়ালা চায়ের ফরমাস দিয়ে সুমুখের খবরের কাগজে চোখ বুলোতে লাগল :

'মুসোলিনীর সমরাভিযান, আবিসিনিয়া আক্রমণের উদ্যোগ' 'রেঙ্গুনে প্রবাসী বাঙালীদের সভা' 'পদ্মা নদীতে নৌকা ডুবি' 'রাষ্ট্রীয় পরিষদে নূতন বিল' 'সুনলিনী হরণের মামলা' 'সাত জন আসামী দায়রা সোপর্দ' 'পরলোকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র দত্ত', 'চলন্ত ট্রেনে ডাক লুঠ' 'মিঃ চার্চিলের অনলোদ্গার' 'প্যালেস্টাইনে আরববিদ্রোহ' 'পাটের দর' 'সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য, শীঘ্রই অস্ত্রোপচার হইবে' 'জওহরলালের ওজস্বিনী বক্তৃতা, সর্বসাধারণের জন্য স্বরাজ চাই' 'চীনে আবার সমরানল, জাপানের চরম পত্র' 'মার্কিণ মহিলার একত্রে তিনটি সন্তান প্রসব, প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল' 'নাট্য নিকেতনে প্রতিজ্ঞা পালন, মহাসমারোহে ত্রিংশ রজনী' 'চিত্রায় প্রহ্লাদ-চরিত্র, অগ্রিম সিট রিজার্ভ হয়' 'কোহাটে আবার ভূমিকম্প, তিন মিনিট ব্যাপী কম্পন' 'আইসল্যাণ্ডে প্রবল তুষারপাত, শিশু-সন্তানসহ একটি রমণীর শোচনীয় মৃত্যু' 'পকেট কাটায় ছয় মাস' 'স্বামী কর্তৃক পত্নী হত্যা, ব্যভিচারের সন্দেহ' 'সোনা রূপার দর চড়িল' 'খুলনায় ঝিনঝিনিয়া রোগের প্রকোপ' 'বাঁকুড়ায় অন্নকষ্ট' 'ক্যাশিয়ারের কীর্তি, বত্রিশ হাজার টাকা উধাও'...

সুকুমার মনে মনে ভাবলে, এই আজকের পৃথিবীর রূপ। এর সঙ্গে যোগ করে দেওয়া যেতে পারে 'পাঁচটি টাকার সন্ধানে সুকুমার রায়, হতাশভাবে চা-পান'। রবীন্দ্রনাথ যে পৃথিবী দেখে ভেবেছিলেন, 'মরিতে চাহি না আমি

সুন্দর ভুবনে' সে সুন্দর ভুবন কোথায়? এক চুমুক চা খেয়ে সুকুমার কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখতে লাগল। বীমা কোম্পানীর এজেণ্ট চাই, সেলাই-এর কলের ক্যানভাসার চাই, খবরের কাগজ বিক্রির হকার চাই, শিক্ষয়িত্রী চাই, পরিশ্রমক্ষম যুবক চাই, টেলিগ্রাম শেখবার ছাত্র চাই, অমুক চাই, তমুক চাই···অবশেষে সুকুমারের চোখ এক জায়গায় আটকে গেল: এম-এ কিম্বা বি-এ পাশ একজন গৃহশিক্ষক চাই! দু'টি শিশুশ্রেণীর ছাত্রকে সকালে দু'ঘণ্টা, সন্ধ্যায় দু'ঘণ্টা পড়াতে হবে—বেতন দশ টাকা। চমৎকার! শিশু শ্রেণীর ছেলেকে পড়াবার জন্যেও এম এ কিম্বা বি-এ পাশ লোক চাই! কারণ, একটা ভদ্রলোককে দিয়ে দু'বেলা দুটো ছেলে পড়িয়ে নিয়ে দশ টাকার কম দেওয়া ভাল দেখায় না এবং দশ টাকাতেই একটা গ্রাজুয়েট যখন পাওয়া যাবে তখন অন্য লোক কেনই বা নেবে। সুকুমার মনে মনে হিসাব করলে সওয়া পাঁচ আনা রোজ অর্থাৎ একটা কুলী হাওড়া স্টেশন থেকে বড়বাজার পর্যন্ত একটা মোট আনতে যা নেয় তারও কম!

সুকুমার কাগজটা ঠেলে রেখে চা পান করতে বসল। হঠাৎ তার একটা জায়গায় নজর পড়ল। স্থানটা বোধ হয় তার গায়ের কাপড়ে আড়াল হয়ে ছিল। উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখলে, কোন একটি কাগজের জন্যে একজন সহকারী সম্পাদক চাই। বেতন যোগ্যতানুসারে। বক্স নং ৭৪৫এ আবেদন করতে হবে। উৎসাহ এবং উত্তেজনায় সুকুমার আর বসে থাকতে পারছিল না। এক চুমুকে চা শেষ করে পয়সা দিয়ে বেরিয়ে এল। কিসের টাকা ধার! এইটে যদি লেগে যায়···

বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে 'সুদর্শন' কাগজে। বাংলা দেশে 'সুদর্শন' একটা বিখ্যাত জাতীয় দৈনিক পত্র। দেশহিতব্রতী কয়েকজন আত্মত্যাগী নেতা এর পরিচালক। স্বয়ং হরিসাধনবাবু সম্পাদক। বাংলা দেশে তাঁর লেখার কদর আছে। সৌভাগ্যক্রমে এঁর সঙ্গে সুকুমারের অল্পদিন হল পরিচয় হয়েছে। ভদ্রলোককে তার খুব ভালো বলেই মনে হয়েছে। লেখা সম্বন্ধে ইনি কথাপ্রসঙ্গে

তাকে যথেষ্ট উৎসাহ এবং উপদেশ দিয়েছেন। সুকুমার স্থির করলে, স্নানাহারের পরে একখানা দরখাস্ত লিখে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। সহকারী সম্পাদক যে কাগজের জন্যেই দরকার হোক, তাঁর কাগজে যখন বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছে তখন একটা-কোনো সন্ধান পাওয়া যাবেই। তারপরে তাঁর সুপারিশেও অনেক কাজ হতে পারবে। সুকুমার জানে না, বিজ্ঞাপন বিভাগের সঙ্গে সম্পাদকীয় বিভাগের কোনোই সম্বন্ধ নেই এবং বক্স নম্বরের গোপনীয়তা ফাঁস করে দেওয়া নিয়মবিরুদ্ধ।

আশায়, আনন্দে, উৎসাহে এবং উদ্দীপনায় সুকুমারের বুকের ভিতরটা আথাল-পাথাল করছিল। এও কি তার জীবনে সত্য হতে পারে? খবরের কাগজে সম্পাদকগিরি? এত ভাগ্য কি সে করেছে? কথায় বলে, বিশ্বগুরু। সেই বিশ্বগুরুর বন্দনীয় আসনে বসবে সে? সুকুমার? এত বড় সম্ভাবনা যেন সে বিশ্বাস করতে পারছিল না।

খবরের কাগজের আফিস সে মাত্র চোখেই দেখেছে। নিচে ছাপাখানায় রোটারি মেশিনের সমুদ্র গর্জনবৎ গুরু গুরু আওয়াজ, উপরে কলিং বেলের ঠুং ঠুং, টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং, চাকর-বেয়ারা বাবুদের কর্মব্যস্ততা—এই সবই তাকে অভিভূত করেছে। সকালে চায়ের পেয়ালা সুমুখে নিয়ে যে কাগজ-খানি পড়া যায় তার পিছনে কত প্রতিভাবান লোকের মস্তিষ্ক পরিচালনা, কত লোকের দেহের শ্রম আছে এই ভেবে সে বিস্মিত হয়েছে। অতঃপর সেই আফিসের প্রত্যেকটি ঘরের এবং প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি কাজের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হবে ভেবে সে আনন্দে অধীর হয়ে উঠল।

তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে সে উপরে এসে দরখাস্তখানা বেশ বিনিয়ে বিনিয়ে লিখতে বসল। নির্জন ঘর। রায়মশাই আফিস গেছেন। চোস্ত করে একখানা দরখাস্ত লেখার সময় এবং সুযোগ দুইই হাতের কাছে এসেছে। কিন্তু কি লিখবে সে? এ কথা সত্য যে ভালো লেখাই যেখানে সবচেয়ে আবশ্যকীয় গুণ, সেখানে এই দরখাস্তখানার উপরেই তার ভাগ্য নির্ভর

করছে। কিন্তু নানা ভাবের আবেগে তার এমন হয়েছে যে কিছুতেই একটা বিশেষ ভাবকে বাগিয়ে লেখনীগত করতে পারছিল না। অবশেষে দুখানা খসড়া ছেঁড়ার পর তৃতীয়খানা তার মন্দ লাগল না। তাতে সে নিজের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতিত্বের কথা লিখেছে, বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রচনাবলীর উল্লেখ করেছে, অবশেষে সাংবাদিক জীবন যে তার কতখানি আশা-আকাঙ্ক্ষার বস্তু তাও নিবেদন করে বিজ্ঞাপিত পদে তাকে নিয়োগ করার সবিনয় প্রার্থনা জানিয়েছে। সামান্য কাটাকুটি ও অদল-বদলের পর এইখানাই সে একখানা পুরু ফুলস্ক্যাপ কাগজে টুকে একখানা লম্বা খামে বন্ধ করলে।

ঘড়িতে তখন একটা সতের। হরিসাধনবাবু দুটোর আগে আসেন না তা সে জানে। সুতরাং পৌনে দুটো, এমন কি দুটোর সময় বেরুলেই যথেষ্ট। কিন্তু ওর মনে তখন এমন ঝড় বইছে যে, এই তেতাল্লিশ মিনিট যেন আর কাটে না। সুকুমার দাড়িটা কামালে, জুতোয় কালি দিলে, ধোয়া কাপড়-জামা হাতের কাছে এনে রাখলে, তথাপি একটা আটাশ! এখনও বত্রিশ মিনিট। রায়মশায়ের এই ঘড়িটার অশেষ গুণ! প্রত্যহ পনেরো মিনিট করে ফাস্ট যায়। সে কথা স্মরণ হতেই সুকুমার হিসাব করতে বসল, চব্বিশ ঘণ্টায় যদি পনেরো মিনিট ফাস্ট যায় তাহলে সকাল থেকে একটা পর্যন্ত এই ক'ঘণ্টায় কতখানি ফাস্ট যাবে। অঙ্ক কষার মত মানসিক অবস্থা তার নয়। ভাবলে জামা-কাপড় পরে রাস্তায় বেরিয়ে তো পড়া যাক, তারপরে যা হয় তা হবে। না হয় একটু সকালেই গেল। নয় তো সামনের পার্কে একটু ঘোরাঘুরি করেই যাবে। এভাবে বসে থাকা অসহ্য।

রায়মশায়ের খাটের শিয়রের দিকে দক্ষিণেশ্বরের মা-কালীর একখানি ছবি টাঙান আছে। ভদ্রলোক সকালে উঠেই কোন পার্থিব প্রাণীর মুখ দর্শনের পূর্বেই তাঁর চরণ দর্শন করে তাঁকে প্রণাম করে। প্রথম প্রথম যখন ছবিখানি সে কিনে আনে, তখন কেবলমাত্র আফিস কিম্বা এই প্রকার কোন গুরুতর স্থানে যাওয়ার সময়ই মাকে প্রণাম করে যেত। সেই অভ্যাস বাড়াতে বাড়াতে এখন এমন

হয়েছে যে, এক পয়সার তামাক কেনবার জন্মে নিচে নামতে হলেও মাকে একবার প্রণাম করা চাই। এমন কি প্রণাম যে করে গেল তাও খেয়াল থাকে না। ঘন ঘন প্রণামের ফলে ছবির নিচেটায় মাথার তেলের একটা কালো চক্রাকার দাগ পড়েছে। এ নিয়ে স্কুমার কতবার রায়মশাইকে তার ভক্তিবাহুল্যের জন্মে প্রকাশ্যে পরিহাস করেছে। রায়মশাই তাতে অপ্রস্তুত হয় না। বলে, দাঁড়ান, আমার মত বয়স হোক, রক্তের তেজ কমুক, আমার মত পাঁচ ঝঞ্ঝাটে ঠেকুন, তখন আপনারও এমনি ভক্তি-শ্রদ্ধা আসবে।

এখন স্কুমার ভেবে দেখলে কথাটা মিথ্যে নয়। রায়মশাই ঠিকই বলেছেন। তারও যেন একটু একটু ভক্তির উদ্রেক হচ্ছে। মনে হল যে যাই বলুক, আর যে যাই করুক, আখেরে ভগবানের কৃপা ছাড়া মানুষের একটি মুহূর্ত চলবে না।

স্কুমার এদিক-ওদিক চেয়ে খুব ভক্তিভরে মা-কালীকে প্রণাম করলে। মনে মনে বললে, মা গো, তোমার দয়ায় আমার জীবনের এই আশাটি যদি সফল হয়, তোমাকে পাঁচটি টাকার ভোগ দোব।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলে একটা বিয়াল্লিশ। যাক, আর পার্কে পাদচারণা করার প্রয়োজন হবে না। হেঁটে গেলে যথাসময়েই 'স্কুদর্শন' আফিসে পৌছুবে। দরখাস্তখানা আর একবার খুলে দেখলে ঠিকই আছে। স্কুমার 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলে যাত্রা করলে।

হরিসাধনবাবু একটু আগেই এসেছিলেন। বিকেলে একটা ছাত্রসভায় তাঁকে সভাপতিত্ব করতে হবে। সে জন্মে একটা সম্পাদকীয় লিখে চলে যাবেন এই ইচ্ছা। তাঁর সম্মুখে লেখবার প্যাড, হাতে কলম, আর অদূরে ধূমায়মান চায়ের বাটি। স্কুমার এসে নমস্কার করতেই হাতের কলম রেখে তিনি তাকে সহাস্যে অভ্যর্থনা করলেন।

—কি ব্যাপার? লেখা নাকি? কিন্তু আপনার ওপর আমি অত্যন্ত রেগে গেছি।

একটা প্রশস্ত টেবিলের ওদিকে সম্পাদক। এদিকে একখানা চেয়ার টেনে সুকুমার বসে মুখে হাসি টেনে বললে, চটে গেছেন? আমার অপরাধ?

—বলছি।

হরিসাধনবাবু টিঃ টিং করে ঘণ্টা বাজালেন। দ্বারের পরদা ঠেলে একজন বেয়ারা এল। তাকে সুকুমারের জন্যে আর এক পেয়ালা চা আনবার হুকুম হল। বললেন, আমাদের কাগজ কি 'মোগল যুগের মুদ্রানীতি' ছাপবার একান্তই অযোগ্য?

অল্পদিন হল সুকুমারের ঐ নামের প্রবন্ধটি পত্রিকান্তরে বেরিয়েছে। সে কাগজটি 'সুদর্শনের' প্রতিযোগী। সম্ভবত সেই কারণেই হরিসাধনবাবুর হিংসার উদ্রেক হয়েছে।

সুকুমার লজ্জিত হয়ে বললে, না, না। ওঁরা আগেই লেখাটা চেয়েছিলেন। নইলে

—আর নইলে! যাকগে, আপনার পকেট থেকে উঁকি মারছে কি ওটা বের করুন দেখি।

সুকুমার অপাঙ্গে চেয়ে দেখলে, তার দরখাস্তের খামখানার একটা কোণ দেখা যাচ্ছে। হেসে বললে, ওটা লেখা নয়।

—তবে?

একটু দ্বিধাভরে সুকুমার বললে, একটা দরকারে আপনার কাছে এসেছি।

—কি বলুন তো?

সুকুমার খামখানা পকেট থেকে বার করলে। হরিসাধনবাবু সেদিকে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। সুকুমার খামখানা একবার নেড়ে চেড়ে থেমে থেমে বলতে লাগল:

—আপনার আজকের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখলাম·· একজন সাব্-এডিটার চাই···সেটা কোথায় যদি জানা যেত···

হরিসাধনবাবু বললেন, আপনি করবেন?

—করতাম। আমার খুব ইচ্ছা,

হরিসাধনবাবু কি যেন একটু চিন্তা করলেন। টেলিফোনটা বাজল। রিসিভারটা কানে নিয়ে ভদ্রলোক কার সঙ্গে কথা কইলেন। তার পর রিসিভারটা যথাস্থানে রেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, একটু বসুন—আমি আসছি।

সুকুমার চুপ করে রইল। বাঁ দিকের বেতের বাস্কেটে স্তূপীকৃত লেখা। কতজনের কতকালের লেখা ওর মধ্যে পচছে কে জানে! তার মধ্যে কোনো কোনো ভাগ্যবানের লেখা ছাপার অক্ষরে লোকসমাজে বার হবে। বাকি সব ওখান থেকে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে, এবং সেখান থেকে কোথায় যাবে কে জানে! হয়তো মুদির দোকানে, নয়তো ঘুরতে ঘুরতে আবার কাগজের কলে গিয়ে উপস্থিত হবে। আর নয়তো টুকরো টুকরো হয়ে রাস্তার ধুলোর সঙ্গে উড়বে। সেই সমস্ত অপরিচিত ভাগ্যহীন উৎসাহী লেখকদের জন্যে ওর মনে দয়ার সঞ্চার হল।

টেবিলের ডান দিকে অনেকগুলি সাময়িক পত্রিকা স্তরে স্তরে সাজান রয়েছে। তার কতকগুলি বোধ হয় সবে এসেছে, এখনও মোড়ক খোলা হয়নি। ওর মধ্যে কত নতুন নতুন খবর আছে, কত মূল্যবান প্রবন্ধ আছে কে জানে? সুকুমার একখানি খুলে নিঃশব্দে পড়তে বসল। বেয়ারা চা দিয়ে গেল।

একটু পরে হরিসাধনবাবু এলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর রূপ যেন বদলে গেছে। যে হরিসাধনবাবু দেখা হলেই সহাস্যে সুকুমারের সঙ্গে আলোচনা করতেন—এ যেন সে হরিসাধনবাবুই নন। যথেষ্ট গম্ভীর। মুখে বেশ একটা ঔদ্ধত্যের ছায়া নেমেছে।

ঠাণ্ডা চায়ে একটা চুমুক দিয়েই ভদ্রলোক পেয়ালাটাকে একটু ঠেলে দিলেন। সুকুমারের দিকে চেয়ে বললেন, আপনার মতো একজন লোকই চাইছিলাম। কিন্তু কি জানেন,

হরিসাধনবাবু চুপ করলেন। সুকুমার বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। গলাটা ঝেড়ে হরিসাধনবাবু বলতে লাগলেন, কথা হচ্ছে আমাদের এটা ঠিক

ব্যবসা নয়। ডিরেক্টাররা এই কাগজের লোকসানের অংশভাগী বটেন, কিন্তু লাভের নয়। তাঁরা এক পয়সা লাভের অংশ নেন না। আর দিনরাত্রি অবিশ্রান্ত খেটে যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানটিকে বড় করেছেন, তাঁরাও ঠিক চাকরি হিসেবে এখানে নেই। তাঁদের যোগ্য বেতন দেবার সামর্থ্যও এ কাগজের নেই। "সুদর্শন" সম্ভবত একমাত্র দৈনিক পত্র—দেশহিতৈষণা থেকে যার জন্ম এবং পুষ্টি। আমার বোধ হয় সেই কারণেই এর প্রসারও সবচেয়ে বেশি। কি বলেন?

হরিসাধনবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুকুমারের দিকে চাইলেন। সুকুমার কিছুই না বুঝে নিঃশব্দে সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়লে।

খুব মোলায়েমভাবে হেসে হরিসানসাবু বললেন, তবেই বুঝুন, এ প্রতিষ্ঠানের মূল সুর কোথায়।

সুকুমার আর একবার বোকার মত মাথা নাড়লে। স্রোত কোন্ দিকে বইছে সে কিছুই ঠিক করতে পারলে না। সে এসেছে যে কাগজের জন্যে সহ-সম্পাদক চাই তার নামটা জানতে এবং সম্ভব হলে হরিসাধনবাবুর কাছ থেকে একখানা সুপারিশ পত্রও নিতে। কিন্তু তার মধ্যে এসব কথা আসে কোথা থেকে?

সশব্দে টেবিলের উপর হাত দু'খানা নামিয়ে হরিসাধনবাবু সম্মুখের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি খবরের কাগজে চাকরি করতে চান, না সংবাদপত্র-সেবা করতে চান?

সুকুমার পার্থক্যটা বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইতে লাগল।

হরিসাধনবাবু কথাটা ভেঙে বুঝিয়ে বললেন, আপনি কি শুধুই জীবিকা অর্জনের জন্যে এ পথে আসতে চান, না মহত্তর কোন উদ্দেশ্য আছে?

আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন! একদিন হেডমাস্টারও এই প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু নিয়তি কি হাস্যকর উত্তরই পরিশেষে দিলে! সুকুমারের মনে সন্দেহ জেগেছে, লোকালয়ে মহত্তর উদ্দেশ্যের সত্যই কোন স্থান আছে কি না। মুখে মহত্তর উদ্দেশ্যের কথা বললেও আসলে সকলেই চায় পেশাদারকে, যে গাছেরও খেতে পারে তলারও কুড়োতে পারে, যে দুই দিকেরই তাল সামলাতে জানে।

সেই কথা স্মরণ হওয়ায় সুকুমারের হাসি এল।

বললে, প্রথম যখন মাস্টারিতে ঢুকি তখন হেডমাস্টারও ঠিক এই প্রশ্ন করেছিলেন। জানেন হরিসাধনবাবু, আমার স্কুলের কাজটি গেছে। কিছু একটা পাওয়া নিতান্তই দরকার হয়ে পড়েছে।

কথাটা বলেই সুকুমার বেশ খুশি হয়ে গেল। বেশ বাগিয়ে বলা হয়েছে। ওই ক'টা কথায় হরিসাধনবাবুর সমস্ত কথার উত্তর নিহিত আছে। তবে সব উত্তর তিনি ধরতে পারলেন কি না সন্দেহ।

একটু চিন্তিতভাবে বললেন, আচ্ছা, কি রকম হলে আপনার চলে বলুন তো?

—টাকা?

—হ্যাঁ।

সুকুমার হেসে বললে, তার কি শেষ আছে? যত বেশি দেবেন ততই ভালো চলবে। এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন বলুন তো? আপনাদের এখানে কিছু খালি আছে না কি?

হরিসাধনবাবু একটু মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, আমাদের এখানকার জন্যেই তো বিজ্ঞাপন দেওয়া। বেশ ভালো লিখতে পারেন এবং নির্ভরযোগ্য এমন একজন সহকারী আমার চাই।

এতক্ষণে সুকুমার যেন তল পেলে। "সুদর্শনের" সহকারী সম্পাদক? সে তো পরম ভাগ্যের কথা! খুশিতে তার মন আলো হয়ে উঠল। বললে, বেশ তো! এখানে যদি হয়,

—কিন্তু ওই যে বললাম। এ আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান। এখানে বেশি মাইনে তো পাবেন না। কিছু স্বার্থত্যাগ করতে না পারলে এখানে কাজ করার কোন মানেও হয় না সুকুমারবাবু।

শেষ কথাটা হরিসাধনবাবু বেশ জোরের সঙ্গে টেবিলে একটা ঘুঁসি মেরে বললেন। সঙ্গে সঙ্গে সুকুমারের নৌকার নোঙর গেল ছিঁড়ে। তার ব্যবসাদারী বুদ্ধির কাছিগুলো পটাপট গেল খুলে। ভাবের হাওয়া পালে লাগবামাত্র নৌকা

ছুটল তীরবেগে নিরুদ্দেশের পথে! নিজের উপর নিজেরই আর কোন শাসন রইল না।

আবেগের সঙ্গে বলে, উত্তম। আপনার কাগজে যদি চাকরি পাই, আপনি যা দেবেন তাতেই রাজি।

একটু দ্বিধাভাবে হরিসাধনবাবু বললেন, কিন্তু সে যে অত্যন্ত সামান্য।

—কি রকম সামান্য? আমিও অবশ্য অসামান্য কিছুর আশা করি না।—সুকুমার হা হা করে হেসে ফেললে।

হরিসাধনবাবু হেসে বললেন, মনে করুন পঞ্চাশ।

পঞ্চাশ? সুকুমারের ধারণা ছিল সম্পাদকীয় বিভাগের লোকদের মাইনে আরও বেশি। অন্তত একশো। যারা দেশের জনমত গঠন করছে, যাদের পড়তে হয় প্রচুর, জানতে হয় প্রচুর এবং লিখতে হয় প্রচুর, তাদের মাইনে এক-শোর কম হওয়া কিছুতে উচিত নয়। কেরানীগিরি যে কোন লোক করতে পারে, এমন কি মাস্টারিও। কিন্তু লেখা একটা বিশেষ ক্ষমতা। ভালো জানাশোনা থাকলেও সকলে ভালো লিখতে পারে না। অন্তত সেই কারণেও এঁদের মাইনে বেশি হওয়া উচিত। সে জন্যে হঠাৎ একটু দমে গেল। তবু তার পক্ষে পঞ্চাশই যথেষ্ট। মাস্টারিতে যে আরও কম দেয়।

বললে বেশ। আমি রাজি।

—তাহলে আজ থেকে কাজ করবেন? না কাল থেকে?

—যখন থেকে বলবেন।

—তবে কাল থেকেই কাজ করবেন বরং। আজকে চলুন, সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই গে। কি ভাবে কাজ করে সে সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান হবে। আপনার বোধ হয় বিকেলের দিকে ডিউটি হলেই সুবিধে কি বলেন?

—তাই আসব। কটায় আসব?

—এই তিনটেয়? তিনটে থেকে দশটা।

সুকুমার মনে-মনে হিসাব করলে, তাহলে রাত্রের ট্যুইশানটা ছাড়তে হবে।

সকালে একটা আছে। আর পারবে না। তা ছাড়া "সুদর্শনের" সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করতে গেলে তাকে পড়াশুনোর জন্যেও খানিকটা সময় রাখতেই হবে। সহজ কাজ তো নয়! এর জন্যে রাত্রের ট্যুইশানটার মমতা করা কাজের কথা নয়। সুকুমার এই ডিউটিতে রাজি হল।

হরিসাধনবাবু বললেন, তাহলে চলুন ও-ঘরে। ওঁদের সঙ্গে পরিচয়টা হয়ে থাক।

দুজনে সহ-সম্পাদকদের ঘরে গেলেন।

৯

সাব-এডিটারদের ঘরটা একটা বড় হল ঘর। প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় গুটি দুই বড় টেবিল গায়ে-গায়ে লাগান। তার চারদিকে আট-দশখানা চেয়ার। সকাল থেকে সকাল পর্যন্ত এখানে কাজ চলে। তবে বিকেলের দিকেই কাজ বেশি। এই দলে লোকও বেশি।

সুকুমার যতখানি মস্তিষ্কচালনার আশঙ্কা করছিল তার কিছুই নয়। কেবল টেলিগ্রাম তর্জমা। সাব-এডিটারের তাই কাজ। অত্যন্ত একঘেয়ে। সে প্রথম যতখানি উৎসাহ নিয়ে কাজে নেমেছিল, অল্পদিনের মধ্যেই তার অনেকখানি মিইয়ে গেল। তবু মাস্টারির চেয়ে অনেক ভালো। অন্তত তার কাছে স্কুলের বদ্ধ হাওয়া অসহ্য হয়ে উঠেছিল। প্রবীণ ঝুনো শিক্ষকদের দেখলেই তার হাড়ের ভিতর পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে যেত। এখানে তা নয়। তার সহকর্মীরা প্রায় সকলেই তারই সমবয়সী। হাসিতে গল্পে কাজে মিশে একাকার হয়ে যায়। বিশেষ করে সরিৎ বাবুর মত রসিক লোক সুকুমার তার জীবনে দেখেনি। ওরা তার নাম রেখেছে কথাসরিৎসাগর। লোকটির ভিতর-বাহির নেই। আর হাসি ছাড়া কথা নেই। অন্য কথাকে সে বলে বাজে কথা। সরিৎবাবুর কল্যাণে দশটার আগে আর কারও খেয়ালই হয় না যে দশটা বেজেছে।

আর আছে জ্যোতির্ময়বাবু! লিকলিকে লম্বা, হাড় বের করা। জ্যোতির্ময়ের কতকগুলো বাঁধা রসিকতা আছে। সেগুলো নিতান্ত পুরোনো হয়ে গেছে। কিন্তু এমন একটা সময়ে এমনি জুৎসই করে বলে যে, এখনও তার ধার নষ্ট হয়নি। নির্মলকে ওরা বলে জামাইবাবু। সুন্দর চেহারা, সব সময় বেশ চালের উপর জামাইবাবুটি সেজে থাকে। কালীমোহন থস্‌থসে বেঁটে। মাথার চুল সমস্ত সময় উদ্ধত বিদ্রোহে খাড়া হয়ে আছে। আর পরনের কাপড়, যেমন করেই পরুক, কিছুতে হাঁটুর নিচে নামে না। কোঁচা দিতে তার কাছা খুলে যায়, কাছা দিতে কোঁচা। তবু উৎসাহের শেষ নেই। কোথায় খেলার মাঠ, কোথায় সাহিত্য-বাসর আর কোথায় রাজনীতির আসর—সর্বত্র সে আছে। আর যে কথা কেউ জানেনা, তাই নিয়ে এমন মাতামাতি করে যে, অপেক্ষাকৃত কম-উৎসাহী লোক বিব্রত হয়ে ওঠে। কালীমোহন যেমন অসাধারণ বেঁটে, নগেন তেমনি অসাধারণ লম্বা। চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে বেরিয়ে আছে। রংটি অত্যন্ত ময়লা বলে বেশের পারিপাট্য বেশি। মাথার সযত্ন-বিন্যস্ত চুলের একটি গাছি স্থানভ্রষ্ট হয় না। কাপড়ে জামায় কোথাও একটি ফোঁটা ময়লা নেই। এমন কি পাঞ্জাবীর হাতায় ইস্ত্রির ভাঁজটি পর্যন্ত অটুট। জুতোজোড়া ঝক্‌ঝক্ করছে। অতি শান্ত মিহি স্বরে দুটি একটি কথা বলে। আর কোনো বড় রকম রসিকতা হলে বড় জোর ঠোঁটটি ফাঁক করে আল্‌তো একটুখানি হাসে। সরিৎ ওর নাম রেখেছে বেতসবাবু।

এ ছাড়া আরও অনেক সাব-এডিটার আছে। তাদের কয়েকজন সকালে কাজ করে, কয়েকজন রাত্রে। এদের সঙ্গে সুকুমারের কচিৎ কখনও দেখা হয়। তাহলেও বেশ আলাপ হয়ে গিয়েছে। সকলেই এক বয়সী। সকলেই সমান উৎসাহী, ভাবনা চিন্তার ধার ধারে না এবং কথায় কথায় রসিকতা করার চেয়ে যে মহত্তর কাজ মানুষের আছে, তা স্বীকার করে না। সেই কারণে নিজেদের মধ্যে সামাজিক ভদ্রতার নিয়ম-কানুন আদৌ মেনে চলে না। জিহ্বারও বল্গা নেই। এরা

নিজেদের তরুণের অগ্রণী বলে মনে করে এবং সেই হিসাবে previleged class অর্থাৎ যা খুশি বলবার অধিকার আছে। সুতরাং নিজেদের মধ্যে ভাব জমায় যত শীঘ্র, ঝগড়াও করে তত শীঘ্র—আবার ফের ভাবও করে তেমনি শীঘ্র। এরা বড় বড় কথার আলোচনা করে, বড় বড় কাজের বিশ্লেষণ করে এবং বড় বড় চিন্তার গবেষণা করে ; আর যে যাকে সুবিধা পায় সে তাকে আক্রমণ করে হাসির হর্‌রা তোলে। তারপর তিন কলম সংবাদ তর্জমা করে আর কয়েক বাটি চা-পান করে বাড়ি যায়। এদের সঙ্গ, এদের সান্নিধ্য এবং এদের সুনিপুণ বাক্‌যুদ্ধ সুকুমারের ভালো লেগেছে। এমন ভালো যে দুপুরে একলা ঘরে শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না, কখন তিনটে বাজবে তারই প্রতীক্ষা করে। অসুস্থ অবস্থাতেও একবার ঠুক ঠুক করে আফিস না গেলে মন ফাঁকা ঠেকে। শুধু তার নয়, সকলেরই। ছুটির দিনে এমন বিরক্ত লাগে যে, সে আর বলবার নয়। মূল কথা, এমন জমাটি আড্ডার সন্ধান ইতিপূর্বে সুকুমার কোথাও পায়নি।

কিন্তু কাঁটা ছাড়া গোলাপ হয় না। এ আসরেও শুধু মধু নেই, সঙ্গে হুলও আছে। সে হুল যে কোথায়, কেউ শপথ করে বলতে পারে না। মাত্র অনুমানে সন্দেহ করে। সন্দেহ করে ব্রজরাজবাবুকে। ব্রজরাজবাবু বয়সে এদের চেয়ে অনেক বড়। মাথার বিরল কেশে এবং মুখের গোঁফে পাক ধরেছে। বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছে। সংবাদপত্র মহলে পাকা সাব-এডিটার বলে তাঁর খ্যাতি আছে। কারণ, ভদ্রলোক বিশ বৎসরেও উর্ধ্বকাল ধরে এই কাজই করে যাচ্ছেন। এর বেশি আর কখনও ওঠেন নি। 'সুদর্শনের' তিনি নৈশ-সম্পাদক। তাঁর মত ধীরবুদ্ধি লোক ছাড়া অন্য কারও উপর রাত্রের ভার দিতে হরিসাধনবাবু ভরসা পান না। আর তো সব ছোকরা। কাগজ সম্পাদনার কিই বা বোঝে তারা ? কেবল হাসতে আর ইয়ার্কি দিতে, আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা খেতে ওস্তাদ।

ব্রজরাজবাবু রাত্রি ঠিক দশটায় আসেন। পাঁচ মিনিট আগে আসেন তো পরে

নয়। এসেই একবার নিজের হাতঘড়িটার দিকে, একবার দেওয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে চেয়ে খাতায় নামটা সই করেন। তার পরে কাজে বসেন। কোন দিকে চাওয়া নয়—একবারে সংবাদ তর্জমায়। ওঁকে দেখলেই সুকুমারের মুখের হাসি যায় মিলিয়ে। ঘরের হাওয়া ভারি হয়ে ওঠে। সকলের মন পালাই পালাই করে। হাতের বাকি কাজটা সেরেই একে একে সরে পড়ে। ভদ্রলোক যে কারও সঙ্গে কলহ করেন, তা নয়। কলহও করেন না, ভাবও করেন না। বিনা প্রয়োজনে কথাই বড় একটা বলেন না। হয়তো সেটা বয়োধর্মে এবং সেই কারণে দোষেরও কিছু নয়। কিন্তু তাঁর ঝুলে পড়া ঠোঁটে, ছোট ছোট চোখে এবং বক্র নাসিকায় এমন একটা কিছু আছে, যাতে ছোকরার দল তাঁর সঙ্গে ভাব জমাতে সাহস পায় না। তাঁকে এড়িয়ে চলে। বিশেষ সম্প্রতি সাব-এডিটারদের সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে নানারকম অভিযোগ গেছে। সেই সমস্ত গুরুতর অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্যে সম্পাদকের কাছে কর্তৃপক্ষের জরুরি চিঠি এসেছে। এইতেই গোল পাকিয়েছে আরও বেশি।

হরিসাধনবাবু অত্যন্ত প্রাণখোলা রসিক লোক। কারও কোন দোষ ত্রুটি দেখলে যা বলবার তখনই তার সামনেই বলে দেন। তারপরে সে কথা আর তাঁর নিজেরও মনে থাকে না, যাকে বলেন তারও মনে থাকে না। নিউজ এডিটার কমলবাবু নিরীহ লোক। কারও সাতেও থাকেন না, পাঁচেও থাকেন না। আপনার মনে কাজ করে যান এবং সকলের দুনো কাজ করে যান। বস্তুতপক্ষে তিনি যে নিজে কি পরিমাণ খাটেন তা একদিন তিনি অনুপস্থিত থাকলেই সকলে হাড়ে হাড়ে টের পায়। সেদিন আর কারো হাসি-তামাসা ইয়ার্কি-গজল্লার অবসর মেলে না। সম্পাদক হরিসাধনবাবু কর্তৃপক্ষের চিঠি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতেই তিনি বিব্রত হয়ে উঠলেন। তাঁর অনেক কাজ। নিশ্বাস নেওয়ার অবসর পান না। কি বিপদ দেখ! এখন তিনি কাজ করবেন, না সব ফেলে রেখে এই সব ব্যাপারের তদন্ত করবেন? তিনি লিখে

দিলেন, ভবিষ্যতে এ রকম যাতে না হয় সে বিষয়ে তিনি অবহিত থাকবেন। দিয়ে আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করলেন।

কিন্তু তিনি যত চুপি চুপি সারলেন মনে করলেন, ব্যাপারটা তত চুপি চুপি মরল না। খবরটা সাব-এডিটারদের কানে পৌঁছে যথেষ্ট উষ্মার সৃষ্টি করলে। নানা প্রকার অনুমানের বলে তারা স্থির করলে, এ কাজ ব্রজরাজ বাবু ছাড়া আর কারও নয়। এত মাথাব্যথা কারও নেই, এ প্রবৃত্তিও আর কারও নেই। সকলে যে কাঁটায় কাঁটায় নির্দিষ্ট সময়ে আসে, কিম্বা নির্দিষ্ট সময়ে যায়—তা নয়। হয়তো কেউ দেরিতে এল, আবার হয়তো কেউ একটু সকালেই গেল। কিন্তু সে খবর হরিসাধনবাবুও রাখেন না, কমলবাবুও রাখেন না। পূর্বোক্ত ব্যক্তি তাঁর সম্পাদকীয় রচনা আর সভা-সমিতি, দেশোদ্ধার নিয়েই আছেন। আর শেষোক্ত ব্যক্তি যখন কাজে বসেন তখন পাশ দিয়ে হাতি গেলেও টের পান না। ব্রজরাজবাবুও অবশ্য রাত্রে আসেন। দিনের বেলায় কে কখন আসেন না আসেন তা জানা তাঁর পক্ষেও সম্ভব নয়। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে তিনি ছাড়া আর এ রকম লাগানি-ভাঙানি করবার লোক কই? সুতরাং তাঁর উপরেই পড়ল সকলেরই রোষ।

তা সে যাই হোক, ব্যাপারটা চুকে গেছে ভেবে রোষটা আর ততদূর বাড়ল না। হাসি গল্প অবশ্য বন্ধ হল না, কিন্তু সকলেই এখন থেকে যথাসময়ে আসতে যেতে লাগল।

তথাপি দেবলোক থেকে বজ্রপাত হল।

সাব-এডিটাররা এক পেয়ালা করে চা সামনে নিয়ে হিটলার এবং মুসোলিনীর রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তুমুল গবেষণায় মেতে গিয়েছিল। সরিৎ এই কথা প্রমাণ করার চেষ্টা করছিল যে, রাষ্ট্রে অল্প সময়ের মধ্যে অধিক কাজ করার প্রয়োজন থাকলে ডিক্টেটারশিপ চাই। দেশের কল্যাণের জন্যে একটা বিল তৈরি করতে হবে। ডাক কাউন্সিল, দাও বিলের নোটিশ, জনমতের জন্যে কর সে বিল প্রচার, পনেরো দিন ধরে চলুক বক্তৃতা, দাও ভোট—তারপরে বিল হয়তো পাশ হল,

নয়তো হল না, আর নয়তো রইল কিছু কালের জন্যে ধামাচাপা। এমন করে কাজ চলে ?

চায়ের প্রসাদে সরিতের কণ্ঠ খুলে গেছে। তাকে এরা কেউ এঁটে উঠতে পারছিল না।

সুকুমার মিন মিন করে বললে, তা সত্যি। তবু কোটি লোকের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভার একজনের ওপর ছেড়ে দেওয়া শুধু যে বিপজ্জনক তাই নয়, ওতে নিজের আত্মার অপমান হয়।

সুকুমার একটা বড় কথা বললে বটে, কিন্তু মিন মিন করে। মোট কথা জার্মানী কিম্বা ইটালীর রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নিয়ে তার আগ্রহ নেই। সে শুধু নিছক নীতির খাতিরে তর্ক করছিল। তাই তার কথায় জোর হল না। সরিতের একটা ধমকেই তলিয়ে গেল।

বললে, ওঃ! আত্মার অপমান! ভারি আমার আত্মা রে! বাপ মাকে মেনে চলি, তাতে আত্মার অপমান হয় না ? মাস্টারকে মানি, তাতে আত্মার অপমান হয় না ? আত্মার অপমান!

সুকুমার হেসে বললে, তাঁদের আমরা সম্মানে, জ্ঞানে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে বড় বলে মেনে নিয়েছি। কিন্তু এই হিটলার, মুসোলিনী কে ? ওদের জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড় কতদূর ?

—বটে! ওরা বুঝি সহজ লোক! অত বড় বড় স্বাধীন জাতকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছে তা বুঝি গেরাহ্যি হচ্ছে না ? শুনছ হে বেতস বাবু!

নগেন গোলমালে থাকে না। সে আল্‌তো একটু হেসে একবার মাথা নাড়লে নিতান্তই অর্থশূন্যভাবে।

সে মাথানাড়া মনঃপূত না হওয়ায় সরিৎ জ্যোতির্ময়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বললে, জ্যোতি বাবু, শোন হে সুকুমারের কথা।

জ্যোতির্ময় সোজা হয়ে বসে মোটা গলায় হাঁকলে, শূলটা ? আমার শূলটা কই হে ?

সুকুমার চোখ বিস্ফারিত করে বললে, আমি কি করলাম ?

জ্যোতির্ময় গম্ভীরভাবে বললে, তোমার জন্যে নয় হে, এই টেলিগ্রামগুলোর জন্যে।

জ্যোতির্ময় টেলিগ্রাম গাঁথার তারের ফাইলকে বলে শূলে, আকৃতির সৌসাদৃশ্যের জন্যে। এটা তার মামুলি রসিকতা। কিন্তু বলে লাগসই। লোকে হেসে ফেলে !

এমন সময় বেয়ারা একখানা কাগজ ওদের সামনে ফেলে দিয়ে বললে, এইটেয় সই করে দিন।

—কি হে ওটা ?

সুকুমার নিঃশব্দে পড়তে লাগল, জবাব দিলে না। পড়া শেষ হলে সরিতের হাতে দিলে। সরিৎ জোরে জোরে পড়তে লাগল। ব্যাপারটা এই প্রকার : কর্তৃপক্ষের হুকুম মত নিউজ-এডিটার নোটিশ দিচ্ছেন যে, অতঃপর প্রত্যেককে নির্দিষ্ট সময়ে এসে নিউজ-এডিটারের ঘরে গিয়ে হাজিরা খাতায় নাম সই করে আসতে হবে। যাবার সময়ও সেই ব্যবস্থা। তিন দিন দেরি হলে এখন থেকে এক দিনের মাইনে কাটা যাবে। আরও জানান হয়েছে যে, প্রত্যেককে অন্তত তিন কলম সংবাদ তর্জমা করতে হবে। কম হলে তার মাইনে কাটা যাবে।

এই অপ্রত্যাশিত আদেশে সকলে কিছুক্ষণের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল।

চায়ের পেয়ালাটা অবজ্ঞাভরে দূরে ঠেলে দিয়ে সরিৎ বিরক্তিভরে বলে উঠল, ধ্যেৎ তেরি চাকরি !

মুখখানি ছুঁচ করে সুকুমার বললে, কেন ? হিটলার তো

সরিৎ এক ধমক দিয়ে বললে, থামহে ছোকরা ! হিটলার ! হিটলার যেন পথে-পথে ছড়ানো রয়েছে কি না। মাথা চাড়া দিলেই হল ! তাহলে আর ভাবনা ছিল কি !

সুকুমার হেসে বললে, ভাবনা নেই তো ! তারা বড় হিটলার, এরা ক্ষুদে হিটলার। পকেট গীতা কি গীতা নয় ?

সরিৎ ঝাঁঝের সঙ্গে বললে, রসিকতা রাখ। আমি ভাবছি, ক্রমে ক্রমে ব্যাপার কি দাঁড়াচ্ছে?

—সঙীন!—সুকুমার হেসে বললে—তোমার শূল কোথা, শূলপাণি? ধর শূল।

জ্যোতির্ময় গম্ভীরভাবে বললে, আস্তে। দেওয়ালের কান আছে। দেখি হে, সইটা করে দিই।

সকলে চটপট সই করে নোটিশটা বেয়ারার হাতে ফিরিয়ে দিলে। বেয়ারা চলে গেল।

অনেকক্ষণ পরে সরিৎ বললে, সে সব দিন মনে আছে হে বেতসবাবু? যখন নিয়মিত মাইনে পেতাম না? আজ পাঁচটাকা, কাল দু'টাকা করে এক এক জনের তিন চার মাসের মাইনে বাকি?

নগেন চাপা গলায় বললে, আ···স্তে।

ক্রোধে সরিতের মুখ তখনও লাল হয়ে আছে। একটু শুকনো হেসে বললে, তোমার মেসের দু'মাসের টাকা বাকি। অফিসে মাইনে পাওয়া যায় না, বাজারে ধার পাওয়া যায় না, ম্যানেজার তোমার বাক্স-বিছানা আটকে রেখে তাড়িয়ে দিতে চায়—মনে পড়ে?

সুকুমার বিস্মিতভাবে বসলে, ও সব আবার কি কথা!

সরিৎ হেসে বললে, ও তুমি বুঝবে না। একটা পুরোনো কথা রোমন্থন করা গেল।

জ্যোতির্ময় নিবিষ্ট মনে তর্জমা করতে করতে বললে, আঃ, সরিৎ! চেপে যাও না।

—আমি তো চেপে যেতেই চাই! কিন্তু ওরা যে কেবলই মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ কলমের খস খস শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। সুকুমারও নিঃশব্দে লিখে যেতে লাগল। ওদের মুখ দেখে তার মনের মধ্যে কেবল একটা কথা কাঁটার মত খচ খচ করতে লাগল। আজকে 'সুদর্শনের' যে জমজমাট সে দেখছে, এদিন চিরকাল ছিল না। এমন একটা দিন ছিল যেদিন কর্মচারীরা

নিয়মিত মাহিনাও পেত না। বহু দুঃখ সহ্য করেও তারা যে সেই অদিনে কাগজখানি ছাড়েনি, আজ তাই এই সুদিনের উদয় হয়েছে। কিন্তু সেই পুরাতন কথা স্মরণ করে এদের মনে আজ প্রশ্ন জেগেছে, অত যে কষ্ট সহ্য করলে সে কার জন্যে? সুকুমার কিন্তু এ সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করলে না। নিজে সে যথেষ্ট দুঃখ পেয়েছে। ফলে এ জ্ঞান তার হয়েছে যে, কঠোরতম মানুষেরও একটা দুর্বল স্থান আছে। সেখানে আঘাত না দেওয়াই সমীচীন! সেও নিঃশব্দে কাজ করে যেতে লাগল।

আধ ঘণ্টা ধরে অনেকগুলো কলম অনর্গল চলতে লাগল। কেউ কাউকে কোনো কথা বললে না। জ্যোতির্ময় একটিবারও শূল চাইলে না। সরিতের হিটলার-মুসোলিনী কোথায় গেল তলিয়ে। তার মুখের চিরাভ্যস্ত হাসি গেল মিলিয়ে। নগেনের মাথা টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়েছে। সুকুমার মাঝে মাঝে ওদের মুখের দিকে আড়ে আড়ে চায়, কিন্তু কিছু বলে না। যারা সব সময় হাসে তারা যখন হঠাৎ গম্ভীর হয়, তখন বড় ভয়ঙ্কর রকমের গম্ভীর হয়।

আধ ঘণ্টা এমনি ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতার মধ্যে কেটে চলল। প্রিণ্টার সদানন্দ এসে 'কপি' নিয়ে গেল। সদানন্দকে দেখলেই সরিতের হাসি পায়। সদানন্দর মুহূর্তে মুহূর্তে 'কপি' চাই। এত 'কপির তাগিদ আর কোনো প্রিণ্টারের দেখা যায় না। সরিতের দৃঢ় বিশ্বাস, 'কপি' ও খায়। নইলে এত 'কপি' নিয়ে মানুষ আর কি করতে পারে? কিন্তু সে কথা সদানন্দও কিছুতে স্বীকার করবে না, সরিৎও নাছোড়বান্দা। সদানন্দকে দেখলেই এই কথা স্বীকার করবার জন্যে সরিৎ সকাতরে অনুরোধ করবেই। কিন্তু এখন আর সে সদানন্দর দিকে মুখ তুলে চাইলেই না। সদানন্দ প্রতিদিনের অভ্যস্ত প্রশ্নের প্রতীক্ষায় একটুক্ষণ দাঁড়াল বটে, কিন্তু উৎসাহের অভাবে ক্ষুন্নভাবেই ফিরে গেল।

এমন সময় ঝড়ের মত বেগে ঘরে ঢুকল কালীমোহন। তার কাছার একটি প্রান্ত কটিতে সংলগ্ন, অপর প্রান্ত ধুলায় লোটাচ্ছে। স্যাণ্ডেল-পরিহিত চরণযুগল

ধুলায় সমাচ্ছন্ন। আর মাথার চুলের একটি গাছিও শায়িত নেই, সব খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ক্রিকেট ম্যাচের রিপোর্ট নিতে গিয়েছিল সে।

এসেই চিৎকার করে বললে, আজকে অস্ট্রেলিয়া

সরিৎ গম্ভীরভাবে বললে, চুপ করে বসে রিপোর্ট লেখ।

ওদের গম্ভীর মুখের দিকে চেয়ে আর সরিতের কথা শুনে কালীমোহন একেবারে ভড়্‌কে গেল। তার গলার স্বর তৎক্ষণাৎ নেমে গেল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কেন? কি হয়েছে কি?

—ভীষণ ব্যাপার।

—কি রকম?

—বিরক্ত কোর না। চুপ করে লেখ।

কালীমোহন বিব্রতভাবে সকলের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে চেয়ে বললে, কি ব্যাপার সুকুমার? কেউ মারা গেল না কি?

সুকুমার উত্তর দেবার পূর্বেই জ্যোতির্ময় বললে, হুঁ।

—এই সেরেছে! এখনি আবার বাণী নিতে ছুটতে হবে। কে আবার মারা গেল?

কালীমোহন বাণী নেবার জন্য তৈরি হয়ে খাতা পেন্সিল পকেটে পুরল।

সুকুমার তার ব্যস্ততা দেখে হেসে ফেলে বললে, আর কে মারা যাবে, আমরাই গেলাম।

কালীমোহন উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার বসল। আশ্বস্ত হয়ে বললে, তাই বল। আমি ভাবলাম বুঝি সত্যিসত্যিই কেউ···কিন্তু তোমরা সবাই চুপচাপ। ব্যাপার কি?

সুকুমার বললে, ওই যে বললাম।

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু মারা যাব কেন?

সরিৎ আর থাকতে পারলে না। হাতের কলমটা উঁচিয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললে, মারা যাব নয়, মারা গেছি। হুকুম এসেছে এখন থেকে রীতিমত মাপ হবে।

—কিসের ?

—কিসের তা কমলবাবুকে জিগ্যেস করে এস।

কালীমোহন বুঝলে, এ রহস্তের মর্মোদ্‌ঘাটন করা তার সাধ্য নয়। হতাশভাবে সে ঘণ্টাটা বাজালে। বেচারা সেই দুপুরে বেরিয়েছিল, এই ফিরলে। ক্লান্তিতে গা ভেঙে পড়ছিল। বেয়ারা পাশে এসে দাঁড়াল। কিন্তু কালীমোহনের ওই এক দোষ। ঘণ্টা বাজাচ্ছে তো বাজাচ্ছেই, বেয়ারা যে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। বেয়ারা অবশেষে সামনে এসে দাঁড়াতে যেন চমক ভেঙে বললে, এই ! ইয়ে—চা নিয়ে এস।

বেয়ারা চলে যেতেই সরিৎ আবার মুখ ভেঙচে বললে, চা পরে খাবে। আগে কমলবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে এস।

—কেন ?

—যাওই না। ঠেলাটা নিয়ে এস।

কালীমোহন হাসতে হাসতে উঠে গেল, কিন্তু ফিরে এল মুখ কালিবর্ণ করে। এতক্ষণে সে ব্যাপারটা টের পেলে।

স্নকুমার জিজ্ঞাসা করলে, কেমন ?

—খুব ভালো।

কালীমোহন আর বাক্যব্যয় না করে লিখতে বসে গেল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে লেখার পর হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলে উঠল, এ নিশ্চয় ঐ ঘুঘুটার কাজ !

জ্যোতির্ময় ধমক দিলে, চুপ !

কালীমোহন আবার লিখে যেতে লাগল। কিন্তু বেশিক্ষণ সে চুপ করে থাকতে পারে না। তাতে এ ঘরের আবহাওয়াই অন্যরকমের হয়ে গেছে। কালীমোহন ভুলে ভুলে হঠাৎ বললে, ওঃ ! স্নরথ পাল···

—আবার !

—আচ্ছা, আচ্ছা।

কালীমোহন আবার নিঃশব্দে লিখতে লাগল। দুর্বার সিংহের বোলিং আর

রহিম খাঁর ব্যাটিং, আর কার ক'টা রান হল। কিন্তু আজকের রিপোর্ট অন্য-দিনের মত জমল না।

ক'দিন এমনি চলল।

সকলে নিয়মিত আসে, নিয়মিত যায়। হাসি-তামাসা গল্প-গুজব বন্ধ। ঘরের চিরদিনের লঘু হাওয়া হঠাৎ ভারি হয়ে উঠল। কমলবাবু অবশ্য হাজিরা খাতাখানা আর ওদের ঘর থেকে নিয়ে গেলেন না। ওরা তেমনি তার বদলে আসামাত্র কমলবাবুর সঙ্গে গল্প করার অছিলায় একবার দেখা দিয়ে জানিয়ে আসত—তারা ঠিক সময়ে কাজে এসেছে। বেচারা কমলবাবু লজ্জিত হতেন, কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারতেন না। এ প্রসঙ্গ তোলাই লজ্জাকর মনে করতেন। এমনি করে দিন কেটে যেতে লাগল। খবরের কাগজের আফিস একটা মস্ত বড় আড্ডা। খ্যাতিপ্রয়াসী বহু লোকই এখানে নিয়মিত আড্ডা দিতে আসেন। যাঁরা খুব বড়, তাঁরা সটান এডিটারের ঘরে গিয়ে বসেন। যাঁরা মাঝারি, তাঁরা নিউজ-এডিটারের ঘরে। আর যাঁরা উদীয়মান, তাঁরা সাব-এডিটারদের ঘরে। এই সব উদায়মানের দল সাব-এডিটারদের মুখাকৃতি দেখে প্রমাদ গণলেন। আর তেমন আড্ডা জমে না, মুহুমুহু চা-ও আসে না। ব্যাপার দেখে তাঁরা আসা-যাওয়া কম করলেন।

মুস্কিল সাব-এডিটারদেরও কম হয়নি। তারা চিরকাল চুটিয়ে আড্ডা দিয়ে এসেছে। এই স্তব্ধতা তাদের কাছে কারাযন্ত্রণারও অধিক হয়েছে। কিন্তু করবে কি ? বেঁধে মারে, সয় ভালো। এতদিন নিয়মিত মাইনে পেত না, সে একরকম ছিল। তখন এটা চাকরি বলেই মনে হত না। এখন নিয়মিত মাইনে পাওয়ায় কেরানীজীবনের সূত্রপাত হয়েছে। কার সাধ্য এ চাকরি ছাড়ে! নিয়মিত মাইনের মমতা তো সোজা নয়। তার বন্ধনও বড় কঠিন ও দুশ্ছেদ্য।

কিন্তু সকলের চেয়ে বেশি মুস্কিল হয়েছে কালীমোহনের। সবাই যেমন

অনর্গল গল্প করতে পারে, তেমনি চুপ করেও থাকতে পারে। পারে না কালীমোহন। এত কাণ্ডের পরেও সে ভুলে ভুলে পরমোৎসাহে চিৎকার করে ওঠে। তখনি অপ্রস্তুত হয়ে চুপ করে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভুলে যায়। তার স্বভাবই এমনি ভোলা।

আরও একটা জিনিস ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। আড়ষ্ট আবহাওয়ায় থেকে ওদের স্টাইলও কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেছে। অনেক ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় তর্জমাগুলো ইংরিজির এমন কোল ঘেঁসে যায় যে, তার অর্থ ই হয় না। কিন্তু তার জন্যে ওরা চিন্তিত হয় না। একটি আঘাতে কাগজের থেকে ওদের মর্মগত যোগ গেছে ছিঁড়ে। এখন কোনো রকমে তিন কলম করে কপি তুলতে পারলেই ওরা দায় থেকে খালাস। লক্ষ্য রাখে শুধু সেই দিকে। আরও একটা সুবিধা বাঙলা দেশের পাঠকদের নিয়ে। চাঁদপারা পাঠক। ছাই পাঁশ যাই দেবে, চাঁদের মত মুখখানি করে তাই গলাধঃকরণ করবে। বলবে না এটায় নুন কম হয়েছে, ওটায় ঝাল বেশি, সেটা পান্‌সে। এ সব বাজে জিনিস নিয়ে খুঁৎ খুঁৎ করার বালাই তাদের নেই। তাদের দৃষ্টি আসল বস্তুর দিকে। সেটা হল ওজন। অর্থাৎ হিসাব করে দেখবে, দু'পয়সা দিয়ে যে কিনলাম, তাতে কাগজ পেলাম কতগুলো। সে কাগজ 'শিশি-বোতল-বিক্রি'দের কাছে বিক্রি করলে কত উশুল হতে পারে। যারা আরও বিজ্ঞ তারা হিসাব করবে, একদিনের কাগজে কত ঠোঙা হতে পারে! বাঙলা দেশে এই হিসাবে কাগজের বড়-ছোট ভালো-মন্দ। আর লেখা? লেখার অর্থ হোক বা না হোক, তার মধ্যে যুক্তি থাক বা না থাক, কিছু যায় আসে না। কেবল ভাষাটা গুরুগম্ভীর হওয়া প্রয়োজন। আর গবর্ণমেণ্টকে স্থানে অস্থানে, সময়ে অসময়ে খানিকটা চুটিয়ে গালাগালি দিতে হবে। সেই গুরুগম্ভীর ভাষায়—পড়লেই মনে হবে যেন পাখোয়াজ বাজছে, বুক নেচে উঠছে, চোখে জল আসছে। বাস। আর কিছু চাই না। এইতেই পাঠকদের মৌতাত জমে উঠবে। আর সেই জন্মেই তো খবরের কাগজ কেনা।

হরিসাধনবাবু হলেন এ সম্বন্ধে জ্ঞানপাপী। বাঙলা দেশে তাঁর লেখার বহু অনুরাগী পাঠক আছে। তথাপি নিজের লেখা সম্বন্ধে তিনি অন্ধ নন। সব জেনেও তাঁর এই trade secret-টি সযত্নে পালন করে আসছেন, ছাড়েন নি।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি সাব-এডিটারদের ঘরে এসে দেখলেন, সব নিঃশব্দে মাথা নিচু করে লিখে যাচ্ছে। হেসে বললেন, ওঃ! এ যে বড্ড ভালো ছেলে হয়ে গেছেন দেখছি!

সবাই হেসে মুখ তুললেন।

সরিৎ বললে, না তো কি করি বলুন। চাকরি তো আর খোয়াতে পারি না।

—তা বটে। জ্যোতির্ময়বাবু, কি লিখছেন অত নিবিষ্টমনে?

—এডিটোরিয়াল।

হরিসাধনবাবু বিস্মিতভাবে হেসে বললেন, সে আবার কি?

তাঁর বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক নয়। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখার দায়িত্ব তাঁর এবং তাঁর আর দু'জন সহকারীর,—সাব-এডিটারের নয়। জ্যোতির্ময়কে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে কে বললে!

হরিসাধনবাবু ঝুঁকে পড়ে বললেন, কি নিয়ে লিখছেন? এ কি! এতো দু'কলম হেডিং!

জ্যোতির্ময় গম্ভীরভাবে বললে, হুঁ।

—তবে যে বললেন,

সরিৎ হেসে বললে, ওকেই ও এডিটোরিয়াল বলে। বলে, আমাদের ওই এডিটোরিয়াল।

হরিসাধনবাবু হেসে বললেন, তা মন্দ নয়। কিন্তু অত ক্ষোভ কেন? বাস্তবিক এক একদিন করে আপনারাও তো এডিটোরিয়াল লিখলেই পারেন।

জ্যোতির্ময় হেসে বললে, আর খবর তর্জমা?

চিন্তিতভাবে হরিসাধন বললেন, সে একটা কথা। তা দিনে একজন করে তো? খুব spare করা যায়।

সরিৎ বললে, কিচ্ছু করতে হবে না। আমাদেব কাজ শেষ হয়ে গেছে। টেলিগ্রাম তর্জমার চেয়ে স্টাইল নষ্ট করার মহৌষধ আর নেই।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, মিটিং থেকে ফিরছেন?

হরিসাধন বললেন, মিটিং থেকে? বসে বসে ইংরেজ তাড়াচ্ছিলাম। ওঃ! অমানিশার অন্ধকার থেকে আরম্ভ করে কি কথাটাই না লিখলাম!

—'নব প্রভাতের নবীন সূর্য' লেখেননি?

—নিশ্চয়। কাল সকালে আর একটি ইংরেজের বাচ্ছাও দেখতে পাবেন না।

—কি হবে তাদের?

—বিলেত চলে যাবে, আবার কি হবে? ওই লেখার পরেও যদি তারা থাকে, বুঝতে হবে ওদের লজ্জার লেশমাত্র নেই। ওদের আশা ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

—দেখা যাক।

হরিসাধনবাবু হাসতে হাসতে উঠে গেলেন। তাঁর আবার সন্ধ্যায় পার্টি মিটিং আছে। ফিরে এসে নিজের লেখার প্রুফ দেখবেন। তাঁর সহকারীদের লেখাও একবার চোখ বুলোতে হবে।

এইটুকু গল্পেই ওরা যেন অনেকটা আরাম পেলে। মাত্র ক'দিন ওরা নিঃশব্দে কাজ করছে, তাই যেন যুগ বলে মনে হচ্ছে। আর একটু আরাম করার জন্য ওরা চায়ের ফরমাস দিলে। আর আনতে দিলে মিউনিসিপাল মার্কেট থেকে কিছু চানাচুর।

এমন সময় এল দেবপ্রিয়। দেবপ্রিয়র বয়স বেশি নয়, কুড়ি একুশ বড় জোর। থার্ড ইয়ারে পড়ে। কিন্তু তাতে কি? দেবপ্রিয় বাঙ্গালা দেশে একজন নেতৃস্থানীয় সুপরিচিত ব্যক্তি। সে বাঙ্গালা দেশের ছাত্রসমিতির পাণ্ডা। এ আফিসে তার ঘন ঘন যাতায়াত আছে। কিন্তু সাব-এডিটারদের ঘরে বড় একটা আসে না। তার আড্ডার স্থান খাশ সম্পাদকের ঘরে, প্রথম শ্রেণীর নেতাদের সঙ্গে।

দেবপ্রিয় একটু গরম মেজাজেই ঘরে ঢুকল। সকলের কর্মব্যস্ত আনত মুখের দিকে একবার চেয়ে বিশেষ কাকেও লক্ষ্য না করে উষ্মার সঙ্গেই প্রশ্ন করলে, আমার সেটা ছাপা হয়নি কেন ?

সকলেই বিস্মিতভাবে মুখ তুলে চাইলে।

সুকুমার ওকে চিনত না। সে অল্পদিন হল এসেছে। মাত্র এ ঘরে যারা আসে তাদের সঙ্গেই তার পরিচয় হয়েছে, আর কারও সঙ্গে নয়। সে ওর ঔদ্ধত্যে বিরক্তও হল, বিস্মিতও হল।

কেউ কোনো উত্তর দেবার পূর্বেই সেও উষ্মার সঙ্গে উত্তর দিলে, আপনার কোন্‌টা ছাপা হয়নি ?

ওর উষ্মা দেখে দেবপ্রিয় যেন একটু দমে গেল। একটা সাব-এডিটারের এতটা স্পর্ধা সে প্রত্যাশা করেনি। ঈষৎ নরম হয়ে বললে, আমার সেই বিবৃতিটা ?

সুকুমার তেমনি স্বরেই বললে, আপনার কোন বিবৃতিটা ?

জ্যোতির্ময় তাড়াতাড়ি সুকুমারকে বললে, উনি দেবপ্রিয়বাবু—ছাত্রসমিতির সম্পাদক। একজন বিশিষ্ট তরুণ নেতা।

দেবপ্রিয়কে সসম্ভ্রমে বললে, বসুন, বসুন। আপনার ওটা আজকের কাগজেই যেত। কিন্তু এত বড় হয়েছে যে,

জ্যোতির্ময় সম্ভ্রম দেখাবামাত্র দেবপ্রিয়ের পুরাতন উষ্মা ফিরে এল। মাথা নেড়ে বললে, বড় statement কি আপনারা ছাপেন না ?

জ্যোতির্ময় বললেন, না না, ছাপব না কেন, ছাপি। কিন্তু একেবারে তিন কলম !

—তিন কলমই যেতে হবে এবং ভালো জায়গায়। জানেন, ওটা না বেরুনোর জন্যে আমাদের কত ক্ষতি হয়েছে ? আমাদের সমিতিতে কি রকম সাড়া পড়ে গেছে ? তাঁরা তো এই নিয়ে আপনাদের কর্তৃপক্ষের কাছেই যেতে উদ্যত। আমিই বলে কয়ে নিরস্ত করলাম। আমরা আপনাদের কর্তৃপক্ষের জন্যে এত করি, আর প্রতিদানে আপনারা

সরিৎবাবু একটু কুটিল হেসে বললে, জানি, সবই জানি। আপনারা আছেন বলেই আমাদের কর্তৃপক্ষের পার্টি আছে, আমাদের কাগজের এত বহুল প্রচার। কিন্তু কাগজের পৃষ্ঠা তো আমরা বাড়াতে পারি না। আপনিই বলুন, পারি কি না।

জ্যোতির্ময় বললে, নিয়ে এলেন রাত দশটায়।

সরিৎ বললে, তায় ইংরিজিতে লেখা। ওর তর্জমা করতে হবে।

জ্যোতির্ময় বললে, একটু ছোট করা চলে না?

দেবপ্রিয় গম্ভীরভাবে বললে, একটি অক্ষরও না। ওইটিই আমাদের মিটিঙে পাশ হয়েছে। ঠিক হুবহু ওইটিই ছাপতে হবে।

সুকুমার ততক্ষণে খুঁজে খুঁজে সেই বিবৃতিটি বার করেছে। ভুল ইংরিজিতে লেখা টাইপ-করা ফুলস্ক্যাপ কাগজের পূরা পাঁচ পৃষ্ঠা। মনে তার হাসি এল। এমন ইংরিজিতে না লিখলেই নয়? বাঙলায় লিখলে এমনই কি মহাভারত অশুদ্ধ হত? বিশেষ ভুল ইংরিজিতে লেখা যত সহজ, তার ঠিক অনুরূপ ভুল বাঙলায় তর্জমা করা তত সহজ নয়। তার কি হবে?

সুকুমার বললে, এটা বাঙলায় তর্জমা করে দিতে পারেন না?

দেবপ্রিয় রাগে ওর কথার উত্তরই দিলে না, একবার ওর দিকে ফিরে চাইলে না পর্যন্ত। শুধু বললে, কাল যেন নিশ্চয়ই যায়, বুঝলেন? নইলে কিন্তু ভীষণ কাণ্ড হবে।

দেবপ্রিয় চলে যাওয়ার জন্যে পিছন ফিরতেই সরিৎ ডাকলে, ও মশাই, শুনছেন? দেবপ্রিয় ফিরে দাঁড়াতেই সরিৎ হাতজোড় করে বললে, কাল ওটা যাবে না। মাফ করতে হবে।

—কেন শুনি?

—স্থানাভাব।

দেবপ্রিয়ের অনেক দিনের রোষ জমা হয়ে ছিল। সে একেবারে বারুদের মত ফেটে পড়ল: স্থানাভাব? ষোল পৃষ্ঠার কাগজে একটা statement ছাপার

স্থান হয় না? মিটিংয়ের রিপোর্ট যখন ছাপেন, তখন উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আমার নামটা যে বাদ যায়, সেও কি স্থানাভাবে? যাক্‌গে, আপনাদের যা খুশি করবেন। কিন্তু আমিও শেষ কথা বলে যাচ্ছি, আমাকে চটালে আপনাদের পার্টির সমূহ ক্ষতি হবে।

দেবপ্রিয় এক মিনিট না দাঁড়িয়ে গট্‌ গট্‌ করে চলে গেল।

একটু পরে জ্যোতির্ময় বললে, কথাসরিৎসাগরের জন্যেই চাকরিটা অবশেষে যাবে দেখছি।

সরিৎ এতক্ষণ পরে হাসলে। সে হাসি তার সহজ হাসি নয়, অত্যন্ত কঠিন একপ্রকার হাসি। তার মুখে এমন কঠিন হাসি ইতিপূর্বে কেউ দেখেনি।

সরিৎ মাথা দুলিয়ে বললে, জ্যোতির্ময়, জননী নেই, জন্মভূমিও গেছে। এবারে তারও চেয়ে গরীয়সী চাকরিও যেতে বসেছে, যাবেও। তবে পেঁয়াজ পয়জার দুই কেন খাই?

জ্যোতির্ময়ও তার অনুকরণে মাথা দুলিয়ে বললে, তবে কি খাবে? খাবি?

সরিৎ চিন্তিতভাবে বললে, সম্ভবত। কিন্তু আমার জন্যে ভাবছি না ভাই। দেশে গিয়ে একটা মাস্টারি করলে, কিম্বা না করলেও দু-সন্ধ্যে দুটো ডাল-ভাত জুটবে। আমার চিন্তা তোমার জন্যে।

জ্যোতির্ময় সহাস্যে বললে, আমার জন্যে ভাবতে হবে না বন্ধু! আমার অন্ন ভগবান মাপিয়ে রেখেছেন।

সরিৎ রসিকতা করে বলসে, খবর এসেছে? কোথায়?

—অন্তরীণ শিবিরে—জ্যোতির্ময় হো হো করে হেসে বললে—দু'দিন চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে দুটো ফিস্‌-ফাস্‌ করলেই ব্যস। কিন্তু জননী-জন্মভূমির চেয়ে গরীয়সী চাকরি কি সত্যিই যাবে?

গলা নামিয়ে অভিনয়ের সুরে সরিৎ বললে, যাবে, সব যাবে। দেখছ না বাতাস কেমন ভারি হয়ে উঠেছে? আকাশ কেমন···? জান না, গৃহস্থ ধনী হলে সে

আর পুরোনো স্মৃতির চিহ্নমাত্র সহ্য করতে পারে না ? এ বাড়ির অতীত দুর্দিনের স্মৃতি জাগিয়ে আছি আমরা ক'জন। আমাদের তাই যেতে হবে।

জ্যোতির্ময় যেন চমকে উঠল। সরিতের সুতীক্ষ্ণ সত্যবাণী একেবারে ওর মর্মে গিয়ে পৌছেচে। তাদের সম্বন্ধে কেবলই এত গণ্ডগোল হয় কেন, সে সম্বন্ধে সে অনেক ভেবেছে। কিন্তু কিছুই স্থির করতে পারেনি। এখন মনে হল, সরিৎ যা বলেছে সে তার অনুমান নয়, অমূলক সন্দেহও নয়। এ তার দিব্যদৃষ্টি, এ ধ্রুব সত্য। তাদের অন্ন উঠেছে। এবার তাদের যেতে হয়েছে।

জ্যোতির্ময় মুহূর্তের মধ্যে অনেক কথা ভেবে ফেললে। এই তালপত্রের ছায়াটুকু গেলে, তারপরে ? সে চারিদিকে খুঁজে কোথাও এতটুকু ছায়া দেখতে পেলে না। আর যারা আছে তারাও এই রকম, কিম্বা এর চেয়েও খারাপ। সর্বত্রই এমনি—তালপাতার ছায়া, সঙ্কীর্ণ আশ্রয়। নিরাপদ নিশ্চিন্ততা কোথাও নেই, এ তো আর বিদেশী শাসক সম্প্রদায়ের তৈরি গোলামখানা নয় যে, একটা বেয়ারাকে ছাড়াতেও তিন বচ্ছর লাগবে। এ আমাদের নিজের হাতে গড়া জাতীয় প্রতিষ্ঠান। যোগ্য বেতন এরা দিতে পারে না। এখানে ত্যাগ স্বীকার করে আসতে হবে, ত্যাগ স্বীকার করেই যেতে হবে। হয় তো কিছু মাইনে থাকবে বাকি, নয় তো রাত দুপুরে অকস্মাৎ আসবে বরখাস্তের কুলিশ। এখানে যাও বললেই যেতে হবে, আর এক মিনিট অপেক্ষা করা চলবে না।

জ্যোতির্ময় ফিক্ করে হেসে ফেললে। বললে, সেই গানটা গাইব কথাসাগর ?

—সেই 'যাবার বেলায়' গানটা ?

—হ্যাঁ ?

মাথা নেড়ে সরিৎ বললে, আসবার কোন গান জান না ?

কুণ্ঠিতভাবে জ্যোতির্ময় বললে, না ভাই।

—ওই তো হে, এতকাল সংসারে রইলে, কিন্তু একটার বেশি গান শিখতে পারলে না—তাও যাবার গান।

খুব মিষ্টি করে হেসে জ্যোতির্ময় বললে, আরও একটা শিখেছি।

—কি গান ?

—'সরল মনে সরল প্রাণে প্রাণ যদি নিতে পার'···গাইব ?

সরিৎ হেসে বললে, না থাক ।

সুকুমার নিঃশব্দে ওদের কথা শুনছিল। এক প্রকার রুদ্ধ নিশ্বাসে। কে এরা ? জীবন অকস্মাৎ ওদের কাছে এত হাল্‌কা হয়ে গেল কি করে ? যাদের সে নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে ভেবেছিল, অকস্মাৎ তারা যেন বহু দূরে সরে গেল—সুদূর আকাশে ! তার চোখে সেখানে তারা শুকতারার মতো জ্বলতে লাগল। সুকুমার স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে আবার সংবাদ তর্জমায় মন দিল ।

১০

'সুদর্শন' অফিসের বাইরের আবহাওয়ায় বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা না গেলেও, লোকচক্ষুর অজ্ঞাতে, মাটির নিচে কোথাও যেন উত্তাপ সঞ্চিত হচ্ছে। চোখে না দেখেও জন্তুরা যেমন করে ভূমিকম্পের খবর পূর্বাহ্ণেই টের পায়, এও তেমনি করে সবাই মনে মনে টের পেলে। কিন্তু প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলে না। সুকুমার খবরের কাগজে নতুন ঢুকেছে, এখানকার রাজনীতির দুর্গম অরণ্যে সে দিশেহারা হয় ক্ষণে ক্ষণে। তার ভিতরে নাসিকা প্রবেশ করাতে ভয় পায়। সে নিঃশব্দে চোখ চেয়ে দেখে যায়। দেখে যায়, তাদের ঘরের আবহাওয়া আবার সরস হয়ে উঠল। হাসিতে গল্পে আবার পূর্বের মত সরগরম। সরিৎ, জ্যোতির্ময় এবং কালীমোহন যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। কাউকে আর গ্রাহ্য করে না। কিছুতে আর ভয় পায় না। ওদের মুখে চোখে একটা বেপরোয়া ভাব। সুকুমারও ওদের সঙ্গে হাসি গল্প করে বটে, কিন্তু তার মনে হয় এ সব কিছুই যেন আগেকার মতো সহজ এবং স্বাভাবিক নয়। থেকে থেকে সবাই কখন অজ্ঞাতে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে—সেই সঙ্গে সুকুমারও। এরই মধ্যে কি

করে এদের সঙ্গে সেও যেন নিজের ভাগ্য জড়িয়ে ফেলেছে। অথচ এদের কতটুকুই বা সে জানে! পথের পরিচয় বই তো নয়!

দেবপ্রিয় নিশ্চয়ই কর্তৃপক্ষের কাছে সাব্-এডিটারদের বেয়াদবির কথা জানিয়েছে। কারণ, পরের দিনই কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ অবনীন্দ্রবাবুর কাছ থেকে সেই বিবৃতিরই আর এক কপি এসে উপস্থিত হল। তার এককোণে অবনীন্দ্রবাবুর নিজের হাতে তাঁর স্বাক্ষর-সম্বলিত দুটি কথা লেখা আছে, Kindly publish—Kindlyটা সাধারণ ভদ্রতা। কিন্তু অবনীন্দ্রবাবুকে দোষ দেওয়া যায় না। তিনি বাংলা দেশের 'মুকুটহীন রাজা' এবং মুকুটহীন রাজাগিরির বহু ঝকমারি, যা সত্যিকার রাজাকে পোহাতে হয় না। তাঁকে বহু তাল সামলাতে হয়, ভাবের ঘরে বহু চুরি করতে হয় এবং অনেক গোঁজামিল দিতে হয়। আসলে ওই বিশেষণটাই একটা পরিহাস। কারণ, সত্যকার রাজার মুকুট থাকে। যার মুকুট নেই, সে রাজাও নয়।

কর্তৃপক্ষের হুকুম পাওয়ামাত্র সরিৎ বিবৃতিটার তর্জমা করে প্রেসে পাঠিয়ে দিলে। কিন্তু সবটা নয়। অনেকটা কেটে-ছেঁটে অবান্তর কথা বাদ দিয়ে এক কলম পরিমিত মাত্র আবশ্যকীয় অংশটারই তর্জমা করে প্রেসে দিলে।

এর ক'দিন পরে একদিন অবনীন্দ্রবাবু এসে সকলকে ডেকে পরস্পর সহযোগিতা করার ও আফিসের নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ কথা বলে গেলেন। সেই সঙ্গে সর্বপ্রকারে পার্টির স্বার্থরক্ষায় মনোযোগী হবারও অনেক উপদেশ দিলেন।

সেই দিনই জ্যোতির্ময়ের ডাক পড়ল কমলবাবুর ঘরে।

সরিৎ বললে, দুর্গা নাম স্মরণ করে যাও ভাই। রাজপুরুষের ডাক এলেই বুঝবে বিপদ আসন্ন!

জ্যোতির্ময় হাসতে হাসতে গেল বটে। কমলবাবু বললেন, গত ছ'দিনের মধ্যে একদিনও তার লেখা তিন কলম পোরেনি।

জ্যোতির্ময় অবাক হয়ে গেল। বললে, বলেন কি মশাই!

—ওই তো ছ'দিনের কাগজ রয়েছে। আপনি যে কোনো একদিনের লেখা মেপে দেখতে পারেন।

চাকরি এমনই একটা জিনিস যে ছেড়ে দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকা সত্ত্বেও ওর হাত-পা কাঁপতে লাগল, গলা শুকিয়ে গেল। টেবিলের উপরেই ছ'দিনের কাগজ সাজান রয়েছে। সামনের থানায় যে সমস্ত খবর তার লেখা, তার উপর নীল পেন্সিলে 'জে' লেখা।

জ্যোতির্ময় সেইগুলোর উপর একবার আলগোছে চোখ বুলিয়ে কোনো রকমে বললে, আপনি মেপে দেখেছেন? তিন কলম হয়নি?

—আপনি একবার দেখতে পারেন।

জ্যোতির্ময় আপন মনেই বললে, আশ্চর্য! অথচ

হঠাৎ ওর একটা কথা মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি বললে, প্রিণ্টারকে একবার ডাকুন তো! আমার মনে হচ্ছে,

প্রিণ্টার এল।

জ্যোতির্ময় বললে, আমার লেখা কোনো কপি আপনার কাছে নেই?

—থাকতি পারে।

—নিয়ে আস্থন তো।

একটু পরে প্রিণ্টার ফিরে এসে একটি রাশ কপি টেবিলের উপর রাখলে।

কমলবাবু আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এ সব কি?

—ওনার কপি।

—কম্পোজ হয়নি কেন?

—জায়গা সিল না?

—জায়গা ছিল না?

প্রিণ্টার মাথা চুল্‌কে বললে, থাক্‌পে না ক্যান, সিল। কিন্তু এই আতের লেখা, সওজে কেউ ধরতি চায় না। আতে যখন নিতান্ত কপি থায়ে না, তখনই

—আচ্ছা যান।

প্রিণ্টার যাবার সময়ও আর একবার জ্যোতির্ময়ের 'আতের লেথার' সম্বন্ধে বিড় বিড় করতে করতে চলে গেল। হাতের লেথাটা ওর সত্যাই বড় বিশ্রী। সরু সরু পিঁপড়ের ঠ্যাঙের মত অক্ষর, তার এ-কার, উ-কার, আর ই-কারগুলো অস্বাভাবিক রকমের দার্ঘ। সে লেথার পাঠোদ্ধার করে কম্পোজ করা সত্যাই দুরূহ। কাজেই অন্য কপি পেলে আর কেউ তার কপি ছুঁত না। সেই কপি জমে স্তূপ হয়েছে। এদিকে জ্যোতির্ময়ের 'জন্মভূমি' যায়!

একটু চুপ করে থেকে জ্যোতির্ময় সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আমার চাকরি কি তাহলে রইল, না গেল?

কমলবাবু হেসে ফেললেন। মুখ তুলে বললেন, আপাতত রইল বলেই তো মনে হচ্ছে।

—তাহলে আমি আপাতত যেতে পারি?

—স্বচ্ছন্দে।

জ্যোতির্ময় ফিরে আসতেই সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, গেলে তো, না রইলে?

—আপাতত রইলাম।—জ্যোতির্ময় 'আপাততর' উপর জোর দিলে!

সরিৎ বললে, ব্যস। আর কথাটি নয়। একটি পয়সা কপালে ঠেকিয়ে বাবা তারকেশ্বরের জন্যে রেথে দাও।

জ্যোতির্ময় বললে, সেই ভালো। তারপর চাকরিটা গেলে তাই দিয়ে একদিন চানাচুর থাওয়া যাবে—কি বল?

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপারটা কি?

জ্যোতির্ময় সবিস্তারে বর্ণনা করতেই একটা উচ্চহাসির রোল পড়ে গেল। আশ্চর্য! ওর লেথা থারাপ বটে, কিন্তু সে যে এমন থারাপ তা কারো লক্ষ্যই হয়নি।

সরিৎ বললে, তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত জ্যোতির্ময়।

সুকুমার সায় দিলে, বাস্তবিক। একেবারে অভদ্র রকমের বিশ্রী হাতের লেখা।

জ্যোতির্ময় বেশ মুরুব্বির মতো হেসে বললে, ওহে আমাদের অর্থাৎ বড়লোকদের হাতের লেখা বিশ্রীই হয়। এ লেখা তো কেরানীগিরি করবার জন্যে নয়, একটা জাতকে স্বাধীন করবার জন্যে! বুঝলে?

ওরা কিন্তু বুঝতে চাইলে না। জ্যোতির্ময়কে নিয়ে নাস্তানাবুদ করতে আরম্ভ করে দিলে! বেচারা বিব্রত হয়ে উঠল। ভাবলে, এদের কাছে সমস্ত কথা বলা কি অন্যায়ই না হয়েছে!

ঘণ্টা দুই পরে ঝোড়ো কাকের মত ঘরে ঢুকে কালীমোহন চুপি চুপি বললে, কথাসাগর এবারে গেলাম!

কলম রেখে সকলে সমস্বরে বললে, কি হল?

—যা হবার তাই হল। একটা চুরুট দাও দেখি।

সরিৎ চুরুট বের করে বললে, নিশ্চয়। কিন্তু চট-পট খবরটা দিয়ে তাপিত প্রাণ শীতল কর দেখি।

চুরুট ধরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে কালীমোহন বললে, আর শীতল বন্ধু! লোক এসে গেছে।

—কে লোক?

—তা কি আমি চিনি?

—তবে? কি চায় সে?

ঘাড় দুলিয়ে কালীমোহন বললে, সে নয় তারা। সম্ভবত আমাদের জায়গায় কাজ করতে চায়।

সকলে বিস্মিতভাবে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কালীমোহন তেমনিভাবে ঘাড় দুলিয়ে আবার বললে, কমলবাবুর ঘরে গিয়ে দেখে আসতে পার। কি সুন্দর ছেলে দুটি!

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে সরিৎ বললে, যাঃ।

কালীমোহন হেসে বললে, যাব তো নিশ্চয়ই। তবে বোধ হয় কিছু দেরি আছে। নিতান্ত বাচ্ছা। আশা হচ্ছে তারা সাবালক না হওয়া পর্যন্ত এখানকার ঘাস-জল রইল।

সবাই নিঃশব্দে বসে বসে কি যেন ভাবতে লাগল।

একটু পরে সুকুমার বললে, দেখেই আসি। মোহনের তো কথা!

সে আর কৌতূহল দমন করতে পারছিল না। একটু পরে ফিরে এসে বললে, সত্যিই বটে।

জ্যোতির্ময় জিজ্ঞাসা করলে, কমলবাবুর টেবিলে বসে আছে?

সুকুমার বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লে।

সরিৎ জিজ্ঞাসা করলে, ক'জন?

সুকুমার দুটা আঙুল তুলে দেখালে।

—তাহলে তো আমি আর জ্যোতির্ময়। কি কথা হচ্ছে?

সুকুমার বললে, কিছু না। তারা টেলিগ্রাম তর্জমা আরম্ভ করে দিয়েছে।

—হুঁ?—জ্যোতির্ময়কে একটা ঠেলা দিয়ে সরিৎ বললে—সতরঞ্চ লণ্ঠন গুটোও ভাই, বাবু বললেন, আজ আর গান হবে না।

জ্যোতির্ময় শুধু একটু ফিকা হাসলে। সে যেন কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। সমস্ত কথা যেন তার কানে যাচ্ছে না।

সরিৎ তাকে আর একটা ঠেলা দিয়ে বললে, শুনছ না? কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে। আর কেন?

জ্যোতির্ময় ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে, সেই 'সরল প্রাণে' গানখানা এইবার একবার গাই না কেন কথাসাগর? ভালো গান!

কালীমোহন এতক্ষণ ধরে চেয়ারে ঠেস দিয়ে আকাশ পানে মুখ করে মুদ্রিত নেত্রে চুরুট টানছিল। হঠাৎ সোজা হয়ে উঠে বসে বললে, এক মিনিট জ্যোতির্ময়—আরও খবর আছে।

সে গম্ভীরভাবে বুকপকেট থেকে একখানা খাম টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে আবার পূর্ববৎ ধূমপান করতে লাগল।

সকলে চিঠিখানার উপরে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ইংরিজিতে লেখা একখানা চিঠি—তাতে আজ কিম্বা কাল সকালে কালীমোহনকে একবার ম্যানেজিং ডিরেক্টারের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে হরিসাধনবাবু অনুরোধ জানিয়েছেন।

—দেখা করেছ?

কালীমোহন ঘাড় নেড়ে বললে, না। চিঠি যখন দিয়ে যায় তখন আমি বাসায় ছিলাম না। যখন ফিরলাম তখন, আর সকাল নেই। ভাবছি কাল সকালে যাব!

—হরিসাধনবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করলে না কেন?

—করলাম। তিনি কিছু জানেন না।

সকলে একসঙ্গে বললে, হুঁ।

কালীমোহন চমকে উঠে বললে, আমিও ভেবেছি হুঁ। তারপরে আফিসে ঢুকেই যখন দেখলাম, দুজন নতুন লোক, তখন আর একবার ভাবলাম—হুঁ। শেষে হরিসাধনবাবু যখন বললেন তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না,

—তখন আর একবার ভাবলে হুঁ?

বিস্মিতভাবে কালীমোহন বললে, Exactly—তোমরা কি করে জানলে? আশ্চর্য!

সরিৎ বললে, আশ্চর্য আর কি? আমরাও ওই একই প্রণালীতে জেনেছি।

—আচ্ছা, তোমাদের কি মনে হয়?

—আমাদেরও মনে হয় হুঁ।—কথাটা সুকুমার বললে।

—ঠিক।—একটু থেমে কালীমোহন হঠাৎ বললে—আচ্ছা কোন দু'জন?

সরিৎ বললে, আমাদের এই তিনজনের মধ্যে যে কোনো দু'জন, অথবা যে কোনো তিনজন। কাল আর একজন নতুন লোক যে আসবে না, কে বলতে পারে?

জ্যোতির্ময় হেসে বললে, আর জ্বালিও না সাগর। তুমি এ যাত্রা রইলে। যেতে আমরা দু'জনই যাব।

কালীমোহন একটা ধমক দিয়ে বললে, হয়েছে। 'কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান তারই লাগি তাড়াতাড়ি'? উঁ? ভাব-বিলাসিতা? আচ্ছা, সত্যি করে বল তো জ্যোতির্ময়, তোমার মনে কষ্ট হচ্ছে না? একটুও কষ্ট হচ্ছে না?

—একটু যেন হচ্ছে।

—আমারও। তাহলে মিউনিসিপাল মার্কেট থেকে চানাচুর আনাই? বেয়ারা!

সুকুমার কিন্তু চুপ করে রইল। আর সে এদের পরিহাসে প্রাণ খুলে যোগ দিতে পারলে না। এদের সঙ্গে তার যেন ব্যবধান ঘটেছে। সুকুমার কেমন যেন দমে গেল। তার মনে হল, হায়! তারও যদি এই সঙ্গে চাকরি যাওয়ার আশঙ্কা থাকত! বেশ হত তাহলে। তাহলে এই ক'জন পরম বন্ধুর সঙ্গে তার একাত্মতায় কোন বিঘ্ন ঘটত না। তার সমস্ত মন দারুণ অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগল।

সবে সকাল হয়েছে। কিন্তু কতকটা কুয়াশায়, কতকটা চারিপাশের বাড়ির উনানের ধোঁয়ায় আকাশ আচ্ছন্ন। সূর্যের প্রকাশ ভাল করে হয়নি। সুকুমারের ভোরে ওঠা অভ্যাস। সে মুখ হাত ধুয়ে এক পেয়ালা চা নিয়ে বিছানায় বসে সেদিনের 'সুদর্শন' কাগজখানা দেখছিল। সাংবাদিক জীবন তার বেশি দিনের নয়। মোহও কাটে নি। ছাপার হরফে নিজের হাতে অনুবাদ-করা সংবাদ-গুলির উপর চোখ বুলোতে বড় ভালো লাগে। কোথাও ছাপার ভুল থাকলে—এবং কিছু কিছু ভুল প্রত্যহই থাকে—অত্যন্ত বিরক্ত হয়, বিশেষ জ্যোতির্ময়ের সেদিনের কাণ্ডের পর মনে তার ভয়ও ধরেছে। সুকুমার তার তর্জমা করা খবরগুলো মেপে মেপে একটা আনুমানিক হিসাব করতে লাগল, তিন কলম হয়েছে কি না। এমন সময় জ্যোতির্ময় এসে দরজার বাইরে উঁকি দিলে।

সুকুমার চমকে মাথা তুলে বললে, আরে এসো, এস। হঠাৎ এত সকালে যে!

—সকালেই এলাম।—জ্যোতির্ময় ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে।

সুকুমার কাগজখানা একপাশে ঠেলে রেখে বললে, একটু চা খাবে জ্যোতি?

—খাব। চল দোকানে গিয়েই খাওয়া যাবে। জামাটা গায়ে দিয়ে নাও দেখি।

—আর কোথাও যাবে না কি?

—একবার সরিতের ওখানে যাব। চল না।

সুকুমার জামা গায়ে দিয়ে ওর সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল। চায়ের দোকান কাছেই। সেখানে ঢুকে চায়ের ফরমাস দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, কি ব্যাপার বল দেখি? তোমার মুখখানা দেখে তো বড় সুবিধা মনে হচ্ছে না।

জ্যোতির্ময় ফিক করে হেসে পকেট থেকে একখানা খাম বের করে সুকুমারের হাতে দিল।

—এ আবার কি?

—পড়েই দেখ।

পড়তে পড়তে সুকুমারের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। বললে, কাল রাতে ফেরবার সময় কিছু বললে না তো?

—রাত্রি বারোটার সময় পিয়ন এসে দিয়ে গেছে।

—তার মানে?

জ্যোতির্ময় হেসে বললে, মানে অতি সোজা। আজ মাসের পয়লা। কাল রাত্রে নোটিশ না দিলে আরও একমাসের মাইনে দিতে হত।

জ্যোতির্ময় হাসছিল বটে, কিন্তু মুখ তার শুকিয়ে গেছে। কথা বলতে ঘন ঘন দম নিতে হচ্ছে। চঞ্চল চোখ কোনো এক জায়গায় স্থিরভাবে বসছে না। ভিতরে ভিতরে ও বেশ অস্থির হয়ে উঠেছে।

সুকুমার ধীরভাবে বললে, তোমার চাকরি যে যাবে এ তো জানাই কথা। কিন্তু

এমনভাবে রাত দুপুরে জবাবী চিঠি আসবে, তা ভাবতে পারা যায় না। যখন পকেট থেকে খামখানা বের করলে, আমি ভাবলাম বুঝি,

—বৌএর চিঠি, না ?—জ্যোতির্ময় টেনে টেনে হাসতে লাগল।

—সত্যি।

চা খাওয়া হয়ে গেলে জ্যোতির্ময় বললে, চল। সরিৎকে সু-খবরটা দেওয়া যাক।

রাস্তায় জনতার স্রোত চলছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের ক্রমাগত সংঘর্ষ বাধছে। কিন্তু ওরা দুটি বন্ধু এই ভিড়ের মধ্যে চলতে চলতেও নিজেদের ভিড় থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করতে লাগল।

জ্যোতির্ময় বললে, আমার এক আত্মীয় সুন্দরবনে জমি নিয়ে দিব্যি চাষ-আবাদ আরম্ভ করছে। ওখানে নাকি প্রচুর ফশল হয়। ভাবছি সেইখানেই যাব নাকি ?

ও উৎসাহিত হয়ে উঠল। সুকুমারের কাছ থেকে সাড়া না পেয়ে আবার বললে, কিন্তু জায়গাটা ভারি অস্বাস্থ্যকর। সেই এক আপত্তি। তার চেয়ে ছোটখাটো চায়ের দোকানই খুলব নাকি ? অ্যাঁ ?

সুকুমার দ্বিধাভরে বলে, ব্যবসা জিনিসটা তো ভালোই। কিন্তু তুমি কি পারবে ?

একটা তুড়ি দিয়ে জ্যোতির্ময় বললে, পারব না মানে ? বলে, গরু পাঁকে পড়লে দুনো বল ধরে। তা জানো ?

তার চিৎকারে সচকিত হয়ে পথচারী এক বৃদ্ধ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে ওর দিকে চাইলেন। বিরলকেশ মাথাটা নেড়ে আপন মনেই একবার হাসলেন। ভাবটা বোধ হয় এই যে, যৌবনের তপ্তরক্তের তেজে বড় স্ফূর্তি বেড়েছে, না ? তারপরে আমারই মতো লাঠি হাতে ঠুক ঠুক করে বেড়াতে হবে, সে তো টের পাচ্ছ না ?

কিন্তু ওদের তখন বুড়োমানুষের দিকে চাইবার সময় নেই। চাকরি গেছে, একটা কিছু জ্যোতির্ময়কে করতে হবে। সেই করাটা যে কি সে বিষয়ে এখনও

অবশ্য সে মন স্থির করতে পারেনি। সুন্দরবনে আবাদ নেওয়াও হতে পারে, চায়ের কিম্বা ড্রাইং-ক্লিনিঙের দোকানও হতে পারে ; আবার অন্য কোনো একটা কাগজেও যা-কিছু-হোক করতে পারে। এই রকম কোনো একটা ভবিষ্যতের স্বপ্নে সে উত্তেজিত হয়ে আছে।

ইতিমধ্যে ওরা সরিতের বাড়ির সামনে এসে উপস্থিত হল। বাড়ি নয়, বাসা। আর তাও সরিতের নয়, ওর দাদার। দাদা ওর চেয়ে মাত্র বৎসর দুয়েকের বড় এবং ওর চেয়ে এক বৎসর আগে তৃতীয় বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে একটা মার্চেণ্ট অফিসে চাকরি নেয়। তখন মাইনে অল্পই ছিল। কিন্তু এই বারো বৎসরে বাড়তে বাড়তে দেড়শোয় এসে পৌঁচেছে। আর ও ভালো ছেলে ছিল বলে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেই থামতে পারেনি। এম-এ পর্যন্ত বেশ ভাল করে পাশ করতে হয়েছে। ফলে 'সুদর্শন' আফিসে ষাট টাকা মাইনে পাচ্ছে গত পাঁচ বৎসর যাবৎ। অদূর ভবিষ্যতে যে আর একটি টাকাও বাড়বে, এমন সম্ভাবনা নেই। বেচারা দাদার সংসারের মাঝখানে একটা উপসর্গ হয়ে রয়েছে। এখন পর্যন্ত বিবাহ করার যোগ্যতাও অর্জন করতে পারলে না।

সরিৎ নিচে বাইরের ঘরে বসে বসে ঝিমুচ্ছিল, কিম্বা ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গবেষণা করছিল, বোঝা গেল না। ওদের দেখে অবাক হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইলে।

তারপরে একটু ফিকা হেসে বললে, কি বাবা, এরই মধ্যে খবর পৌঁছে গেছে ? বোস, বোস।

জ্যোতির্ময় দিগ্বিজয়ীর মত বীরদর্পে তার পকেট থেকে কর্মচ্যুতির নোটিশটা বার করছিল। মধ্য পথে থেমে চকিতভাবে বললে, কি খবর বলতো ? তোমারও আবার খবর আছে নাকি ?

সরিৎ সে কথার জবাব না দিয়ে পট্‌ করে ওর বুক-পকেট থেকে অর্ধোত্থিত খামখানা তুলে নিয়ে বললে, কি এটা ?

—বিয়ের নেমন্তন্ন। পড়ই না।

এক নিশ্বাসে চিঠিখানা পড়ে সরিৎ আশ্বস্ত হয়ে বললে, বাঁচলাম! তাই তো ভাবছিলাম, বড় রকম একটা ওলট-পালট না হলে

—আবার কি ওলট-পালট? ও সুকুমার, সরিৎ বলছে কি! তুমিও গেলে না কি সরিৎ?

—এখনও যাইনি। যাব।

—তার মানে?

সরিৎ টেবিলের ড্রয়ার থেকে ঠিক আর একখানা ওই রকমের খাম বের করে নিঃশব্দে ওদের দিকে ছুঁড়ে দিলে। ওরা চিলের মতো ছোঁ মেরে খামখানা তুলে নিয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে পড়তে লাগল।

তারপরে তুজনেই এক সঙ্গে সোল্লাসে চিৎকার করে উঠল: ব্রাভো! তাহলে খাইয়ে দাও কথাসাগর। এ যে আশাতীত! অ্যাঁ? তোমাকে নিউজ-এডিটার করলে? আশ্চর্য!

—আশ্চর্য আর কি! কমলবাবুকে আর তোমাকে তাড়ালে আমাকে নিউজ-এডিটার করা ছাড়া উপায় কি?

সুকুমার চিৎকার করে বললে, তাহলে কমলবাবুকেও তাড়িয়েছে?

—নইলে আমাকে নিউজ-এডিটার করবে কেন?—বলে সরিৎ হা হা করে হেসে উঠল। বললে, আরও একখানা চিঠি দেখাই তোমাদের।

সুকুমার এবং জ্যোতির্ময় অধীর আগ্রহে সেখানা পড়তে লাগল। কিন্তু ওরা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। তাই বার বার গোড়া থেকে পড়তে লাগল! অত্যন্ত সংযত এবং সংক্ষিপ্ত পত্র। সরিৎ নিউজ-এডিটার পদে উন্নীত হওয়ার জন্যে ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। সেই সঙ্গে অতীব দুঃখের সঙ্গে আরও জানিয়েছে যে, নানা কারণে 'সুদর্শনে' কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। সেই জন্যে আগামী মাসের পয়লা থেকে সে কর্মত্যাগ করল। ম্যানেজিং ডিরেক্টার এই পত্র এক মাসের নোটিশরূপে গ্রহণ করলে সে বাধিত হবে।

জ্যোতির্ময় ভীষণ ক্রুদ্ধভাবে বললে, এ আবার কি সরিৎ! এ সব কিছুতেই চলবে না। তুমি যে আমাদের জন্যে চাকরি ছাড়বে, সে কিছুতেই হতে পারবে না। তুমি যে এত ভাবপ্রবণ তা জানতাম না। আশ্চর্য ব্যাপার!

সরিৎ শান্তভাবে হেসে বললে, তোমাদের জন্যে কে বললে! আমি অনেক ভেবে দেখেছি, যারা অকারণে একজন অসহায় ভদ্রলোকের চাকরি খেতে পারে, তাদের কাছে চাকরি করব কোন্ ভরসায়? তার চেয়ে এখনও বয়স আছে, উদ্যম আছে, জীবনের অবলম্বন হয়তো এখনও খুঁজে নিতে পারব। বেশি দেরি হওয়ার আগেই তাই সতর্ক হচ্ছি।

সুকুমার এবং জ্যোতির্ময় নীরবে বসে রইল।

একটু পরে সরিৎ বললে, যে দেশে বিপিন পালের মতো সাংবাদিককেও শেষ জীবনে ভাড়াটে লেখকের পর্যায়ে নেমে আসতে হয়, সে দেশে জার্ণালিজ্ম্ থেকে তুমি কি আশা করতে পার?

চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে জ্যোতির্ময় বললে, তাই ভাবছিলাম।

ঘরের সেই লঘু-চপল হাওয়া দেখতে দেখতে ভারি হয়ে উঠল। মনের কোণে কোণে জমতে লাগল স্তব্ধতা। যে দুঃখ একান্তই ব্যক্তিগত ভেবে ওরা এতক্ষণ হালকা পরিহাসের সঙ্গে নিচ্ছিল, যেই সাধারণভাবে দেখলে, আর তা তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দিতে পারলে না। ওরা ভাবতে বসল।

সুকুমার ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে, এমন হল কেন?

সরিৎ হেসে ফেললে। বললে, হল কেন? হল ধনজীবীর হাতে পড়লে বুদ্ধি-জীবীর দুর্গতি অনিবার্য বলে। যদি বল ধনজীবীর হাতে পড়ল কেন? তার উত্তর না পড়ে উপায় নেই। অর্থাৎ এ ভবসমুদ্রে কোনো কিছুরই স্বেচ্ছাবিহারের শক্তি নেই। ইচ্ছা থাক বা না থাক, সব কিছুকে ধীরে ধীরে ধনীর ঘাটে ভিড়তেই হবে। সংবাদপত্রের মতো আত্মপ্রচারের এবং আত্মপ্রসারের এত বড় যন্ত্রকে ধনী কখনই আপন গৌরবে ভেসে বেড়াতে দিতে পারে না। তাকে কুক্ষিগত করতেই হবে।

সুকুমার মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে, করুক। কিন্তু যাদের উপর কাগজের সমৃদ্ধি, তাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে না কেন?

—কারণ, ওরা ভদ্র ব্যবহার করতে পারে না।

বিস্মিতভাবে সুকুমার বললে, পারে না মানে?

—নিশ্চয়ই পারে না। তা ছাড়া আর কি কারণ হতে পারে? কাগজ উঠে যাক্, এ কখনই ওদের উদ্দেশ্য নয়।

সরিৎ হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললে, ভালো আলোচনায় আসা গেছে। তাহলে আল্‌ডাস্ হাক্স্‌লির একটা জায়গা তোমাদের পড়ে শোনাই· দাঁড়াও।

সে আলমারী থেকে একটা নীল মলাটের বই বের করে পড়তে লাগল:

Men in authority who nag at their subordinates; who are malignant or unjnst···leaders who do not know their underlings' jobs; who are vain and take themselves too seriously; who lack a sense of humour and intelligence—all these can inflict enormous sufferings on the men and women over whom they are set. And they are responsible not only for suffering but for discontent, anger, rebellion, to say nothing of inefficiency. For it is notorious that a bad commander, whether of troops or of work-men, of clerks in an office or children in a school, gets less work out of their subordinates and of worse quality than a good comander.

সরিৎ বড় বড় চোখ মেলে ওদের দুজনের দিকে চাইলে। জ্যোতির্ময় কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে আবার পড়তে লাগল:

The misfit of bad leadership is one of the major causes of individual unhappiness and social inefficiency.

সরিৎ বইখানা সশব্দে টেবিলের উপর ফেলে দিয়ে বললে, Misfit, বুঝলে

জ্যোতির্ময়, সংসারটা misfitএ ভর্তি হয়ে গেছে। যে কাজ যার নয়, সে সেই কাজের ভার নিয়েছে। তার ফলে সে নিজেও যাবে এবং যাওয়ার আগে জীবনের সেই বিশেষ ক্ষেত্রে অপটুতা স্থায়ী করে দিয়ে যাবে।

সুকুমার কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তার মনে পড়ল, স্কুলের হেড-মাস্টারকে, সেই সঙ্গে আরও অনেক শিক্ষককে। শিক্ষা-জীবনের সঙ্গে ওদের অসঙ্গতির এতদিনে যেন সে একটা অর্থ খুঁজে পেলে। এখন বুঝলে সেক্রেটারীর ঘাটে ওরা ছাড়া আর কেউ এসে জুটতে পারে না। এই হল সেক্রেটারীর অনধিকারচর্চার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। বস্তুতপক্ষে জমিদারী চালাবার হাত দিয়ে শিক্ষার এমনি সংস্কারই হবে।

জ্যোতির্ময় বললে, দেখ সরিৎ, যে কথা তুমি শোনালে সে এমন কিছু নতুন তত্ত্ব নয়। বরং অত্যন্ত পুরোনো কথা, সবাই জানে—এমন কি আমাদের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত। তবু এমন হয় কেন ?

একটু ভেবে সরিৎ বললে, বোধ হয় অত্যন্ত সোজা এবং পুরোণো কথা বলেই কারও তা মনে পড়ে না।

মাথা নেড়ে জ্যোতির্ময় বললে, অসম্ভব নয়।

সরিৎ বললে, তোমার ঘটনাটাই ধর। আর কোনো দিন কোনো কাগজে গিয়ে তুমি মনে-প্রাণে খাটতে পারবে ?

—অসম্ভব। আমার লেখবার হাতখানাই ওরা ভেঙে দিলে।

সরিৎ হেসে বললে, শুধু তোমারই নয় বন্ধু, বাঙলার জার্ণালিজমের হাতখানাই গেল ভেঙে। কিন্তু সে ক্ষতি টের পেতে আরও কিছু সময় নেবে।

সুকুমার সবিস্ময়ে সরিতের মুখের দিকে চাইলে।

সরিৎ বলতে লাগল, এর পরে কি হবে জান ? আমি আমাদের আফিসের নতুন রিক্রুট দুটিকে দিয়েই বুঝেছি, ধীরে ধীরে সকল সংবাদ-পত্রই এদের বাথান হয়ে দাঁড়াবে : একদল মেরুদণ্ডহীন অশিক্ষিত ভাগ্যান্বেষী, প্রভুর ইঙ্গিতে ডাইনে-বাঁয়ে গালাগালি দেবে—নারীর সম্ভ্রম, মানীর মান, কথায় কথায় বিপন্ন হবে।

সত্যের মর্যাদা, শিষ্টাচারের সীমারেখা, এমন কি সাধারণ ভদ্রতা পর্যন্ত মানবে না। বাঙলার সংবাদপত্র হবে এমনি unscrupulous একদল লোকের লীলাভূমি।

সরিৎ এই পর্যন্ত বলে থামল। বাঙলার সংবাদপত্রের এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য সে বুঝি আর কল্পনাও করতে পারছিল না। সেই ছোট ঘরখানির মধ্যে তিন বন্ধুতে নিঃশব্দে বসে আপন আপন পথে কি যে চিন্তা করতে লাগল সে ওরাই জানে। হয় তো আরও বহুক্ষণ চিন্তা করত। সংবাদপত্রসেবা ওদের কাছে এখনও পেশা হয়ে ওঠেনি। সাংবাদিক জীবনকে ওরা সত্যি সত্যি ভালোবেসে ফেলেছে। তাই অনেক চিন্তাই ওদের মনে খেলছিল। কিন্তু পাশের ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে এগারোটা বাজল। ওদের এইবার উঠতে হল।

পথে আসতে আসতে সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, আজ একবার আফিসে যাবে না কি?

জ্যোতির্ময় একটু চিন্তা করে বললে, আজ আর যেতে ইচ্ছা করছে না! তবে মাইনে নিতে একবার যেতে হবে বই কি! কাল পরশু যাব।

সুকুমার চলে যাচ্ছিল। জ্যোতির্ময় ডাকল, আর শোন। কালীমোহনকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বল তো, কাল সকালে।

—আচ্ছা।

সুকুমার ডানদিকে বেঁকে চলে গেল।

১১

বিকেলে যথারীতি নিজের ঘরে ঢুকেই সুকুমার ভড়কে গেল। ঘরের চেয়ার-টেবিলগুলো আর এক রকমে সাজানো হয়েছে। তাদের সেই সাবেককালের ঘর বলে চেনাই যায় না। আর চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাজ করছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ক'টি ছেলে। কালকের সেই দুটির সঙ্গে আরও দুটি জুটেছে। দেখলেই বোঝা যায়, এরা সবে কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছে।

—কাকে চান চান মশাই?—একটি ছেলে মুখ তুলে চেয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলে।

ছেলেটির দোষ নেই। সুকুমার যেভাবে অবাক হয়ে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়েছে, তাতে তাকে এই অফিসেরই পুরোনো পাপী বলে চেনা কঠিন।

সুকুমার ঠোঁট টিপে হাসি গোপন করলে। বললে, বলছি।

সেখানে আর না দাঁড়িয়ে সুকুমার কমলবাবুর ঘরে চলল। সে ঘরের আসবাব-পত্রের এখনও কোন অদলবদল হয়নি। ববং টেবিলের উপর দোয়াত-কলম, টেলিগ্রামের স্তূপ, খবরের কাগজের কাটিং—কাল রাত্রে যাওয়ার সময় কমলবাবু যেখানে যা রেখে গেছেন সব ঠিক সেইখানেই আছে। দেখলে মনে হয়, এইমাত্র কোথাও বোধ হয় গেছেন, এখনই ফিরবেন। কিন্তু সুকুমার জানে, তিনি এখানে আর ফিরবেন না।

সুকুমার কালীমোহনকে খুঁজতে লাগল। সেই বা গেল কোথায়? সরিৎই বা এখনও এল না কেন? সুকুমার অস্বস্তিতে চঞ্চল হয়ে উঠল। ভাবলে, হয়তো ওরা হরিসাধনবাবুর ঘরে গেছে। সেও সেইদিকে চলল।

পর্দাটা একটু সরিয়ে দেখলে হরিসাধনবাবুর সামনে, টেবিলের এদিকে সরিৎ উত্তেজিতভাবে কথা বলে চলেছে এবং বোধ হয় তার উত্তাপের হাত থেকে

আত্মরক্ষার জন্যে হরিসাধনবাবু নিজের চারিদিকে সিগারের ধোঁয়ার দুর্গ তৈরি করে ফেলেছেন।

হরিসাধনবাবু সুকুমারকে ডাকলেন, আসুন।

সুকুমার ভিতরে গিয়ে সরিতের পাশের চেয়ারটি টেনে বসল।

সরিৎ এতক্ষণ নিজের ঝোঁকেই বকে চলছিল। সুকুমারকে দেখেই সে আলোচনা স্থগিত রেখে বললে, জান সুকুমার, মোহনেরও চাকরি গেছে?

সুকুমার বিবর্ণমুখে বললে, মোহনেরও?

—হ্যাঁ, তারও। দিনের স্টাফে পুরোনোর মধ্যে রইলে শুধু তুমি।

হরিসাধনবাবু হেসে বললেন, আর আপনি?

—না, আমি রইলাম না। আমি রিজাইন দিচ্ছি। এই নিন।

সরিৎ চিঠিখানা ওঁর দিকে এগিয়ে দিলে।

হরিসাধনবাবু চিঠিখানা ছুঁলেনও না। বিব্রতভাবে বললেন, তাহলে আমি কাজ করব কি করে? সবাই যদি

সরিৎ হেসে বললে, লোকের কি অভাব আছে নাকি? এক জন গেলে দশ জন আসবে।

হরিসাধনবাবু কিন্তু হাসতে পারলেন না। শুষ্কমুখে বললেন, তা আসবে। কিন্তু তাদের দিয়ে আমার কাগজ চলবে না।

—চলবে বলেই তো আনিয়েছেন।

—আমি?—হরিসাধনবাবু বিব্রত বিস্ময়ে বললেন,—ঘণ্টাকয়েক আগে পর্যন্ত এর বিন্দুবিসর্গও আমি জানতাম না।

হরিসাধনবাবুকে ওরা চেনে। তাঁর কথায় কেউ অবিশ্বাস করতে পারলে না বরং ওদের মনে হল, মনের ভাব যথাসাধ্য গোপন করবার চেষ্টা করেও ভদ্রলোক কিছুতেই মুখ থেকে অসন্তোষের চিহ্ন মুছে ফেলতে পারছেন না। কিন্তু তিনিও আর সকলের মতোই অসহায়।

কেবল বললেন, আজ সন্ধ্যের আগে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের আসবার কথা

আছে। আপনি রেজিগ্‌নেশন লেটার আমাকে না দিয়ে বরং তাঁকেই দেবেন। আমার মনে হয়, আপনাদের তরফের সকল কথা তাঁর শোনাও প্রয়োজন। বলে একটু ইঙ্গিতপূর্ণ হাসলেন।

সরিৎ বসে রইল। সুকুমার উঠে কাজ করতে গেল নিজের ঘরে। এবার সে এমনভাবে ঘরে ঢুকল যে কেউ আর কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করল না। সে তার ড্রয়ার খুলে খাতা-কলম বের করে অবিলম্বে সংবাদ তর্জমায় মন দিলে। পাশের লোকদের দিকে চেয়েও দেখলে না। কিন্তু মন তার আজ ভারাক্রান্ত। সংবাদ তর্জমা মন্দগতিতেই অগ্রসর হতে লাগল। আর সব সময় কান রইল বাইরের দিকে, কখন ম্যানেজিং ডিরেক্টার আসেন।

ওঘরে সরিৎ তখন প্রশ্ন করছে, আচ্ছা, কমলবাবুর চাকরি কেন গেল জানেন? জ্যোতির্ময়ের চাকরি যাওয়ার কারণ কতকটা অনুমান করতে পারি। কিন্তু কমলবাবুর?

হরিসাধনবাবু নিঃশব্দে কি যেন ভাবছিলেন। ধীরে ধীরে বললেন, ওই একই কারণে। ক্রমাগত আপনাদের বাঁচাতে চেষ্টা করার ফলে উনি নিজে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের অপ্রীতিভাজন হয়ে পড়লেন। তাঁর শেষ পর্যন্ত বদ্ধমূল ধারণা হল, উনিও আপনাদেরই দলে।

—তাহলে আমি? আমার উন্নতি হল কেন?

—আপনারও—হঠাৎ থেমে গিয়ে হরিসাধনবাবু বললেন,—কি জানি।

সরিৎ হেসে বললে, বুঝতে পেরেছি আমিও দুদিন পরে যেতাম। আপাততঃ আমাকে না রেখে উপায় ছিল না। কি বলেন?

হরিসাধনবাবু গম্ভীরভাবে একখানা খবরের কাগজে চোখ বুলোতে বুলোতে নিস্পৃহভাবে বললেন, জানি না।

তারপর অনুচ্চকণ্ঠে ববলেন, একটু আস্তে কথা কইবেন। The walls have ears. আমি ছা-পোষা মানুষ। আমাকে আর আপনাদের সঙ্গে টানবেন না।

ওঁর ভয় দেখে সরিৎ হেসে উঠল। বললে, আচ্ছা, আমি চুপ করলাম।

বেয়ারা এসে চা দিয়ে গেল। হরিসাধনবাবু সম্পাদকীয় লেখার আয়োজন করতে লাগলেন। আর কর্মাভাবে সরিৎ অন্যমনস্কভাবে একখানা বিলিতি মাসিকপত্রের পাতা উল্টাতে লাগল।

সন্ধ্যার আগে ম্যানেজিং ডিরেক্টার এলেন। সরিৎকে দেখেই সহাস্যে বললেন, কি রকম! দেখি আপনার হাতে কাগজের কতখানি উন্নতি হয়। আপনার উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে। আপনি পারবেন।

তাঁর মনে অবশ্য কোনো সন্দেহই রইল না যে, প্রথম কর্মোন্নতি, দ্বিতীয় এই প্রীতিসম্ভাষণের পর সরিৎ সপ্তম স্বর্গে উঠে গেছে। সরিৎ সপ্তম স্বর্গে উঠল কি না বোঝা গেল না। কিন্তু যে সমস্ত ধারালো কথা শোনবার জন্যে এতক্ষণ সে মনে মনে প্যাঁচ কষছিল, তার একটাও মুখ দিয়ে বার হল না।

ম্যানেজিং ডিরেক্টারও সেজন্যে অপেক্ষা করলেন না। তিনি হরিসাধনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ কি নিয়ে এডিটোরিয়াল লিখছেন?

তাঁকে দেখামাত্র হরিবাধনবাবুর মুখখানি ডিমের মত শক্ত এবং ছোট হয়ে গেল। কে বলবে ইনিই 'সুদর্শনের' নির্ভীক তেজস্বী সম্পাদক, দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক হরিসাধনবাবু—দেশের জন্যে যিনি মৃত্যুকেও ভয় করেন না। এই দেশবরেণ্য অগ্নিসমতেজস্বী বাগ্মীকে অকস্মাৎ নিরীহ মেষশাবকে পরিণত হতে দেখে সরিৎ কৌতুক বোধ করলে। সঙ্গে সঙ্গে এই ভেবে অবাক হয়ে গেল যে, অমিতশক্তিশালী ইংরাজ সরকার, তাদের ফাঁসীর মঞ্চ এবং মেশিনগানের গুলিকে যিনি ভয় করেন না, তিনি সামান্য একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে দেখে ভয়ে কাঁপেন কেন?

হরিসাধনবাবু চতুর লোক। ম্যানেজিং ডিরেক্টারের আগ্রহ কোথায় তা বেশ ভাল করেই জানেন। বললেন, শ্রীহর্ষবাবুর বক্তৃতাটার একটা জবাব বেশ কড়া রকমই দিতে হবে।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বললেন, নিশ্চয়ই। অত বড়

দাম্ভিক আমি জীবনে দেখিনি। লিখবেন, শ্রীহর্ষবাবু কি কংগ্রেসকে তাঁর পৈতৃক জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত মনে করেছেন? এক কাজ করবেন বরং। আপনার লেখা শেষ হতে কতক্ষণ লাগবে? আটটা?

—তার মধ্যে হয়ে যাবে!

—Right. আপনি আটটার সময় আমাকে টেলিফোনে লেখাটা শুনিয়ে তার পর প্রেসে দেবেন। আচ্ছা, আমি উঠলাম।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। সরিৎও সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে উঠে দাঁড়াল। বললে, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল।

—বলুন।

সরিৎ পদত্যাগপত্র তাঁর হাতে দিলে। সেটায় একবার চোখ বুলিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টার বিস্মিতভাবে বললেন, অন্য কোথাও চাকরি পেয়েছেন?

— না।

—তবে? বন্ধুদের প্রতি সহানুভূতি?

—তাও না।

—তবে?

সে-প্রশ্ন এড়িয়ে সরিৎ পাল্টা প্রশ্ন করলে, কমলবাবু, কালীমোহন আর জ্যোতির্ময় কি অপরাধে কর্মচ্যুত হল জানতে পারি?

—জানবার অধিকার নেই। তবু দয়া করে জানাচ্ছি, তাঁদের অপরাধ বিশ্বস্ততার অভাব।

—তাঁদের কি দোষস্খালনের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়েছিল?

—কোনো প্রয়োজন নেই। আমি জানি আমার সংবাদ নির্ভুল।

সরিৎ হেসে ফেললে। বললে, আপনি বহুনিন্দিত ইংরেজ সরকারের মতো কথা বললেন। তাঁরাও রাজবন্দীদের সম্বন্ধে কি এই রকমই বলেন না?

ম্যানেজিং ডিরেক্টার কটমট করে তার দিকে চাইলেন। বললেন, আপনি

একমাসের নোটিস দিয়েছেন? কিছু প্রয়োজন নেই। কাল-থেকেই আপনার ছুটি। আপনি এখন যেতে পারেন।

সরিৎ নমস্কার করে বেরিয়ে গেল।

রাগে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত জ্বালা করছিল। এত বড় কথা এ পর্যন্ত কেউ তাঁকে বলতে সাহস করেনি। রাগ সামালাতে তাঁর একটু সময় লাগল। তার পর সম্পাদকের দিকে চাইলেন। হরিসাধনবাবুই এই দুর্ঘটনার ঘটক। কিন্তু তিনি এমন ভাবেননি। তথাপি সরিৎ কথা আছে বলে যেই দাঁড়াল—অমনি অজানিত আশঙ্কায় তাঁর বুক টিপ টিপ করে উঠল। ঘাড় টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ল। সে ঘাড় এখনও তুলতে পারেননি।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার হঠাৎ হেসে ফেললেন। তাঁর হাসির শব্দে আশ্বস্ত হয়ে হরিসাধনবাবু স্কুলের ছেলের মত মিট মিট করে অপাঙ্গে তাঁর দিকে চাইলেন।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন, এ ছোকরা চালাক আছে। বুঝেছে এখানে তারও পরমায়ু বেশি দিন নয়। তাই আগে থাকতেই সরে পড়ল।

আকাশে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, এখন কি করা যায়?

হরিসাধনবাবু দ্বিধাভরে বললেন, সুকুমারবাবুকে বলা যেতে পারে।

—তিনি নতুন এসেছেন! নিউজ-এডিটারের কাজ

—তা ছাড়া উপায় কি?

একটুক্ষণ চিন্তা করে ম্যানেজিং ডিরেক্টার বললেন, তাই হোক। তাঁকে ডাকুন একবার। কিন্তু আমার সংবাদ এই যে, তিনিও এদেরই দলের।

—কি জানি।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার হেসে বললেন, এই দেখুন! আপনি পাশের ঘরে থেকে খবর রাখেন না, আর আমি কোথা থেকে প্রত্যেকের ঠিকুজির খবর রাখি? রাখতে হয়। প্রত্যেক মানুষের সম্বন্ধে সতর্ক থাকা দরকার।

হরিসাধনবাবু নতমুখে বসে রইলেন। বলতে পারলেন না, এই গোয়েন্দাগিরির উৎপাতেই আফিসে এত অসন্তোষ।

সুকুমার এল।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার একটি ছোট্ট ভূমিকা করে বললেন, আপনি যদিচ নতুন এসেছেন, তবু আপনার কাজ দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। আপনার মত বিশ্বস্ত এবং পরিশ্রমী আর দুজন যদি পাই 'সুদর্শনের' জন্য নিশ্চিন্ত হতে পারি। কিন্তু ভালো লোক সংসারে বেশি মেলে না। সে যাক। কমলবাবুর পরে আপনাকে নিউজ-এডিটার করাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সরিৎবাবু এ অফিসে আপনার চেয়ে পুরোনো লোক। শৃঙ্খলার খাতিরে তাঁর দাবি উপেক্ষা করতে না পেরে তাঁকেই সুযোগ দিয়েছিলাম। ভগবান আপনাকে রক্ষা করেছেন, তিনি এ সুযোগের মর্যাদা বুঝলেন না এবং আমি মনে মনে যা চেয়েছিলাম তাই হল।

ভদ্রলোক হা হা করে প্রাণখোলা লোকের মতো হাসলেন। সে হাসিতে সুকুমারের ধমনীর রক্ত পর্যন্ত শিউরে উঠল। ম্যানেজিং ডিরেক্টারও সাধারণ লোকের মতো হাসে! বিস্ময়ে সুকুমারের দেহ কাঠের মতো শক্ত হয়ে উঠল।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। আপনি আজ থেকে নিউজ এডিটারের চার্জ নিন। এই মাস থেকেই আপনার পনেরো টাকা বেতন বৃদ্ধি হল। আপত্তি আছে?

সুকুমার ঘাড় নেড়ে জানালে, নেই।

ম্যানেজিং ডিরেক্টার হেসে বললেন, দেখবেন। শেষে আমাকে ডোবাবেন না।

সুকুমার শক্ত হয়ে বললে, না! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার যতটুকু শক্তি আমি কাগজের জন্যে নিয়োগ করব।

—তাহলেই হবে। কিচ্ছু না মশাই, চাই খানিকটা সাধারণ বুদ্ধি, আর পার্টির পলিসি বোঝা। তাহলেই বুঝতে পারবেন কোন্ খবরটা চাপতে হবে, আর কোন্‌টা মাথায় দিতে হবে। যদি কোথাও খট্‌কা বাধে, হরিসাধনবাবুকে জিগ্যেস করে নেবেন। ব্যস।

ম্যানেজিং ডিরেক্টারও উঠলেন। যাওয়ার আগে হরিসাধনবাবুকে চুপি চুপি বলে গেলেন সুকুমারের দিকে দৃষ্টি রাখতে। ও না যেন পার্টিকে ডোবায়। ওরা সব পারে।

হরিসাধনবাবু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

পরের দিন সকালেই সুকুমার মণিমালাকে চিঠি লিখে সকল কথা জানালে। এটা তার অনেকদিনের অভ্যাস। যখনই বহু ভাবের প্রাবল্যে চিত্ত তার উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওঠে, তখনই সে অক্ষরের মালায় সেই পরস্পর-বিরোধী ভাবধারাকে সুশৃঙ্খলে সাজাতে বসে। আসলে কলকাতার ঘটনার সঙ্গে মণিমালাকে পরিচিত করা তার উদ্দেশ্য নয়। সে বিষয়ে তার যে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই, এ কথাও সে জানে। লেখে নিজের জন্যে। মনে মনে চিন্তা করতে গেলে ভাবের ঘোড়া এত দ্রুত এবং এলোমেলো চলে যে, সে না পারে তার গতি সংযত করতে, না পারে তাকে ঠিক পথে চালাতে। চিন্তাকে সংযত করতে লেখার মতো বড় বল্গা আর নেই। সুকুমার তাই লিখতে বসল।

লিখলে :

জান মণিমালা, তোমাকে শেষ চিঠি দেওয়ার পরে এই ক'দিনে আমার জীবনে অনেক পরিবর্তন ঘটল—আমার ব্যক্তিগত জীবনেও বটে, কর্ম-জীবনেও বটে। স্কুল-মাস্টারি ছেড়ে যখন খবরের কাগজে এলাম, তখন যে বৃহত্তর জীবনের আস্বাদে পুলকিত হয়েছিলাম, তা ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে। দম বন্ধ হবার উপক্রম। কি জানি কি হবে।

প্রথম যেদিন এসেছিলাম, এই জীবনের প্রতি কত বড় শ্রদ্ধা নিয়ে এসেছিলাম সে তো তুমি জান। ভেবেছিলাম জীবনের সর্পিল রাজপথে সাংবাদিক হল পথ-দেখান আলো। তাদেরই একটি পাশে যদি আমার হল ঠাঁই তো নিজেকে নিঃশেষ করে জ্বালতেই হবে। এসে দেখি কোথায় আলো। কোথায় পথ

দেখানর দায়িত্ববোধ! অসংখ্য আলোয় অসতর্ক জনতাকে কেবলই হাতছানি দিয়ে ভুল পথে ডাকছে। স্বার্থ? কিন্তু স্বার্থ তাদের নিজের নয়, মনিবের। এই মনিবদের কেউ বা পাটের ব্যাপারী,তাঁর স্বল্পাবশিষ্ট অবসরটুকু কর্পোরেশনের হিতব্রতে উৎসর্গ করেছেন। সুতরাং আগামীবারে মেয়রের আসন তাঁর চাই। খবরের কাগজে জনগণের মন তাই এখন থেকেই তৈরি করে রাখতে হবে। সুদীর্ঘকাল ওকালতির পরে কারও পাওনা হয়েছে মন্ত্রিত্ব। সে কথাটা বোঝাতে গেলে খবরের কাগজ একখানা নিশ্চয়ই চাই। চাই রাষ্ট্রনেতারও, দল রাখার প্রয়োজনে। মালিকের চাই শ্রমিকদলনের জন্যে, শ্রমিকের দরকার মালিক-দলনের জন্যে। আবার ওরই মধ্যে কেউ যে নিছক ব্যবসার জন্যে কাগজ বার করেনি তাও নয়। কেউ বা করেছে পাঁচজনকে দুটো গালাগালি দিয়ে দু'পয়সা আদায় করতে। মোট কথা এই গণতন্ত্রের যুগে মানুষ আর শুধু নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে পারে না। সে জানে, যেমন নিজের জীবনে—তেমনি জাতির জীবনে, সর্বাঙ্গে পচন ধরেছে। তার জটিল জীবনযাত্রায় কেবলই আসছে সংঘর্ষের পর সংঘর্ষ। ফলে নিজের জন্যে চিন্তা করার প্রথমে অবসর, পরে শক্তিও এল কমে। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে খবরের কাগজ অক্টোপাসের মত বাড়িয়ে দিলে বজ্রবাহু, টেনে নিলে কুক্ষির মধ্যে। দেখতে দেখতে আপন স্বার্থে আচ্ছন্ন করে দিলে জনতার সহজ রুচিবোধকে। আজ তাই জনতার বিশ্বাসের সীমা স্বাভাবিক ভদ্রতাকেও অতিক্রম করে চলেছে। মহাপুরুষের সম্বন্ধেও অত্যন্ত কদর্য মিথ্যাভাষণ বিশ্বাস করতে মানুষের আজ দ্বিধা নেই। আর এই বিকৃতরুচি উন্মত্ত জনতার মুখে মুহুর্মুহু সুরাপাত্র তুলে ধরবার জন্যে রয়েছি আমরা—অর্থাৎ বেতনভোগী সাংবাদিকের দল। না করে আমাদের উপায়ই বা কি!

তুমি হয়তো শুনে অবাক হবে, কিন্তু এ একেবারে পাকাপাকি স্থিরই হয়ে গেছে যে—নগ্ন নারীর ছবি না দিলে কাগজ চলবে না। ফলে যে কোন কাগজ খুললেই দেখবে, পাতায় পাতায় মহাসমারোহে বিরাজ করছে সিনেমা-অভিনেত্রীদের

নানা ভাবের নানা ঢঙের ছবি। যাঁরা এখনও এতদূরে উঠতে পারেননি, তাঁরা মহাত্মা গান্ধী আর মীর্ণা লয়, সুভাষচন্দ্র আর ক্লডেট কোলবার্ট, জহরলাল আর জীন চ্যাটবার্ণ—পাশাপাশি ছাপছেন। কিন্তু এ দুর্বলতা নিশ্চয়ই বেশিদিন প্রশ্রয় পাবে না। তখন অরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা এবং সুভাষচন্দ্র, অবনী ঠাকুর আর নন্দলাল মানুষের মন থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবেন। কিন্তু এর চেয়েও বড় দুর্ভাবনা হয়েছে এই যে, সিনেমা অভিনেত্রীদের ছবিতেও যখন আর পাঠকের নেশা জমবে না, তখন দোব কি ?

কিন্তু এসব দুর্ভাবনার কথা থাক। তোমাকে একটা সুখবর দিই। কাল থেকে আমি নিউজ-এডিটারের পদে উন্নীত হয়েছি। পনেরো টাকা বেতনও বৃদ্ধি হয়েছে। স্থায়ী কাজ কি না জিজ্ঞাসা করছ? না। এ সংসারে চিরস্থায়ী কিছুই নয়, খবরের কাগজের চাকরি তো নয়ই। আমার মনে হয়, যাদের ভালো করে বৈরাগ্যশতক পড়া নেই, তাদের এ লাইনে আসাই উচিত নয়। সুতরাং এই মায়াময় সংসারে কোন কিছুরই অনিত্যতার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ো না।

এর পরে নিতান্ত পারিবারিক কতকগুলো কথা লিখে সুকুমার চিঠি শেষ করে ডাকে ফেলতে দিল।

সকল কাজেই গোড়ার দিকে একটু অসুবিধা হয়ই। কিন্তু নিউজ এডিটারের কাজ সুকুমারের একেবারে অপরিচিত নয়। সুতরাং মাস-খানেকের মধ্যেই সে নিজের কাজ বেশ বুঝে নিলে। মুস্কিল হল দিনের বেলার নতুন সাব-এডিটার ক'জনকে নিয়ে। মাঝে মাঝে তারা সংবাদ তর্জমায় এমন ভুল করে বসে যে, সমস্ত সংবাদটাই হাস্যকর হয়ে ওঠে। কিন্তু সুকুমার তখন কাজে রস পেয়ে গেছে। কাগজখানিকে নতুন রূপ দেবার জন্যে তার কল্পনা উদ্দাম হয়ে উঠেছে। তার মনে তখন 'সুদর্শন' ছাড়া আর কোনো কিছুর চিন্তা নেই। 'সুদর্শন'কে সত্যকারের সুদর্শন করতে হবে, বাঙলা দেশের সামনে এমন একখানি চমৎকার কাগজ তুলে ধরতে হবে যার রূপ ইতিপূর্বে কেউ কখনও কল্পনা করেনি, এই চিন্তায় সে সমস্ত সময় বিভোর থাকে। সে নিয়ম করলে নতুন সাব-এডিটারদের সকল লেখা তার কাছ হয়ে তবে প্রেসে যাবে। সমস্ত লেখা সে নিজের চোখে দেখবে, যাতে কোথাও বিন্দুমাত্র ভুল না থাকে। এমনি করে তার খাটুনি গেছে অনেক বেড়ে। সকাল এগারোটায় খেয়ে-দেয়ে সে অফিসে আসে, ফেরে রাত বারোটায়, একটায়—কোনো দিন হয়তো একেবারে ফেরেই না। তার উৎসাহ দেখে স্বয়ং হরিসাধনবাবু পর্যন্ত মনে মনে না হেসে থাকতে পারলেন না। কিন্তু তিনি ভুল ভাবলেন। ভাবলেন চাকরি এমনিই জিনিস! প্রভুকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে মানুষ কি না করতে পারে!

সকল মানুষের মধ্যেই অল্পবিস্তর কবি-মন আছে, যদিচ কবিতা লেখার শক্তি সকলের নেই। অশিক্ষিত মালী আপনার কবিতাকে রূপ দেয় ফুলবাগানে, ছুতোর মিস্ত্রি তার কাঠের কাজে, এঞ্জিনিয়ার তাজমহলে। কারও হয়, কারও হয় না। কিন্তু চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। সুকুমারের কবি-মন মেতেছে খবরের কাগজ নিয়ে। এ যেন নেশার মত তাকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু হরিসাধনবাবুরও দোষ নেই। দিন-কাল বিবেচনা করলে শুধু নেশার

খেয়ালে কেউ যে এমন অবিশ্রান্ত খাটতে পারে, এ কথা অনুমান করা সত্যই কঠিন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সুকুমার অনেকগুলো তর্জমা শুদ্ধ করতে ব্যস্ত ছিল। এমন সময় বেয়ারা এসে একটা চিরকুট দিলে। জ্যোতির্ময়ের লেখা। সে নিচে অফিসের বাইরে অপেক্ষা করছে। তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।

সুকুমার লাফিয়ে উঠল। আশ্চর্য! এই একটা মাসের মধ্যে সে এমনই কাজে নিমগ্ন ছিল যে, ওদের কথা একবার তার মনেও পড়েনি! সুকুমার লজ্জিত হল। নিজেকে সে বার বার ধিক্কার দিতে দিতে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল।

বাইরে গিয়ে দেখলে কেউ কোথাও নেই। কি হল? চলে গেল নাকি? সুকুমার বড় রাস্তার মোড়ের দিকে এগিয়ে গেল। ঠিক! জ্যোতির্ময় কারও চোখে পড়বার ভয়ে সুকুমারের কাছে চিঠি পাঠিয়েই এত দূরে সরে এসেছে। সুকুমারকে দেখেই সে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। কিন্তু সুকুমার হাসতে পারল না। ওকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল!

গভীর বিস্ময়ে সুকুমার বললে, এ কি হে?

কর্কশ গণ্ডস্থলে হাত বুলিয়ে জ্যোতির্ময় বললে, দাড়িটা ক'দিন কামান হয়নি। তার পরে? চিনতে পারছ না নাকি?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুকুমার বললে, না পারবারই কথা।

ওর সর্বাঙ্গে একবার সে ব্যথিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে। মাথার রুক্ষ চুল হাওয়ায় এলোমেলো উড়ছে। শীর্ণ মুখে কোটরপ্রবিষ্ট চোখ নেকড়ে বাঘের মত জ্বল জ্বল করছে। গায়ে একটি মাত্র মলিন খদ্দরের পাঞ্জাবি, তারও অর্ধেক বোতাম নেই।

জ্যোতির্ময় তাড়াতাড়ি বললে, খেতে পাই না ভাই। বড় কষ্ট। কিন্তু তার চেয়ে বেশি লজ্জার কারণ হয়েছে এই ময়লা জামা-কাপড়গুলো—অথচ দিন-রাত্তির টো-টো করে ঘুরছি। এমন সময় নেই যে,

জ্যোতির্ময় হাসবার চেষ্টা করলে।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, কোথাও সুবিধা হল না ?

—পাগল !

সুকুমার চুপ করে রইল।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করলে, কালীমোহনের সঙ্গে দেখা হয় ?

—মাঝে মাঝে।

—এখানেই আছে ?

—তা ছাড়া আর যাবে কোথায় ?

—টাটানগর না কোথায় যাওয়ার কথা ছিল যে ?

—তুমিও যেমন ! বাড়ি থেকে টাকা আসছে, আর স্ফূর্তি করে থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখছে।

—আর কথাসাগর ?

—তার কি বল ? দাদার বাসা আছে, দু'বেলা দু'মুঠো খাওয়ার ভাবনা তো নেই। বেশ আছে !

—এর মধ্যে দেখা হয়েছে নাকি ?

—দিন সাত-আট আগে হয়েছিল। রাস্তায় একটা রেস্টুরেণ্টে নিয়ে গিয়ে খুব এক পেট খাইয়ে দিলে।

খাওয়ার কথাটা জ্যোতির্ময় এমনভাবে বললে যে, সুকুমার অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে চাইলে। জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এখন রয়েছ কোথায় ?

—রয়েছি ?—জ্যোতির্ময় ফিক্ করে একটু হাসলে। বললে, সে কথা আর বল না।

—পুরোনো মেস তো ছেড়েছ ?

—ছেড়েছি, মানে তা ছাড়তে হল বই কি।

—এখনকার ঠিকানা কি ? একটা ঠিকানা তো আছে ?

জ্যোতির্ময় হো হো করে হেসে উঠল। বললে, বিলক্ষণ। ঠিকানা না থাকলে,

কি চলে ? যাকগে। শোন, গোটাকয়েক টাকা দিতে পার ? অবশ্য শোধ দিতে একটু দেরি হবে। তবে দোব নিশ্চয়ই।

—আচ্ছা। হয়েছে ! কটা টাকা ?

—দুটো, তিনটে, যা পার।

সুকুমার পকেট থেকে খানকয়েক নোট বের করলে ! তার মধ্যে থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট জ্যোতির্ময়ের হাতে দিলে।

জ্যোতির্ময়ের চোখটা হঠাৎ চক্ চক্ করে উঠল। হেসে বললে, আজকে মাইনে পেলে বুঝি ?

সুকুমার অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবছিল। জবাব দিলে না।

জ্যোতির্ময় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আপন মনেই বললে, হুঁ। মাইনের দিনই তো বটে। আজ সাত তারিখ। মনে ছিল না। বার, তারিখ, সব ভুল হয়ে গেল হে সুকুমার ! অ্যাঁ ? একেবারে eternityর রাজত্বে বাস করছি ! সে হো হো করে হেসে উঠল।

জ্যোতির্ময়কে দেখার পর থেকেই সুকুমারের মন ভারি হয়ে উঠেছে। কেমন একটা সঙ্কোচ তার কণ্ঠরোধ করে বসেছে। তার কেবলই মনে হচ্ছে এদের কাছে সে যেন একটা মস্ত বড় অপরাধ করে বসেছে। এদের যে আজ জঠর শূন্য, মাথায় তেল নেই, পরিধেয় মলিন—এর জন্যেও যেন আংশিকভাবে সেও দায়ী। এদের সামনে দাঁড়াতে তার লজ্জা বোধ করা উচিত।

সে জ্যোতির্ময়ের হাসিতে যোগ দিতে পারলে না। বললে, তোমার ঠিকানা তো দিলে না। নাই দিলে, কিন্তু আমার ঠিকানা তো জান। এর মধ্যে একদিন এস না কেন ?

মুখ টিপে হেসে জ্যোতির্ময় বললে, আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু তাতে তোমার ক্ষতি হবে না তো ? মনে কর, ঘুণাক্ষরেও কর্তৃপক্ষ যদি জানতে পারেন ?

—সুকুমার বারুদের মত ফেটে পড়ল।

—ক্ষতি ? কর্তৃপক্ষ ? আমি কি কাউকে গ্রাহ্য করি ? তুমি কি মনে কর জ্যোতির্ময়, চাকরি শুধু তোমরাই ছাড়তে পার, আমি পারি না ?

উত্তরে জ্যোতির্ময় একটু হাসল।

সুকুমার আঘাত পেলে। ওর হাসি চাবুকের মতো তার বুকে বাজল। ব্যথিত দৃষ্টি মেলে একবার সে জ্যোতির্ময়ের দিকে চাইলে। শান্তভাবে বললে, দুঃখ আমিও কম সইনি জ্যোতির্ময় ! দুঃখ সইতে ভয়ও পাই না। কিন্তু সেই সঙ্গে অকারণে দুঃখের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়াটাকেও পৌরুষ বলে মনে করি না। আমি কি মনে করি জান ?

জ্যোতির্ময় তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, আমার কথায় কি আঘাতে পেলে সুকুমার ? আমি কিন্তু সে ভেবে বলিনি।

সুকুমার শান্তভাবে বললে, না, কিন্তু তার পর শোন। আমি মনে করি, তোমাদের জন্যে আমিও চাকরি ছেড়ে দোব, এর কোন মানেই হয় না। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে দেখা করার, কি বন্ধুত্ব রাখার ফলে যদি আমার চাকরি যায় তার জন্যেও দুঃখিত হব না।

জ্যোতির্ময় নিঃশব্দে শুনে গেল। সুকুমারেব গোড়ার কথাটা তার মনঃপূত হয়নি। কিন্তু সুকুমারকে সে ভালবাসে। তর্ক করতে গিয়ে পাছে তাকে আবার আঘাত দিয়ে ফেলে এই ভয়ে কোনো কথা কইলে না। চুপ করে রইল।

এমন সময় একখানা মোটর গাড়ি একেবারে ওদের পাশ ঘেঁসে চলে গেল। ওরা চমকে চোখ তুলেই দেখে—তার ভিতর থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টারের এক জোড়া চোখ তাদের দিকে চেয়ে।

জ্যোতির্ময় বিব্রতভাবে বললে, এই দেখ ! আমি যাই ভাই।

সুকুমার ওর হাত চেপে ধরলে। হেসে বললে, বেশ তো। তোমার কথার সত্যতার আজই পরীক্ষা হয়ে যাক। চল একটু চা-খেয়ে আসি।

সুকুমার হাসলে বটে ; কিন্তু আসলে তার ম্যানেজিং ডিরেক্টারের সামনে

যেতে ভয় করছিল ! তিনি আফিস থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত ও অফিসে ঢুকতে চায় না ।

জ্যোতির্ময় একবার বললে, তোমার হাতে কাজ নেই তো ?

সুকুমার চলতে চলতে বললে, কাজ কি আর নেই ? কিন্তু সে তো আমারই কাজ। ফিরে এসে করলেও চলবে। চল। কিছু খাওয়া যাক। বড় খিধেও পেয়েছে।

জ্যোতির্ময় অবাক হয়ে দেখলে সুকুমার অকস্মাৎ যেন খুব উৎসাহিত হয়ে উঠেছে।

ক'দিন পরেই মণিমালার চিঠি এল।

তত্ত্ববিচারের মধ্যে মণিমালা বড় একটা যায় না। সে অবসরও তার নেই। বিশেষ খোকার উৎপাতে চিঠি লেখাই তার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। তাকে ঘুম না পাড়িয়ে কিছু করার উপায় নেই। হয় কলমটা কেড়ে নেবে। নয় দোয়াতটা উলটে দেবে। আর নয় তো কাগজ নিয়ে টানাটানি করবে। বাধা দিলে এমন কান্না জুড়ে দেয় যে সে আর এক হাঙ্গাম।

মণিমালা ছোট চিঠি লিখেছে। মাইনে বৃদ্ধিতে আনন্দ জানিয়েছে, আর জানিয়েছে খোকার সম্বন্ধে টুকি-টাকি ক'টা কথা। আর কাজের কথার মধ্যে এই যে, তার ছোট মামা সম্প্রতি বম্বে থেকে কলকাতার আফিসে বদলি হয়েছেন এবং সুকুমারের সঙ্গে দেখা করতে চান। মণিমালা তাঁকে সুকুমারের ঠিকানা পাঠিয়েছে এবং সুকুমারকেও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ জানিয়েছে। তিনি তাহলে খুবই খুশি হবেন।

মণিমালার ছোট মামা গিরিশবাবুকে সুকুমার ইতিপূর্বে কখনও দেখেনি। ভদ্রলোক বিবাহ করেননি এবং তাঁর জীবনেতিহাসেরও একটু বৈচিত্র্য আছে। ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করার পর তাঁর ইচ্ছা ছিল ডাক্তারি পড়া। কিন্তু বাড়ির

সকলের ইচ্ছা তিনি উকিল হবেন। তর্ক-বিতর্ক, অনুনয়-বিনয়, ঝগড়া-ঝাঁটি, কোনো প্রকারেই যখন তিনি পারিবারিক কর্তৃপক্ষকে স্বমতে আনতে পারলেন না, তখন একদিন ভোরে কোথায় যে নিরুদ্দেশ হলেন, কেউ আর দু'বৎসরের মধ্যে তাঁর খবর পেলে না। বছর দুই পরে তাঁর একখানা চিঠি এল—তিনি একটা লাইফ-ইন্সিওর‍্যান্স কোম্পানিতে চাকরি করছেন। তারপর যা হয়, অনেক দূরে থাকার জন্যে ধীরে ধীরে বাড়ির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কমে এল। ধীরে ধীরে তিনিও এদের ভুলে গেলেন, এরাও তাঁকে ভুলে গেল। তাঁর সম্বন্ধে মণিমালার মুখে কখনও কখনও শুধু এইটুকু কথাই সুকুমার শুনেছে যে, তিনি নাকি খুব বড়লোক হয়েছেন। কিন্তু এ কথায় সে বিশেষ মনোযোগ দেয়নি। কারণ, তার ধারণা—বাইরে দূরে যে থাকে, তার সম্বন্ধে মানুষ এই রকম অনুমানই করে।

সে যাই হোক, এই ভদ্রলোকটির সম্বন্ধে সুকুমারের মনে যথেষ্ট কৌতূহল আছে। বড়লোক হওয়ার জন্যে নয়—অত্যন্ত অল্প বয়সে দূর বিদেশে যিনি পালিয়ে যান, তাঁর আত্মীয়-স্বজনহীন দিনগুলি কেমন কেটেছে জানবার জন্যে। আজ আর সময় নেই। কাল সকালে একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাবে স্থির করলে। আত্মীয়দের সম্বন্ধে এ প্রকার প্রীতি তার জীবনে বোধ হয় এই প্রথম প্রকাশ পেলে। কিন্তু একে ঠিক প্রীতি বলা চলেনা। এ নিছক কৌতূহল।

সুকুমার তাড়াতাড়ি সুটকেস খুললে, দেখা করতে যাবার মত পরিষ্কার জামা-কাপড় আছে কিনা দেখবার জন্যে। তার জীবনে এইটে প্রায়ই ঘটে। কোথাও যাওয়ার আগেই দেখা যায়, জামা আছে তো কাপড় নেই, কাপড় আছে তো জামা নেই। আর নয়তো দুটোই এমন ছেঁড়া যে একেবারে অব্যবহার্য। সুকুমার দেখে আশ্বস্ত হল যে জামা-কাপড় আছে।

সে সুটকেশ বন্ধ করে নিজের মলিন মাদুরখানার উপর নিশ্চিন্ত হয়ে বসল। এমন সময়

—এ ঘরে সুকুমারবাবু থাকেন ?

সুকুমার শশব্যস্ত উঠে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। দেখলে মিশকালো রঙের দীর্ঘকায় এক ভদ্রলোক দামী সাহেবী পোষাক পরে পাশের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে।

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, কাকে চান?

—সুকুমারবাবু এখানে থাকেন?

—আমিই! আপনি···

ভদ্রলোক আশ্বস্তভাবে হেসে বললেন, বিলক্ষণ! মণির কাছ থেকে বহু কষ্টে যদি তোমার ঠিকানাটা সংগ্রহ করলাম, তো বাড়ি খোঁজাই একটা সমস্যা। এমন এঁদো গলির ভেতর···আমায় চিনতে পারছ না? আমি ছোট মামা, মানে বম্বে থেকে আসছি। মণি কি

—জানিয়েছে। আসুন, আসুন।

ইংরেজি পোষাকে মাদুরে বসা অসুবিধাজনক। কিন্তু সুকুমারের ঘরে একখানা ভাঙা চেয়ারও নেই। এতদিন চৌকি ছিল। কিন্তু ছারপোকার উপদ্রবে সে দু'টো ছাদে ফেলে দেওয়া হয়েছে! উপায়ান্তর নেই দেখে এই অসুবিধা সুকুমার দেখেও দেখলে না।

জিজ্ঞাসা করলে, কবে এসেছেন?

—তা দশ-বারো দিন হবে।—ছোট মামা ঘরের চারিদিকে দেখতে দেখতে অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন।

—কোথায় উঠেছেন?

ছোটমামার ঘর পর্যবেক্ষণ হয়ে গেল। এইবার তিনি সোজা হয়ে উঠে বসলেন এবং পনেরো মিনিট যাবৎ অনর্গল বকে গেলেন।

—কি বলছিলে? কোথায় উঠেছি? ক্যালকাটা হোটেলে। এখানে আবার আমাদের কোম্পানীর একটা ব্রাঞ্চ খোলা হচ্ছে। তারই ব্যবস্থা করতে আসা। বোধ হয় মাস দুই থাকতে হবে। So glad to meet you. মণিকে যে কত-দিন দেখিনি তার ঠিক নেই। বড় দেখতে ইচ্ছা করে। শোন, কাল দুপুরে তুমি আমার ওখানে খাবে। তোমার আফিস কখন? তিনটেয়? Right.

আমি বরং গাড়িতে তোমায় পৌঁছে দিয়ে যাব। তার পরে? কাজকর্ম কেমন চলছে? ভালো? মন্দ নয়? তাহলেই হল। ব্যবসা-বাণিজ্যের কি যে দিনকাল পড়েছে! এই আমাদের···কিন্তু তুমি এ রকম একটা লক্ষ্মীছাড়া মেসে রয়েছ কেন? আত্মাকে কষ্ট দিয়ে···উঁ? তার চেয়ে বাসা করলে কি···ন'টা বাজে? আচ্ছা তাহ্‌লে···নিচে আবার ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি। কাল আসছ তো? হ্যাঁ, বারোটায়, punctually, আচ্ছা···

ছোটমামা চলে গেলেন।

সুকুমার ফিরে এসে জরাজীর্ণ মাদুরখানার দিকে একবার সকৌতুকে চাইলে। আপন-মনে হাসলে। তারপর তেল মেখে শিস্ দিতে দিতে স্নান করতে গেল। আহারান্তে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা পুরাতন কথা স্মরণ করে তার হাসি এল। ছোটমামার প্রসঙ্গে মণিমালা একদিন বলেছিল—তাঁর রঙ ময়লা বটে, কিন্তু মুখশ্রী এবং গড়ন এত সুন্দর! নাক, চোখ, কপাল···

সুকুমারেরও তাই ধারণা ছিল যে, রঙ ময়লা। কিন্তু সে যে এমন মিশমিশে ময়লা তা সে স্বপ্নেও ভাবেনি।

তা হোক। সমস্ত সময়ে ওঁর কথায় বার্তায় এমন একটা চমৎকার আত্মপ্রত্যয়ের ভাব! সমস্ত সময়ে ওঁর মনে-মনে একটা গভীর বিশ্বাস আছে যে, যা কেন না বলুন, যত তুচ্ছ কথাই হোক, মানুষ ওঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতে বাধ্য। এইটে সুকুমারের বড় ভালো লাগল।

পরদিন দুপুরে ওঁর সঙ্গে আলাপ করে সে খুশিই হল। ছোটমামা, কেন জানি না, বিলেতি কেতায় লাঞ্চের আয়োজন করেছিলেন। খাবার টেবিলে বসে সুকুমারের জ্যোতির্ময়কে মনে পড়ে গেল। জ্যোতির্ময় সেই যে সেদিন পাঁচটি টাকা নিয়ে চলে গেল, তার পরে আসবার কথা থাকা সত্ত্বেও আর আসে নি। কেন আসে নি কে জানে। পরিচিত বন্ধুসমাজকে সে যেন কেমন এড়িয়ে চলছে। সে কি দারিদ্র্যের সঙ্কোচে? কে জানে! কিন্তু সকল দিন দু'বেলা যে ওর খাওয়া হয় না, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেদিন রেস্টুরেন্টে সমস্ত

চেষ্টা সত্ত্বেও তার লোলুপতা যেন মাঝে মাঝে ঝিলিক দিয়ে উঠছিল। বহুতর সুখাদ্যের সম্মুখে বসে সুকুমারের চিত্ত জ্যোতির্ময়ের সেদিনের কৃশ মুখখানির কথা স্মরণ করে বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

ছোটমামা তাঁর জীবনেতিহাসের অনেক অতীত কথা বলে চলছিলেন। কত জায়গায় তাঁর দেহ এবং মন কত ভাবে কত আঘাত পেয়েছে। নিষ্ঠুর স্বার্থপর পৃথিবীতে কত সংগ্রাম করে তাঁকে বড় হতে হয়েছে। শুনতে শুনতে সুকুমারের মনের মধ্যে চমৎকার একটি ভাবালুতার সৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু এ অভিজ্ঞতা তার হয়েছে যে, বর্তমানের কঠোর দুঃখ আর বিগত দুঃখের স্মৃতিকথা এক নয়। জ্যোতির্ময় প্রতি মুহূর্তে যে দুঃখ ভোগ করছে, তার সঙ্গে ছোটমামার এই দুঃখ-কাহিনী সুরে মেলে না। মনে হয় যেন, একটা বাস্তব—আর একটা স্বপ্ন, কবিতা।

ছোটমামা বললেন, বুঝলে বাবাজি, দুনিয়ায় মানুষের দরকার এখন রুটির। তার পরে ভরা-পেটে পড়বে তোমার 'সুদর্শন', গল্প-কবিতা-উপন্যাস। খালি-পেটে স্বর্গসুখও ভাল লাগে না। কবি দিচ্ছেন 'কালচার', আমি দিচ্ছি রুটি। চল ফুটপাথে দাঁড়াইগে, কার কাছে লোক ছুটে আসে দেখিগে।

সুকুমার হেসে বললে, ফুটপাথে দাঁড়াবার দরকার নেই, আমি জানি লোক আপনার কাছেই ছুটে আসবে। তবু রুটি, রুটি। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ফুরিয়ে যায়। কিন্তু কবিতার রস কোনো কালে শেষ হবে না। মধুসূদনদাদার দধিভাণ্ডের মতো সে থাকবে অক্ষয় হয়ে।

—সত্যি। কিন্তু সে রস কি খালি-পেটে পাওয়া যায়?

—হয়তো যায় না। কিন্তু সে দায়িত্ব কবির নয়। সংসারে সকলের দায়িত্ব এক নয়। কারও দায়িত্ব ক্ষুধার্তকে অন্ন দেবার। তাঁদের বিরুদ্ধে কবিতা না লেখার অভিযোগ করা ভুল। কেউ করেও না। তেমনি কবিরা কেন চটকল তৈরি করলেন না, এ অভিযোগ করাও ভুল।

ছোটমামা খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন, বাঃ! কথাটা তো বড় গুছিয়ে বলেছ হে! চমৎকার! তোমার নিজের সম্বন্ধেও কি তুমি এই কথা অনুভব কর?

—না। কারণ, আমি কবি নই।

—তবে ?

—আমি খবরের কাগজে চাকরি করি। স্রেফ চাকরি।

—বাস্ ?

—আজ্ঞে হাঁ।

ছোটমামা স্থপে আপনমনে উপর্যুপরি ক'টা চুমুক দিলেন। কি যেন ভাবলেন। তার পর হঠাৎ বললেন, তুমি আমার আফিসে চাকরি নেবে ?

সুকুমার এত অকস্মাৎ মনঃস্থির করতে পারলে না। শুধু পুরাতন তর্কের সুর টেনে বললে, না নেবার কি কারণ থাকতে পারে ?

—কিন্তু এখনই-এখনই খুব বেশি মাইনে দিতে পারব না। ধর যদি দুশো দিই, কিম্বা বড় জোর আড়াই শো ?

দুশো কিম্বা আড়াই শো ! এবং তার জন্য এত কুণ্ঠা ! সুকুমারের জীবনে এত বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা আর কখনও হয়নি। তার চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। কি বলবে ভেবে পেলে না।

ছোটমামা বললেন, কি ? আপত্তি আছে ?

কোনোক্রমে সুকুমার বললে, না। আপত্তি কি ?

—তাহলে এই কথা রইল। কবে থেকে যোগ দিচ্ছ বল।

সুকুমার হেসে বললে, এই মুহূর্ত থেকে পারি।

ছোটমামা হেসে বললেন, আমাদের আফিস খুলতে এখনও মাসখানেক দেরি। কিন্তু কয়েকজনের service এখন থেকেই দরকার। বেশ, তুমি যেদিন থেকে খুশি আসতে পার।

সুকুমার 'সুদর্শন' আফিসে চলল স্বপ্ন দেখতে দেখতে। সে মনে-মনে স্থির করে ফেললে জ্যোতির্ময়কে নিতে হবে। তারপরে কালীমোহন এবং সরিৎকেও। 'সুদর্শনের' মতো সেখানেও একটা হৃদ্যতার সুমধুর আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে। নিজে সে অনেক দুঃখ পেয়েছে। কি করে অধীনস্থ কর্মচারীর সঙ্গে ব্যবহার

করতে হয় সে অভিজ্ঞতাও হয়েছে। সে মনে মনে তারই খসড়া তৈরি করতে করতে চলল।

প্রথমেই গেল হরিসাধনবাবুর ঘরে। শুভ কাজে দেরি করে লাভ নেই। আর মমতাই বা কিসের! আজই সে পদত্যাগ করবে। কিন্তু হরিসাধনবাবু তখনও আসেননি। সেখান থেকে সে নিজের ঘরে গেল। দেখলে, টেবিলের উপর স্তূপীকৃত হয়ে আছে টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম—কোনটা নিউইয়র্ক থেকে, কোনটা বার্সিলোনা থেকে, কোনটা বা করাচি থেকে। কিন্তু এরই মধ্যে সেগুলোর সম্বন্ধে সমস্ত আগ্রহ যেন কোথায় উবে গেছে। একবার উলটে-পালটে দেখে আবার সেগুলো যথাস্থানে রেখে দিলে। ঘরের হাওয়াও যেন ভারি বোধ হতে লাগল। সে বাইরের বারান্দায় গিয়ে পায়চারি করতে লাগল।

এমন সময় বেয়ারা এসে খবর দিলে, হরিসাধনবাবু ডাকছেন।

তাঁর ঘরে যেতেই তিনি তার মুখের দিকে না চেয়েই একখানা খাম এগিয়ে দিলেন। সুকুমার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অপাঙ্গে চেয়ে দেখলে, তাঁর মুখখানা কেমন যেন লম্বা হয়ে গেছে। সে খামখানা খুলে পড়ল।

সেই পুরাতন চিঠি, যে চিঠি কিছুকাল আগে সরিৎকে দেওয়া হয়েছিল। সেই চিঠির কাগজ, সেই ভাষা, সেই স্বাক্ষর এবং তেমনি টাইপকরা। একটা কঠিন সমস্যার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ যেমন আনন্দে হেসে ফেলে—সুকুমার তেমনি উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে ফেললে। ছোটমামাকে সে এখন থেকে কাজে যোগ দেবার কথা বলে এসেছে বটে, কিন্তু তার মনে একটা খট্‌কা ছিল, এক-মাসের নোটিশ না দিয়ে 'সুদর্শন' ছেড়ে দেওয়া সঙ্গত হবে কি না। যাক্, সে দুর্ভাবনা আর রইল না!

বললে, আমি নিজেই আজ পদত্যাগ করতাম হরিসাধনবাবু। কিন্তু তাহলেও আমাকে আরও একমাস থাকতে হত। ম্যানেজিং ডিরেক্টর আমাকে সেই ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। তাঁকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ দেবেন

হরিসাধনবাবু চোখ থেকে পট্ করে চশমাটা খুলে ফেলে বললেন, সে আবার কি!

—আমি একটা চাকরি পেয়েছি।

—তাই নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেয়ারা এসে সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করলে, তার চা এইখানে এনে দেবে কি না।

—তাই দে। শেষ পেয়ালা খেয়ে নিই।

সুকুমার চায়ের পেয়ালা মুখের কাছে তুলে নিলে। যে কারণেই হোক, নিতান্ত খোর না হলে এ আফিসের চা মুখে দেওয়া যায় না। এমনই বিস্বাদ। কিন্তু আজ সর্বপ্রথম এই কদর্য চা-ই সুকুমারের আশ্চর্য রকম মধুর মনে হল। সে পা নাচিয়ে নাচিয়ে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে চা পান করতে লাগল।

এই লেখকের অন্য বই

বন্ধনী

আকাশ ও মৃত্তিকা

শৃঙ্খল

ঘরের ঠিকানা

ক্ষণবসন্ত

বসন্ত রজনী

দেহযমুনা

মনের গহনে

পান্থনিবাস

মধুচক্র

ময়ূরাক্ষী

গৃহকপোতী

সোমলতা

শতাব্দীর অভিশাপ

বহ্ন্যুৎসব

কালো ঘোড়া

ক্ষুধা

হালদার সাহেব

শ্মশান ঘাট

কৃষ্ণা

মহাকাল

কৃশানু

অনুষ্টুপ ছন্দ